মুজাহিদদের জীবন কথা

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভী

মুজাহিদদের জীবন কথা

[ইতিহাসের বিখ্যাত বীর মুজাহিদগণের অবিস্মরণীয় জীবন কাহিনী]

উবায়দুর রহমান খান নাদভী

কিতাব কেন্দ্র

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[একটি ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশনা]

মুজাহিদদের জীবন কথা

উবায়দুর রহমান খান নাদভী

❑

❑

প্রকাশনায় ঃ

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১-৯৫৫২১৭

০১৭১-৮৪৫৩৩৭

❑

প্রকাশ কাল ঃ জুন ২০০৩

❑

দাম ঃ পঁচাশি টাকা

অর্পণ

নানাভাবে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের হাতে নিগৃহীত
আজকের মুসলিম উম্মাহ—

হৃত অবস্থান পুণরুদ্ধারে আবার যাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে
হেরার রাজতোরণের পানে—

প্রথম সুযোগেই সংগ্রহ করুন

আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি / ৮০
বিন লাদেনের বিশ্বযুদ্ধ ঃ ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা / ৮০
মোল্লা ওমরের আফগানিস্তান ঃ বাংলাদেশ ও তালিবান / ৮০
রক্তভেজা গুজরাট / ৭০
সীমান্ত খুলে দাও / ৭০
জিহাদ জান্নাতের পথ / ৭০
লাল সাগরের ঢেউ ঃ জিহাদী কাব্যগ্রন্থ / ৫০
ইতিহাসের কান্না / ৪০
নবী (সাঃ) জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী / ৭৫
সাহাবায়ে কেরামের গল্প / ৪০
ইসলামের যৌন বিধান / ১৫০
অপারেশন মাজার-ই-শরীফ /

মাওলানা নদভীর আরো বই

নবীজী (সাঃ) কেমন ছিলেন / ৬০
অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) / ৫০
আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনী / ৫০
অন্তিমশয্যায় খ্যাতিমানদের শেষ উক্তি / ৫০
মহানবীর (সাঃ) পরিবার-পরিজন /
রাসূল (সাঃ) শাসিত সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক জীবন /

প্রসঙ্গ কথা

'মুজাহিদদের জীবন কথা' একটি সংকলনধর্মী বই। প্রধানত 'সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান' সম্পাদনার সাথে যুক্ত থাকার সময় ১৯৯১ থেকে ২০০১-এ দশবছর সময়ের ভেতর এসব লেখার জন্ম। নানা উপলক্ষে নানা আঙ্গিকে লেখাগুলি তৈরি হওয়ায় এসবের ভাব, ভাষা ও চরিত্র অভিন্ন ধাঁচের না হলেও মূল সুর এক। শেষ লেখাটি আমার একটি পছন্দের লেখা। খুব ভালোবেসে লেখাটি তৈরি করেছিলাম। সে সময় বহু পাঠক চিঠি, সাক্ষাত ও টেলিফোনে তাদের মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। তাদের অনুরোধে এটিকে বইয়ের শেষে যুক্ত করা হলো।

কিছু লেখা এমনও আছে যার মূল রচনা আমার নয় তবে সম্পাদনার সময় এর খোল নলচে এমন ভাবেই পাল্টাতে হয়েছে যে লেখক নিজেই বলেছেন, 'এর চেয়ে ববং নতুন করে লিখে নেয়াই আপনার জন্য সহজ হতো। এখন তো আর এ লেখাটি আমার বলে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'সম্পাদকের চাকরি তো ভাই এটিই। নিজে কম লেখ; অন্যের লেখা বেশি দেখ। লেখা ঠিক করতে করতে এক সময় নিজেই লিখতে ভুলে যাবে।' আমার এ জবাব শুনে ওরা হাসতেন।

কিছু লেখা জনৈক সুহৃদ কম্পোজ করে এনে বলেছেন বইয়ে শামিল করতে। আমরা তাঁর এ নিষ্ঠা ও আন্তরিক'তার কী প্রতিদান দিতে পারি! এ পর্যায়ের বিষয়গুলো আল্লাহ পাকের উপরই ছেড়ে দেয়া সমীচীন।

আধুনিক সময়ের পাঠক, বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম ইসলামের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় বীরগণকে কিছুটা হলেও চেনার সুযোগ পাক, এ চিন্তায় তাড়াহুড়া করে এ বইটি গ্রন্থনার কাজ করা হয়েছে। পরবর্তী কোন সুযোগে এটি সুবিন্যস্ত আকারে আরও সম্পূর্ণ অবয়বে বেরুবে আশাকরি।

শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার গবেষণা সহকারীগণ নতুন বইপত্র প্রকাশনার ধারাটি যে আন্তরিকতার সাথে অব্যাহত রেখেছেন তার নজির সত্যিই বিরল। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। যাদের নীরব মেহনতে 'কিতাব কেন্দ্র' দিন দিন পাঠকের মন জয় করে তার চলার পথকে মসৃন করে নিচ্ছে। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন।

ঢাকা — বিনীত

৬ মে ২০০৩ — উবায়দুর রহমান খান নাদভী

মধ্যএশিয়া, আরব জাহান, আফ্রিকা ও ইউরোপ

বীর মুজাহিদ খাত্তাব ঃ চেচনিয়ার শহীদ

একবিংশের ইসলামী চেতনার অগ্নিমশাল

চেচেন যোদ্ধা খাত্তাবের বড় ভাই মানসুর আল সুয়াইলেম অতি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তার ছোট ভাই সম্পর্কে অনেক অজানা কথা বলেছেন। সম্প্রতি রুশদের নিয়োজিত আততায়ীরা খাত্তাবকে হত্যা করেছে বলে খবর রটেছে। জনাব মানসুর বললেন, এক চেচেন বৃদ্ধা মহিলা চেচেনদের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য খাত্তাবকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

খাত্তাবের প্রকৃত নাম সামির সালেহ আব্দুল্লাহ আল-সুয়াইলেম। বাল্যকালে তার স্বপ্ন ছিল যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া করা। সউদী আরবের পূর্বাঞ্চলী প্রদেশে লেখাপড়া করা তার পৈতৃক বাসভবনে বড়বাই মানসুর আরব নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সামিরের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন। মানসুর বললেন, রুশদের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ পরিচালনার আগে সামির সউদী আরবের মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতেন, মায়ের দোয়া চাইতেন। অতি সম্প্রতি রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে তার লাশের ছবি দেখিয়ে বলা হয় গত ১৯/২০ ২০০২ মার্চ খাত্তাব নিহত হয়েছেন, অবশ্য টিভি খবরে এটা বলা হয়নি যে কিভাবে খাত্তাবের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় আড়াই বছর আগে চেচেন স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে রুশ সৈন্যরা তাদের সর্বশেষ সামরিক নির্মূল অভিযান শুরু করার পর তাতে যে ক'জন চেচেন মুজাহিদ কমান্ডার নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ হলেন খাত্তাব।

মানসুর বললেন, সামিরের মৃত্যু সম্পর্কে দুই ধরনের খবর পাওয়া গেছে। একটি খবরে বলা হয়েছে একজন বিশ্বস্ত সহকারীর কাছ থেকে পাওয়া মারাত্মক বিষে ভরা একটি চিঠি খোলার ৫ মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। আরেক খবরে বলা হয় একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে তাকে বিষাক্ত খাবার খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। মানসুর বললেন, সর্বশেষ তিন মাস আগে সামির সউদী আরবের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ১৯৮৭ সালে আফগানিস্তানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে তিনি মাত্র দু'বার সউদী আরবে এসেছিলেন।

মানসুর বললেন, সামির (খাত্তাব) সুযোগ পেলেই সউদী আরবে পিতা মাতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতেন। তিনি বলেন, সামির ছিল এক উচ্চাভিলাষী বালক। সবসময় স্বপ্ন দেখতেন তিনি একটি দুর্গসদৃশ বাড়ির মালিক হবেন। সেই বাড়ি গাড়ি রাখার একটি বিরাট গ্যারেজ থাকবে এবং সব সময় সেখানে অন্তত ৫টি গাড়ি থাকবে। তিনি চাইতেন পরিবারের সকল সদস্য একত্রে বসবাস করুক। পরিবারর সকল সদস্যের সুবিধার দিকে ছিল তার সজাগ দৃষ্টি। বাল্যকালে সে ছিল অত্যন্ত নরম মনের, সামান্য বিষয়েই তার চোখে পানি আসত। সবাই তাকে ভালবাসতেন। কেউ কখনো তাকে রাগ করতে দেখেননি। সে কৌতুক করতে ও ছোট শিশুদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসত।

১৯৬৯ সালে সউদী আরবের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত আরার-এ সামিরের জন্ম। ছাত্রজীবনে সে ছিল খুবই মেধাবী। সেকেন্ডারী স্কুল পরীক্ষায় সে ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল।

ছোটবেলা থেকে ইসলামী বই-পুস্তক সাময়িকীর প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনে আল-খাত্তাবের (রাঃ) জীবনী ও ইতিহাস থেকে সে এতই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যে, সে খাত্তাব নামটি গ্রহণ করেছিল। মে আরাম কোর পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগ দিয়েছিল। সামির যুক্তরাষ্ট্রে তার লেখাপড়া অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করেছিল। অন্যের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। একবার এক অপরিচিত সুদানী প্রবাসী বিমানবন্দরে পৌঁছার জন্য তার কাছে লিফট চান। লোকটি তাকে জানায় যে, রাস্তায় তার গাড়িটি ভেঙ্গে গেছে এবং তিনি শংকিত যে তিনি সময়মত বিমান বন্দরে পৌঁছতে পারবেন না। আবার লোকটি গাড়িটি রাস্তায় ফেলে যেতেও দ্বিধান্বিত ছিলেন। সামির তাকে আশ্বস্ত করেন এবং বিমান বন্দরে পৌঁছে দেন। সামির বিমানবন্দর থেকে ফিরে এমে লোকটি ভাঙ্গা গাড়িটি মেরামতের জন্য কারখানায় নিয়ে যান। কয়েকদিন পর সুদানী লোকটি ফিরে এসে এটা দেখে বিস্মিত হয যে, তার গাড়িটি মেরামত করা হয়েছে। সামির লোকটি কাছ থেকে তার গাড়িটি মেরামতের খরচ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। সামিরের এমন এরকম নিঃস্বার্থ সেবার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। সামির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া পরিকল্পনা হঠাৎ কেন পরিবর্তন করলো তার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ জানতে পারেননি মানসুর। ১৯৮৭ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে রুশ সৈন্যের বিরুদ্ধে আফগান-আরব প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ দেন। পিতা তাকে একটি প্রাসাদতুল্য বাড়ি কিনে দেযার প্রতিশ্রুতি দিলেও তরুণ সামির দেশে ফিরতে অস্বীকৃতি জানান। বিগত ১৫ বছরে মাত্র দুইবার সামির সউদী আরব এসেছিলেন। সর্বশেষ এসেছিলেন ১৯৯৩ সালে। ৪ বার তিনি মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। একবার মাইন বিস্ফোরণে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিলেন। সেই বিস্ফোরণে কেবল

তিনিই প্রাণে বেঁচে যান। সকল সঙ্গী নিহত হন। মানসুর বললেন, আফগান টিভিতে চেচেনদের এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের দৃশ্য দেখে তিনি চেচনিয়া সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে উঠেন।

বিক্ষোভকারীদের 'আল্লাহ আকবর' শ্লোগান তার হৃদয়কে নাড়া দেয়। তিনি চেচনিয়ায় রুশবিরোধী চলমান জিহাদ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কিভাবে চেচনিয়া যেতে হয় তা তিনি জানতেন না, তিনি যে মানচিত্রটি কেনেন তাতে চেচনিয়া উল্লেখ ছিল না। সে কারণে চেচনিয়া শহরের কাছের দেশ আজারবাইজানের বাকুতে যান। সেখান থেকে পরে তিনি চেচনিয়া প্রবেশ করেন। সামির আরবীর পাশাপাশি রুশ, ইংরেজী ও পশতু ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। এর ফলে তিনি সহজেই সেখানকার সব ধরনের লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পান। তিনি রুশদের বিরুদ্ধে চলমান জিহাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি সামির বাসায়েভের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। এক পর্যায়ে এক চেচেন বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এই মহিলা রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজনে ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই মহিলা সামরিকে দৃঢ় আস্তার সঙ্গে বলেন, আমরা চাই যে, আমাদের ভূখণ্ড থেকে রুশদের দ্রুত অবসারণ হোক, তাহলে আমরা ইসলামের পথে ফিরে যেতে পারি। রুশদের বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি কিভাবে তিনি সাহায্য করবেন প্রশ্ন করা হলে ওই মহিলা বললেন, আমার কাছে একটি মাত্র জ্যাকেট রয়েছে, সেটাই আমি মহান আল্লাহর পথে লড়াইয়ে দান করতে চাই। মানসুর বল্ললেন, ওই মহিলাল উত্তর শুনে তার ভাই অভিভূত হয়ে পড়েন। এই মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনায় সামিরের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

বড় ভাই মানসুর বলেন, সামিরের জীবন ও সংগ্রাম ছিল পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত। সামির ছিলেন অসীম সাহাসী এক বীর যোদ্ধা। লড়াইয়ের ময়দানে তিনি ছিলেন ইস্পাদ দৃঢ়। সেই ব্যক্তিই বেসামরিক লোকদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দুয়ালু ও সহানুভূতিশীল। বেসমারিক লোকদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে ছিল তার সজাগ দৃষ্টি। মানসুর বললেন, আল্লাহর নির্দেশে জিহাদের পথে চলেছিলেন সামির। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন। গত ১৫ বছর ধরে তিনি আল্লাহর কাছে শহীদের মর্যাদা চেয়েছেন, আফগানিস্তানে তার এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, তাজিকস্তানে হয়নি, শেষ পর্যন্ত চেচনিয়ায় তা অর্জিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাই ইচ্ছে পূরণ করেছেন। বড় ভাই মানসুর ছোট ভাই সামিরের (খাত্তাব) এই শাহাদাৎ বরণে অত্যন্ত গর্বিত। সামির একজন দাগেস্তানী মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাদের তিনটি সন্তান রয়েছে।

মধ্য এশিয়ার স্বর্ণ-ঈগল জেনারেল জওহর দাউদ

সমকালীন শহীদী কাফেলার সাহসী ইমাম

ঐতিহ্যবাহী মুসলিম মধ্য এশিয়ার বিশাল ভুখণ্ডে দীর্ঘ ৭০ বছরেরও অধিক কাল যাবৎ কিয়ামতের তাণ্ডব নিয়ে বিরাজিত সমাজতান্ত্রিক শাসন আপনা থেকেই অপসৃত হয় এ দশকের শুরুর দিকে। নির্যাতন, নিপীড়ন, ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর নাস্তিক্যবাদী কঠোরতার সকল বাঁধন এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিধর সময় আয়োজনের বিপুল বন্ধন ধারণাতীতভাবে আলগা হয়ে গেলো তেমন কোন জানান না দিয়েই। কিন্তু কেন? কিসের শক্তিতে, কিসের প্রভাবে এমন অদ্ভুত ধস।

দেখতে দেখতে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো ১৫টি প্রজাতন্ত্র। তন্মধ্যে বৃহত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত ছয়টি মুসলিম দেশও স্বতন্ত্র সীমানা নিয়ে পুনরুত্থিত হলো অনেকটা হাশরের দিনের পুনরুজ্জীবনের মতোই। এ যেন প্রাচীন গোরস্তান থেকে মৃত বিস্রস্ত অস্থি-মজ্জা-হাড়-কংকাল ও দেহ কণিকার সমন্বিত উত্থান শেষে পরজন্মের স্পন্দিত সজীবতা। কিন্তু দেখা গেলো কৃত্রিম গৃহযুদ্ধ আর আরোপিত সামাজিক অস্থিরতার ফলে দেশ ছ'টি খুবেই বিপন্ন। অনেকটা দীর্ঘদিনের দুরারোগ্য ব্যাধি শেষে ভগ্ন স্বাস্থ্যোদ্ধারে ব্যস্ত কোন বৃদ্ধের প্রাণান্তকর প্রয়াস।

তবে ককেশীয় অঞ্চলের চির স্বাধীনচেতা যোদ্ধা জাতি মুসলিম চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল চলমান ঘটনা প্রবাহের ব্যতিক্রমী বিষয়। মাত্র ১৪ লাখ নাগরিকের ছোট্ট মাতৃভূমির মহান স্থপতি বীর মুজাহিদ জেনারেল জওহর দাউদ (রুশ উচ্চারণে-জোখার দোদায়েভ) চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেই ক্ষ্যান্ত থাকেননি। তিনি সাবেক সোভিয়েত চেতনা, শৃংখলা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার বিপরীতে একটি স্বাধীন মুসলিম চেতনা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির উত্থানেরও সর্বাত্মক প্রয়াস শুরু করেন। সাবেক রুশ শাসকগোষ্ঠী তথা পশ্চিমা সম্প্রসারণবাদীদের প্রভাব বলয়ের বাইরে বিকল্প ইসলামী ধারার সূচনা করে স্বর্গীয় আত্মপরিচয়ে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর মূল প্রেরণা। তিনি আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বাস করতেন যে, শৃগালের ন্যায় হাজার বছর জীবন যাপনের চেয়ে সিংহের ন্যায় একটি দিন বেঁচে থাকা উত্তম। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কামনা করতেন 'শাহাদতের মরণ'। ইসলাম, মুসলিম, চেচনিয়া ও

কুফরী শক্তিবিরোধী ইসলামী জিহাদের তরে শাহাদতবরণ করে আজ তিনি চেচনিয়ার সেই গ্রামটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত। যে গ্রামে ঘুমিয়ে আছেন তার সৌভাগ্যময়ী মা। মায়ের পাশেই রচিত হয়েছে বীর সন্তানের অন্তিম শয্যা।

গত ২৪ এপ্রিল চেচেন রাজধানী গ্রোজনীয় অদূরে এক ময়দানে সেটেলাইট টেলিফোনে কথা বলার সময় রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। চেচেনিয়ায় রুশ আগ্রাসনের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্তই রাশিয়া অভাবনীয় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকে। বিপুল সমরশক্তি ব্যবহারে তারা রাজধানী গ্রোজনী দখল করে নিলেও এবং উপর্যুপরি চেচেন গ্রামগুলো ধ্বংস করে চললেও রুশ কর্তৃপক্ষ চেচেনদের নিয়ে চরমভাবে বিব্রত। অপরাজেয় মানসিকতা ও জাতিগত জিহাদী প্রেরণা চেচেনদের নিরাপোষ প্রতিরোধ সংগ্রামে নিবদ্ধ রেখেছে। রাজধানীর পতনের পর পর্বত থেকে পর্বতে ছুটে বেড়িয়েছেন চেচেন নেতা প্রেসিডেন্ট জওহর দাউদ। তাঁর অবস্থান খুঁজে খুঁজে হয়রান রুশ কর্তৃপক্ষ। শেষ পর্যন্ত শান্তি আলোচনার নামে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে দিতে সক্ষম হয় এপ্রিলের সেই দুঃখের দিনে। একটি পল্লীর নির্ধারিত ময়দান থেকে নেতা উপগ্রহ নিয়ন্ত্রিত টেলিফোনে কথা বলতে সম্মত হন। কিন্তু রুশ গাদ্দার ও নাস্তিক্যবাদী অমানুষেরা কূটনীতির সৌজন্যটুকুও ভুলে গিয়ে দূরপাল্লায় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে তছনছ করে দেয় আধুনিক এশিয়ার সাহসী সন্তানের অবস্থান। নেতা শহীদ হন। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বব্যাপী সচেতন মুসলমানেরা ব্যথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ইসলাম বিদ্বেষী বিশ্বচক্রের ঘরে ঘরে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। আর তিনগুণ শক্তি নিয়ে ঝলসে উঠে শোকাভিভূত চেচেন জাতি। কান্নাকে তারা রূপান্তরিত করে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভায়। চেচেন মুজাহিদরা জওহর দাউদের সহকারী সেলিম খান জিন্দারবায়েভকে নেতা নিযুক্ত করেন। রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক করা হয় বিপ্লবী যোদ্ধা শামেল বাসায়েভকে। এরিমধ্যে ২৯ এপ্রিল, ঈদুল আযহার রাতে শুরু হয়। পাশ্চাত্য মিডিয়ার তথ্য-বিভ্রান্তি। বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হয়, সেলিম খানও নিহত। রুশ হামলায় নয় চেচেনদের অর্ন্তদ্বন্দ্বে। বিশ্বব্যাপী ১৩০ কোটি মুসলমানের হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে উঠে এ 'কুলক্ষুণে অপসংবাদে।' একটু পরেই আবার এ সংবাদ রদ হয়ে যায়। দু'দিন পর নয়া চেচেন নেতা সেলিম খান প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে টেলিভিশনে তাঁর জীবন, সুস্থতা ও অব্যাহত জিহাদের ঘোষণা দেন। পশ্চিমা সংবাদ প্রচারক গোষ্ঠী একটি অপকর্মে ব্যর্থ হয় এবং মুজাহিদদের মাঝে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি এবং চেচেন জাতিকে বিভ্রান্ত করার রুশ প্রয়াসও বিফল হয়।

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর নিহত একজন মজলুম চেচেন শহীদের সন্তান জওহর দাউদ ছাত্র জীবনে বিপুল মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। অখণ্ড সোভিয়েট ইউনিয়নের আনবিক ক্ষেপণাস্ত্র সমৃদ্ধ বিমান বহরের প্রধান পদে উন্নীত এই দুর্দান্ত জেনারেলই একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরূপে স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। কমিউনিস্ট সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জীবনযাপনকারী এই অনন্য ব্যক্তিত্ব আজ যে ঈমান ও জিহাদী জয্বা তাঁর বুকে লালন করে এসেছিলেন, সুযোগে এরই পূর্ণ প্রকাশ ঘটে তাঁর রন্ধ্রে প্রবাহিত তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিলো পৃথিবীর তাবৎ শয়তানকে বজ্রকণ্ঠে ধমক লাগানো। মহান নেতা শহীদ জওহর দাউদ এবং বীর মুজাহিদ চেচেন নাগরিকদের সংগ্রাম সফলতার স্বর্ণ শিখর স্পর্শ করুক। বিশ্বের সকল অপশক্তির বাধা উপেক্ষা করে জিহাদী চেতনার আলোকে শুরু হোক একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে চলার সপ্রাণ অভিযাত্রা।

দুদায়েভ (১৯৪৪-১৯৯৬) ঃ এক নজরে

স্বাধীনতাকামী চেচেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান নেতা।

চেচনিয়া পারভোমেস্কিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দুদায়েভের শৈশবস্থায় তার পারিবারকে কাজাকিস্তানে জবরদস্তিমূলক পাঠানো হয়। এখানে দুদায়েভ ১৩ বছর অতিবাহিত করেন। টামভব উচ্চতর বিমান বাহিনী প্রকৌশল স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন নেন, ১৯৯৭-এ তিনি ইউরি গ্যাগারিন ডিগ্রী লাভ করেন। ইস্টোনিয়ার টারটুতে স্ট্রেটেজিক বোমারু বিমানের ডিভিশন কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর ৩৬ বছর বয়েসে জেনারেল পদে উন্নীত হন। দুদায়েভ ইস্টোনিয়ার ভাষা শিখেন এবং ইস্টোনিয়ার জাতীয়তাবাদী অনুভূতির প্রতি সমহানুভূতি ব্যক্ত করেন এবং রুশ সরকারের আদেশকে অগ্রহ্য করে ইস্টোনিয়ার টেলিভিশন ও পার্লামেন্টকে বন্ধ করা থেকে বিরহ থাকেন। ১৯৯০ সনে দুদায়েভের ডিভিশনকে ইস্টোনিয়া থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং তিনি ফিরে আসেন চেচেনদের রাজধানী গ্রোজনীতে। দেশে ফেরার পর জাতীয়তাবিরোধী সংগঠন পিপল্স এক্সিকিউটিশ কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯১-এর আগস্টে দুদায়েভ চেচেন ইংগুশ স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের নেতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রজাতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। অক্টোবরে সদ্যঘোষিত চেচেন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাকে ঘোষণা করা হয় এবং পরের মাসে রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে চেচেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ডিসেম্বর, ১৯৯৪-এ রাশিয়া আক্রমণ চালায় চেচেনিয়াতে রাশিয়ার আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে। রুশ ও চেচেন ফৌজের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৯৬-এর এপ্রিলে দুদায়েভ রাশিয়ান রকেট হামলায় শাহাদাৎবরণ করেন।

মুজাহিদ শায়খ আব্দুল্লাহ ইসমাঈল

উজবেকিস্তানে জ্বলে উঠা অগ্নিশিখা

সত্তর বছরের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয়েছে ইসলাম। মানবতার এই ধর্মের নিগৃহন হয়েছে সর্বাধিক। এত অধিক নিপীড়নের পর সমাজতন্ত্রীদের ধারণা হয়েছিলো, সোভিয়েত ইউনিয়নে আর ইসলাম বা মুসলমানদের কথা স্বতন্ত্রভাবে কখনো শোনা যাবে না। কিন্তু কেবল এক্ষেত্রেই নয়, বরং ইসলাম বিশ্বে প্রচলিত হওয়ার পর বহুদেশে বহু সময় বহু শক্তিশালী বাধার সম্মুখীন হয়েছে। শুধু সত্তর বছর নয়, বরং আরো দীর্ঘদিন নির্যাতন চালানোর পরও ইসলাম দুনিয়ার সর্বত্র প্রকাশ্য ও বিজয়ীরূপে টিকে রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক মোহনিদ্রা ছুটে যাবার লক্ষণ দেখা যাওয়ার পূর্ব থেকেই ইসলামের অগ্রযাত্রা পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকার এ অবস্থায় বেশ কিছু মসজিদকে মাঝে মাঝে খুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আর মসজিদ খোলা না থাকলেও বাইরেই নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার তাতে বাধা দিতে পারেননি বা বাধায় কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়নি। পরবর্তীতে ক্রমে ক্রমে খুলে গেছে ছোট-বড় বহু মসজিদ। আর কিছু এখন সোভিয়েতের পতনের পর মুসলিম অধ্যুষিত ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাতন্ত্রগুলোর অবস্থা ও অবস্থান দেখেও আমরা আঁচ করতে পারি সে সব অঞ্চলে ইসলামকে চিরনির্বাসন প্রদানের আনন্দে স্ফীতবক্ষ সমাজতন্ত্রীদের সে পুরোন হয়ে যাওয়া প্রফুল্লতা কতটা নিরর্থক।

কোন কোন প্রজাতন্ত্রে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ শুধু তাই নয়, বরং দেশের অধিকাংশের মতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোতেও ইসলামেই একমাত্র প্রিয় ব্যবস্থা আরো সামনে এগুলে দেখা যাবে ইসলামের অফুরন্ত অবদানের প্রত্যক্ষ চিহ্ন এই বিশাল সোভিয়েতের স্থানে স্থানে এখনো বিদ্যমান। সেখানে ইসলাম আগমনের পর অনৈইসলামী কৃষ্টি সভ্যতার যেমন বিদায়ী ঘণ্টা বেজেছে তেমনি ভাষা ও সংস্কৃতিতেও ইসলাম প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্যাপকভাবে। যেমন আমরা দেখতে পাই ইরাক, লিবিয়া, মিসর ও ফিলিস্তিনে। এ সকল দেশে ইসলাম এসেছে, মাটি ও মানুষকে জয় করে নিয়েছে। ফলে প্রাক ইসলামী যুগের

ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সভ্যতা সব কিছুই ইসলামের মাঝে লয় পেয়ে ইসলামের সকল কিছুকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। সেসব দেশের মানুষের মন-মস্তিষ্কে পর্যন্ত ইসলাম তার শিকড় গেঁড়ে বসে যেতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের নাম ইসলামী হওয়ার সাথে সাথে আরবী হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং মানুষের ভাবের বাহন হিসেবে চালু হয়ে গেছে আরবী ভাষা।

তেমনি এক এলাকা অধুনালুপ্ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তানের এক বিশাল জনপদ। যেখানে আজো আরবী ভাষাই ব্যবহৃত ও প্রচলিত ভাষা। অবশ্য, তার সাথে ফারসী ভাষার কিছু কিছু শব্দও ব্যবহৃত হচ্ছে এ এলাকার অধিবাসীরা মুসলমান, ভাষা আরবী ও রীতিনীতি পূর্ণ ইসলামী। তারা এ পর্যন্তই নিজেদের পরিচিতি সীমিত রাখেনি; বরং ইসলামের সকল অনুষ্ঠান যথারীতি পূর্ণ মর্যাদার সাথে পালন করে সকল কাজ-কর্ম ইসলামসম্মত পন্থায় সম্পাদন করে এসেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচকগণ বলেন, এদেশে ইসলাম এসেছে মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তারা দলে দলে আরব থেকে বেরিয়ে এসেছেন ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করেছেন। সেই সাথে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দাওয়াতে ইসলাম ছড়িয়েছে সেসব এলাকায়। স্থানীয় জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ দাওয়াত বা পরোক্ষ আচরণে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন ও আন্তরিকভাবে তাকে গ্রহণ করেছেন। রাশিয়ার এ এলাকাটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

এই জনপদের অনেক অধিবাসী মূল আরবীয় রক্তের ধারক হিসাবে নিজেদের পরিচয়দানে গর্ববোধ করেন। তারা ইসলামের প্রতি এতোদূর অনুরাগী যে, সরকারী বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও তারা হজ্ব আদায় করার প্রতি চরম আগ্রহী। পিতৃপুরুষের মাতৃভূমি মক্কা ও মদীনার পবিত্র ভূমি থেকে ঘুরে আসাকে তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ হিসেবে বিবেচনা করেন।

বার্ধক্য উপনীত এই উজবেক আলেম ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ও আরবী ভাষায় সুদক্ষ। তিনি তার সুদীর্ঘ জীবন ব্যয় করে দিয়েছেন ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষার খেদমতে। সোভিয়েত রাশিয়ার ইসলাম নিপীড়ন তাঁকে তার কাজ ও মিশন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই পরিবেশে এই কাজে নিয়োজিত থেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চান।

সুদীর্ঘ ৭৪ বছর যাবৎ সমাজতান্ত্রিক পাশবিকতার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত ইসলামী মূল্যবোধ এখনো তাঁর চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত রয়েছে। চেহারায় তাঁর আঁকা রয়েছে ঈমানী আলোর দীপ্তি। সমাজতন্ত্রের ঘন কালো মেঘ কেটে যাওয়ার তাঁর মতো লাখো মুমিন আবার প্রাণ খুলে আল্লাহকে ডাকার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত।

এক মুজাহিদের মায়ের অশ্রু

ঘুমন্ত মুসলিম শার্দুলদের জাগৃতির ডাক

ডাকপিয়ন এইমাত্র একটি চিঠি দিয়ে গেল। বৃদ্ধা মা এই চিঠির জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন মাসের পর মাস। অবশেষে একটি চিঠি এলো। হাতের লেখা দেখেই চিনতে পারলেন এটি তাঁর প্রিয় পুত্রের চিঠি। কিন্তু তিনি তো পড়তে পারেন না। তাই এক আত্মীয় চিঠিখানা তাঁর হাত থেকে নিয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন ঃ

"মা! আমাকে ক্ষমা করো। তোমার সাথে আমার দেখা হওয়ার এক হাজার আশার মধ্যে নয়শত নিরানব্বইটি আমার বিরুদ্ধে। তোমাকে আমি যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় রেখেছি। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, অনেক দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু আমি জানি, আমাকে তুমি বুঝতে পারবে। আমি চোর নই। ডাকাতও নই। আমি সমাজবিরোধী ব্যক্তি নই, ক্ষতিকর লোকও নই। এজন্য তুমি আমাকে লালন-পালন করনি। আমি লড়াই করেছি আমার জনগণের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য; আর তাদের মর্যাদার জন্য, এই আমার অপরাধ। আমি ছিলাম আমার বিশ্বাসের প্রতি, আমার বিবেকের প্রতি নিষ্ঠাবান।"

মায়ের চোখ থেকে বেরিয়ে পড়ছিল অশ্রুজল। সে অশ্রু বেদনার ছিল না। ছিল আনন্দ ও গর্বের। তাঁর আনন্দ এবং গর্ব এই জন্য যে, তাঁর ছেলে মোস্তফা জেমিলেভ তার বিবেক এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে তার জনগণের জন্য সংগ্রম করে চলেছে এবং সোভিয়েত শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নির্যাতন, জেল-জুলুম সহ্য করে যাচ্ছে।

একজন মা তাঁর পুত্র অথবা কন্যার নিকট থেকে এর চেয়ে বেশী আর কি প্রত্যাশা করতে পারেন? সে সময়টা ছিল ১৯৭৩ সালের শরৎকাল। ১৯৬৬ থেকে মায়ের সঙ্গে মোস্তফার কদাচিৎ দেখা হয়েছে। কিন্তু পুত্রের স্মৃতি সর্বক্ষণ তাঁর হৃদয়ে ছিল ভাস্কর।

তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল ১৯৪৪ সালের ১৮ মে'র বেদনাদায়ক ঘটনাটি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। জার্মান বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগ এনে কিভাবে কমিউনিস্টরা ক্রিমিয়ার তাতারদের তাদের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিল। মোস্তফা তখন ছয় মাসের শিশু। রাত্রি দু'টোর সময়

সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কে, জি, বি-এর লোকেরা ক্রিমিয়াতে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে ঢুকে পড়ে। অনেক তাতার পরিবারের মত তাঁদেরও বিছানা থেকে টেনে হিঁচড়ে উঠানো হয়, প্রহার করা হয় এবং তাদের নির্দেশ দেওয়া দশ মিনিটের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের বাসভবন ত্যাগ করে যেতে। তারপর একপাল জানোয়ারের মত তাদের তুলে দেওয়া হয় একটি রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টে।

তারপরের ঘটনাগুলো আজো তাঁর মনে পড়ে। একাধারে এক মাস তাঁদের চলতে হয়েছে ট্রেনে। এর মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে বহু তাতার শিশুর। যখনই সোভিয়েত সৈন্যরা শিশুদের মৃতদেহ ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিত, তখনই তিনি ভয়ে শিশু মোস্তফাকে জড়িয়ে ধরতেন। লুকিয়ে রাখতেন তাঁর ছিন্ন বস্ত্রের অন্তরালে। আশঙ্কায় হয়তো কেঁপে উঠতেন– তাঁর আদরের মানিক মোস্তফার এই অবসথা ঘটে। মোস্তফা এবং তাঁর পরবারের লোকজন সত্যিই ছিলেন ভাগ্যবান। সোভিয়েত রাশিয়ার কুখ্যাত স্বৈরশাসক স্ট্যালিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট সোভিয়েত শাসকগোষ্ঠী তাতার মুসলিম জনগণকে নির্মূল করার জন্য প্রকৃতপক্ষে গণহত্যাই চালিয়েছিল। ক্রিমিয়া থেকে বহিষ্কৃত তাতারদের শতকরা ৪৬.২ জন মৃত্যুবরণ করে। ৯৯৪০০ শিশুর মধ্যে ৪৫৯২২ জন, ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়স্ককের ১৩৩০০ জনের মধ্যে ৬১৪৪ জন, ৯৩২০০ স্ত্রীলোকের মধ্যে ৪৩০৮৫ জন, ৩২৬০০ পুরুষের মধ্যে ১৫০৬১ মৃত্যুবরণ করে।

এই গণহত্যার কৈফিয়ৎস্বরূপ সোভিয়েত সরকারের বক্তব্য–তাতাররা নাকি ছিল শত্রু। তাই তাদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মা'র আরো মনে পড়ে, তিনি যখন তাতার জনগণের ওপর কমিউনিস্টদের অত্যাচারের কাহিনী মোস্তফার নিকট বলতেন, তখন সে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠতো।

ক্রিমিয়ার তাতারদের ওপর অবিচার এবং নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য তাদের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছিল একটি জাতীয় আন্দোলন। মায়ের নিকট থেকে যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তার ফলেই তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এই আন্দোলনে যোগ দিতে। তাসকন্দের সেব এবং যান্ত্রিক কৃষি ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নের সময় তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে তাঁকে এই ইনস্টিটিউট থেকে বহিষ্কার করা হয়। যখন তাঁকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বলা হলো তখন তিনি এই বলে অস্বীকার করলেন, "যদি ক্রিমিয়ার তাতারকে তার নিজ মাতৃভূমিতে

বাস করতে দিতে অস্বীকার করা হয়" তবে সেনাবাহিনীতে তাকে বিশ্বাস করা হবে কি করে?

১৯৬৬ সালে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং দেড় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আদালতে তাঁর সর্বশেষ বক্তব্য ছিল—"১৯৪৪ সালের অরাধে আমি হারিয়েছি হাজার হাজার ভাই-বোনদের, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যেভাবে আমরা স্মরণ করি হিটলারের আউসউইজ এবং ডাচাও বন্দি শিবিরে ইহুদীদের পুড়িয়ে মারার কথা।

জেল থেকে বের হয়ে তিনি যোগ দেন মানবিক অধিকার আন্দোলন গ্রুপে। তাঁকে আবার গ্রেফতার করে তিন বছরের জেল দেওয়া হয়। ১৯৭২ সনে মুক্তি পান। কিন্তু তাঁর এই মুক্তি ছিল স্বল্পস্থায়ী। আট মাস পরে আবার তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। এবার তাঁকে এক বছরের জন্য প্রেরণ করা হয় ওমাস্ক বন্দি শিবিরে। এই দণ্ড তিন দিন পূর্বে আবার তাঁর বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা করা হয়। মোস্তফা তখন অনশন ধর্মঘট করেন। এই অনশন ধর্মঘটের সময়ই মাকে চিঠি লিখেন।

তিনি যে মাকে লিখেছিলেন তাদের দেখা হওয়ার "এক হাজারটি আশার মধ্যে নয়শো নিরান্নব্বইটিই বিরুদ্ধে", তা একেবারে সঠিক। ১৯৭৩ সাল থেকে তাঁর প্রায় সকল সময়টাই কেটেছে শোভিয়েত বন্দি শিবিরগুলোতে। ১৯৭৭ সাল থেকে তাঁকে যখন মুক্তি দেয়া হয় এবং নজরবন্দি রাখা হয় তখন তিনি সোভিয়েত নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এবার তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয় পূর্ব সাইবেরিয়ায় চার বছরের জন্য।

১৯৮৩ সনের নভেম্বরে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। এবার তাঁর অপরাধ ছিল তাঁর কাছে সোভিয়েট বিরোধী বই-পুস্তক পাওয়া গেছে এবং তিনি সোভিয়েত বিরোধী বই-পুস্তক প্রচার করেছেন।

এবার তিন বছরের দণ্ড দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয় শ্রম শিবিরে। ১৯৮৫ সনে আবার তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। এবার এবারের ধর্মঘট স্থায়ী হয় ছয় মাস। আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি এবং তাদের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করার তাঁর অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল। তারই প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। যখন তাঁর স্বজনকে দেখা সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয়া হয় তখন তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

ষষ্ঠবার তাঁকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি জানি তোমরা আমাকে জীবিত মুক্তি দিবে না।" ১৯৮৬ সালে তাঁর মুক্তি

পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার দু'মাস আগেই সোভিয়েত সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আনে। তাঁকে সপ্তমবার কারারুদ্ধ করা হয়।

এমনি করে একটির পর একটি অভিযোগ এনে বিচারের প্রহসন করে সোভিয়েত সরকার হয়তো তাঁর মুক্তির পথ রুদ্ধ করতে চাইবে। কারণ, সাভিয়েত সরকার জানে, তিনি যদি মুক্তি পান তবে তিনি তাঁর জনগণের মানবিক অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তিনি আজন্ম বিপ্লবী।

তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর মায়ের আর উৎকণ্ঠা নেই। কারণ, তাঁর সন্তান তাঁর আদর্শ বিশ্বাসের জন্য, তার জনগণের মানবিক অধিকার আদায়ের জন্য এমন একটি অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, যে শাসনব্যবস্থা মানুষের অধিকার স্বীকার করে না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না, মোস্তফার ওপর যে নির্যাতন চলছে সারা পৃথিবী তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে না কেন?

তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা বলছে, মুক্ত দুনিয়ার মানুষ সোভিয়েত রাশিয়ার ভিন্ন মতাবলম্বী, সারানস্কী বেগানস এবং শাখারভদের কথাই আলোচনা করছে। মা আশ্চর্য হয়ে ভাবেন মুক্ত দুনিয়ার লোকেরা মোস্তফার কথা জানে কিনা।

পৃথিবীর লোকেরা জানুক আর নাই জানুক, মা ভাবেন মোস্তফার সংগ্রামের স্বীকৃতি তাঁর অশ্রু জলেই রয়েছে। কিন্তু তিনি শুধু আর একা মোস্তফার জন্য কাঁদেন না। অত্যাচারী সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় যারাই নিগৃহীত হয়েছে তিনি তাদের সকলের জন্যই চোখের জল ফেলেন। তিনি জানেন না, তাঁর এই অশ্রুজল বিফলে যাবে না। এ শুধু এক মায়েরই চোখের জল নয়। এ এক মুজাহিদের মায়ের অশ্রুজল।

Islamic World Review-১৯৮৭-এর জুন সংখ্যা থেকে।

ওয়াফা ইদ্রিস : ফিলিস্তিনের অগ্নিকন্যা

ইহুদীদের উৎপীড়নে আজ মৃত্যু যাদের পায়ের ভৃত্য

বৃহস্পতিবার, ৩১ জানুয়ারী ২০০২। স্থানঃ পশ্চিম জেরুজালেম। একটি মিছিল আল আম আরিঁ শরণার্থী শিবিরের সরু গলিপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। মিছিলের লোক হবে হাজার দুয়েক। সবার আগে রয়েছে ফিলিস্তিনি পতাকায় ঢাকা একটি কফিন। চারজন ফিলিস্তিনি কফিনটি কাঁধে নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পতাকা মোড়ানো কফিনে একটি মেয়ের ছবি সাঁটা। সবাই জানে কফিনে কোন লাশ নেই। কফিনে সাঁটা ছবির মেয়েটির প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জানাতেই এ প্রতীকী শবযাত্রার আয়োজন। মেয়েটির লাশে নেই। চারদিন আগে সে নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছে আত্মঘাতী বোমায়। খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে তার দেহ। ওই আত্মঘাতী বোমা হামলায় মারা গেছে এক ইসরায়েলি, আহত হয়েছে শতাধিক। মিছিলে স্লোগান দেওয়া হয়– ওয়াফা, আমাদের বীর। মুখোশপরা বন্দুকধারীরা তখন ফাঁকা গুলি ছুড়ে দেয়।

২

বিস্ফোরণটি ঘটেছিল তাইবে শহরে। সেটা পশ্চিম তীরের একটি ছোট আরব শহর। দুটি শহরই ১৯৬৭ সালে সৃষ্টি হওয়ার অদৃশ্য 'গ্রিন লাইনের' একেবারে পাশে। গ্রিন লাইনের পাশে জর্ডান। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে জর্ডানের এলাকা দখল করে নেওয়ার শহর দুটির আরবরা এখন আন্দোলনটি এদিকটায় সব সময় চাঙ্গা থাকে বলে ইসরাইয়েলি পুলিশ ও সৈন্যদের তৎপরতাও এখানে বেশি। পুলিশ বলেছিল, একটি ব্রিজের কাছে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজনকে লক্ষ্য করেই বোমাটি ফাটানো হয়। যে বোমাটি বহন করছিল সে মারা গেছে। পরে জানা গেল বোমা বহনকারী ছিল একজন আরব মহিলা। সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রথমে এ আত্মঘাতীকে নাবলুসের আল-নাজাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শিনাজ আমুরি বলে বর্ণনা করেছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টি জানাল, ওই নামের কেউ সেখানে পড়ে না। তবে তাহানি আমুনি নামে এক ছাত্রীকে পাওয়া গেল। তাহানি জানায় শিয়াজ নামে কাউকে সে চিনে না, ওই নামে তার কোন নিকটাত্মীয় নেই। তখনো কেউ নিহত মহিলার লাশ নিতে আসেনি। ঘটনার দায়দায়িত্ব কেউ স্বীকার করেনি। মহিলাটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, নাকি বিস্ফোরক বহণ করেছিল তা নিয়েও সন্দেহ পোষণ করা হয়।

৩

ততক্ষণে ইসরায়েলি সৈন্যরা নাবলুস এবং অন্যান্য শহরে রাস্তায় কংক্রিটের অবরোধ স্থাপন করে গাড়িতে তল্লাশি চালাতে শুরু করেছে। আরব পুরুষদের পাশাপাশি আরব মহিলাদের ওপরও শ্যেনদৃষ্টি ফেলছে। ঘটনার কয়েক দিন আগে গৃহবন্দি ফিলিস্তিনি নেতা এক ভাষণে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! পবিত্র জেরুজালেমের জন্য শহীদ হওয়ার মতো সম্মান আমাকে দাও। আরাফাত কি জানতেন যে এক ফিলিস্তিনি যুবতী তার আগেই এ ব্যাপারে মনস্থ করে ফেলেছেন! ৩০ জানুয়ারী আত্মঘাতী মহিলার নামধাম ও পরিচয় জানা গেল। তার নাম ওয়াফা ইদ্রিস।

৪.

ছবিতে দেখা যায় ওয়াফার লালচে চুল কাঁধ ছাড়িয়ে গেছে। চেহারাা শান্ত প্রকৃতির। সে প্যান্ট-শার্ট পরতেই ভালবাসতে। তাদের পরিবার বাস করতো ইয়ারায়েলের রামলে শহরে। ১৯৪৮ তার বাবা-মাকে পৈতৃক ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এরপর তাদের ঠাঁই হয় রামাল্লার আমারি শরণার্থী শিবিরে। শিবিরের ঘিঞ্জি পরিবেশ, চারদিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন এবং মানবেতর জীবনযাপনের ভেতরেই ওয়াফা বেড়ে উঠেছে। এ শিবিরেই তার জন্ম। শিবিরের কেবল ছোট দুটি রুমের একটি বাড়িতে ওয়াফা ও তার তিন ভাই বড় হয়েছে।

ইসায়েলি সৈন্য ও পুলিশ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত থাকলেও ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরের সংকীর্ণ গলিপথগুলোকে খুবেই ভয় পায়। তারা জানে, এ ধরনের স্থানে ইহুদীদের প্রতি চরম ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আশির দশকে ওয়াফা বড় হয়েছে এ গলিগুলোতেই। তখন ফিরিস্তিনিদের অসহযোগ আন্দোলন ইন্তিফাদার যুগ। ফিলিস্তিনি কিশোর-কিশোরীরাই ইন্তিফাদার মূল চালিকাশক্তি ছিল। ওয়াফাও সেই আন্দোলনে নিয়মিত শরিক হতো। রোজ সশস্ত্র সৈন্যদের প্রতি ইটপাটকেল ছোড়ার কাজে লেগে যায় দেখে ওয়াফার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হলো। পরে অবশ্য সে আবার স্কুলে গেছে। বান্ধবীরা জানায়, তখন একবার নয়, এ কারণে তিন-তিনবার ওয়াফার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছিল। ইন্তিফাদায় প্রথম পর্বে সে মিছিল করায় এত ব্যস্ত থাকত যে, এক ক্লাসে তাকে তিন বছর পড়াতে হয়েছে। তবে ১৫ বছর বয়সে তার পড়াশোনার আবার ছেদ পড়ে। এবারের কারণ বিয়ে। বিয়ের কিছুদিন পর ওয়াফা গর্ভবতী হয় কিন্তু সন্তানের মা হতে পারে না। তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এতে তার মা হওয়ার সুযোগটিও চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যায়। মা হতে না পারার ব্যাপারে নানা

কথা শুনতে হয় তাকে। বিয়ের আট বছর পর একদিন সে নিজেই স্বামীকে তালাক দেয় এবং মায়ের বাড়িতে একটি ছোট কক্ষে আবার নতুন করে জীবন শুরু করে।

ওয়াফার তিন ভাই ততদিনে বড় হয়েছে। তারা এখন ইয়াসির আরাফাতের ফাতাহ্ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। ধর্ম বা রাজনীতির সব ব্যাপারে এড়িয়ে চলতে দেখা যেত ওয়াফাকে। সে আধুনিক পশ্চিমা পোশাক পরত। মাথায় ওড়না বা চাদর ব্যবহার করত না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে প্যারাডেমিক একটি খণ্ডকালীন চাকরিও পেয়ে যায়। সমাজসেবার প্রতি ওয়াফার আগ্রহ সেই ছাত্রজীবন থেকেই। মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের পড়ানো কিংবা কোনে দুস্থ পরিবারের ঘরদোর রঙ করে দেওয়ার কাজে সে উৎসাহভরে অংশ নিত।

৫.

বাইরের দুঃসহ বাস্তবতা ওয়াফার স্বচক্ষে ধরা পড়ল, যখন সে প্রতি সপ্তায় রেডক্রিসেন্টের কাছে যেত। সাম্প্রতিককালে রামাল্লার কাছাকাছি ত্রয়োইশ জংশনে প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযের পর ফিলিস্তিনি বিক্ষোকারী আর ইসরায়েলি সৈন্যদের মধ্যে বার বার সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষের সময় হতাহতদের দুরবস্থা, ইসরায়েলিদের নৃশংসতা তার চোখে পড়েছে। প্রতি সপ্তাহ তাকে ফিলিস্তিদের নিয়ে ঘটনাস্থল আর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয়েছে।

এ কাজে নিবন্ধ ছিল প্রতি মুহূর্তে। প্যারামেডিকের নির্ধারিত পোষাক আর জনতার ভিড় ঠেলে হতাহতদের উদ্ধার করতে তাকে বেগ পেতে হতো। অনেকবার গোলাগুলির মাঝখানে আটবা পড়তে হয়েছে। ওয়াফা মোট তিনবার ইসরায়েলি সৈন্যদের ছোড়া রবার বুলেটে আহত হয়। এসব ঘটনা দেখতে দেখতে তার মনের ভেতরে চলতে থাকল অন্য রকমের পরিবর্তন। গত মাসে রামাল্লায় আরাফাতের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের বাইরে এক প্রতিবাদ কর্মসূচির সময় ১৫ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি কিশোরের শুশ্রূষার ভার পড়েছিল ওয়াফার ওপর। দিনরাত যথাসাধ্য চেষ্টা বলে কিন্তু পাঁচ দিনের মাথায় সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

এখন সবার ধারণা, এই ঘটনা ওয়াফার ভেতরে আরো বড় রকমের পরিবর্তন আনে। কারণ, পুরো একটা সপ্তাহ ধরে সে বলে বেড়াচ্ছিল, মৃত্যুও প্রতিবাদের একটা উপায় হতে পারে। ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মুনা আবেদ রাব্বে নিয়েছেন, মাস চারেক আগে তাকে ইসরায়েলি ট্যাঙ্কের গোলার আঘাতে

ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া এক ব্যক্তির দেহাংশগুলো তাকে কুড়াতে দেওয়া হয়। কাজটা করার পর ওয়াফা বলেছিল, আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই।

৬.

ওয়াফার এক ভাই ট্যাক্সি চালায়। তার স্ত্রী ভিসামের মতে, ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলি সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকেই ওয়াফার পরিবর্তনটা তার চোখে পড়ে। কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে সে কেবল আহতদের দুর্দশার কাহিনী, তাদের সেবাযত্ন ইত্যাদি নিয়েই কথা বলত। ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা প্রাণ দিচ্ছে তাদের প্রসঙ্গ টেনে বলত, 'আমিও শহীদের মতো মরতে চাই'। ওয়াফার মাও বলেছেন, ইদানীং মুখে ঘুরেফিরে শহীদ হওয়ার প্রসঙ্গটাই বেশি শোনা যেত।

ঘটনার দিন ওয়াফা তার চার বছরের ভাইঝি মিলানার হাতে কিছু চকলেট আর এক জোড়া খেলনা কানের দুল গুঁজে দিয়ে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সবাইকে বলেছিল, সে কাজে যাচ্ছে। এটা যে তার অগন্ত যাত্রা তা বাড়ির কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

কিছু পরে জেরুজালেমের এক ব্যস্ত এলাকায় বোমায় আত্মাহুতি দেয় ওয়াফা। বিশেষজ্ঞরা বলেছে, বোমাটিতে ২২ পাউন্ড বিস্ফোরক ছিল। বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া দেহাংশ থেকে নির্ধারিত করা হয় যে, কোন মহিলাই বোমাটি ফাটিয়েছে। জানাজানি হবার পর ওয়াফার মা বলেছেন, মেয়ে যে এমন কাজ করবে তা তার জানা ছিল না, তবে এখন তার গর্ব হচ্ছে। ওয়াফা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, যে কোন মহিলা এ ধরনের কাজ করতে পারে। ওয়াফা ফিলিস্তিনের অগ্নিকন্যায় পরিণত হয়েছে।

একই সময়ে আল আকসা বিগ্রেডস নামে ফাতাহর একটি জঙ্গি গ্রুপ বোমা হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছিল। কিন্তু সবাই নিশ্চিত যে, ওয়াফা কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল না। আত্মাহুতি দিয়ে সে ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিবিসির সাংবাদিকরা আমারি শিবিরে ফিলিস্তিনিদের প্রতিক্রিয়া জানতে গিয়েছিলেন। তিন সন্তানের জননী এবং বর্তমানে আবার গর্ভবতী এক মহিলা বলেছেন, সুযোগ দেয়া হলে এ রকম শারীরিক অবস্থায় তিনিও এ ধরনের অপারেশন চালাবেন। আর ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ওয়াফার সম্মানে বাগদাদে কেন্দ্রস্থলে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ওয়াফার আত্মদান ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

বীর মুজাহিদ লাইলা খালিদ

আধুনিক সময়ের জিহাদ-কন্যা

১৯৪৭ সাল হতে ফিলিস্তিনীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল অদ্যাবদি তাদের অর্জিত হয়নি। পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে চলে আসা এই সংগ্রামের অসংখ্য বীর ও বীরাঙ্গনার জন্ম হয়েছে। তাদের কেউ বেঁচে আছে। কেউ হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করেছে। এমনই এক বীরাঙ্গানা হলো 'লাইলা খালিদ।'

ফিলিস্তিনী সংগ্রামের ইতিহাসে লাইলা খালেদ একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম! বর্বর আগ্রাসী ইসরাইলী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লাইলা খালেদ এক রক্ত পানি করা আতঙ্ক! মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য বৈধ সংগ্রামের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-ই ছিলো তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য! তিনি মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে সেদিকে বীরদর্পে এগিয়ে যেতেন। এই দুঃসাহসী মহিলা কোমরে বোমা নিয়ে বিমান ছিনতাই করতেন। ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে আরব বীরদের মনে সাহসের সঞ্চার ঘটাতেন। উঁচু করে ধরতেন বিশ্ব বিবেকের কাছে নিপীড়িত ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকারের কথা। ১৯৪৮ সালে গুলী আর বোমার শব্দ শুনে মারি নিচে ভয়ে পালালো সেই শিশুটি এমন এক বীরাঙ্গনারূপে আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন কেউ তা ভাবতেও পারিনি! যে মেয়ে গুলির শব্দ শুনে পালাতো, সে এখন গুলির শব্দ শুনে এগিয়ে যায়। বোমার গন্ধ তাঁর রক্তে সাহসের সঞ্চার ঘটায়"

ছোট শহর 'হাইফা'। বেশ ছিমছাম ও পরিপাটি। চারদিকে ছোটখাটো খেজুর গাছ। অদূরে ধূসর বর্ণের পাহাড়। ১৯৪৪ সালের ৯ এপ্রিল সেদিন! শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিলো এক ফুটফুটে নবজাতিকা। তুলতুলে শরীর! খাড়া নাক! চাঁদের মত উজ্জ্বল গায়ের রং। পিতা-মাতা আদর করে নাম রাখলেন "লাইলা" পরবর্তীকালে এসে সেই নবজাতিকাই ইসরাইলী বর্বর সন্ত্রাসীরে আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন!

লাইলা খালেদের পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন লেবানীজ। তারা ফিলিস্তিনে এসে নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বেশ অনেক আগে। কিন্তু নিজ দেশে তাদের আর থাকা হলো না!

ইসরাইলী বাহিনীর নৃশংসতা ও অত্যাচার দিনের পর দিন বাড়তে থাকলো। প্রাণ ও মান-সম্মানের ভয়ে বহু লোক দেশ ত্যাগ করলো।

অনেকের সাথে লাইলার মা-ও দেশ ত্যাগ করলেন শিশু বাচ্চাদের নিয়ে। চলে গেলেন দক্ষিণ লেবাননে! লাইলার পিতা থেকে গেলেন স্বদেশে। হাতে তুলে নিলেন অস্ত্র। ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু সেনাদের ওপর। লাইলা তখন চার বছরের শিশু। তারা ছিলেন আট ভাই বোন!

জন্মের পরপরই লাইলা গুলির শব্দ ও বারুদের গন্ধ শুঁকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন! বোমারু বিমানের কানফাটা শব্দ তাঁর বুকের কম্পন বাড়িয়ে দিতো। ভয়ে আশ্রয় নিতেন মাটির নিচে নিরাপদ ঘরে। এভাবে ছেলেমেয়েদের রক্ষা করা কষ্টকর! তাই তার পিতা তাদেরকে লেবাননে পাঠিয়ে দিলেন। লাইলা জানতো না তার পিতা এখন কোথায়! বেঁচে আছেন না মারে গেছে! এমন অসংখ্য শিশুরা জানতো না তার পিতার খবর!

লাইলার বয়স বাড়তে থাকে। এক দুই করে ঘটতে থাকে জ্ঞান বুদ্ধির প্রস্ফুটন! কচি মনে জন্ম নিতে থাকে প্রতিহিংসা, ক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগুন! মনে তার রাশি রাশি জিজ্ঞাসা! কেন ইসরাইলীরা আমাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলো? যুবকদেরকে কেন তারা হত্যা করছে? নিজেদের বাড়িতে কি কোন দিন তারা ফিরে যেতে পারবে না? পারবে না সহপাঠিদের সাথে আর কোন দিন খেলা করতে? কোথায় তারা সকলে? বেঁচে আছে তো, না মারা গেছে? তার চোখ ফেটে পানি আসতো। পিতার জন্য মন কাঁদতো!

সময় বয়ে যেতে তাকে তার স্বাভাবিক গতিতে। জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটতে থাকে লাইলার– একটু একটু করে। ছোট কাল থেকে তিলে তিলে জমে ওঠা ক্ষোভ ধীরে ধীরে প্রতিহিংসা ও জিঘাংসায় রূপ নিলো। এর মধ্যে ঘটে গেল এক ঘটনা। হঠাৎ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটলো মিসরে– ৫২ সালে জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে। মিসরের এই ঘটনা ফিলিস্তিনীদের মনে আশার সঞ্চার করলো। বাড়িয়ে দিলো সাহস। তারা নতুন উদ্যমে সংজ্ঞায়িত হতে থাকলো। এ সময় ডঃ জর্জ হাবশের নেতৃত্বে আরব জাতির আন্দোলন কমিটির নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লাইলার বড় ভাই এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৬৭ সালে ফিলিস্তিনী মুক্তি আন্দোলন নামে অন্য আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লাইলা এই সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। সে সময় তিনি কুয়েতের একটি ইংলিশ স্কুলে চাকরি করতেন। ১৯৬৯ সারে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। হাতে তুলে নেন স্বয়ংক্রিয় মারাত্মক

অস্ত্র। সামরিক প্রশিক্ষণ অল্প কিছু দিনেই রপ্ত করে নেন। যুদ্ধবাজ সৈনিকের মত দক্ষতা অর্জন করেন অল্প ক'দিনেই। বোমা আর গুলির শব্দ শুনে যে লাইলা গর্তে পালাতো, সেই লাইলা বোমা ও অস্ত্র হাতে পেয়ে বীরাঙ্গনার বেশে এগিয়ে গেলেন যুদ্ধের ময়দানে। মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। মানসপটে ভেসে উঠলো সখীদের সাথে খেলা করা হাইফার সেই খেজুর বাগানের কথা। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই বাগানের ধূলিকণায়– সেটিই তার জন্মভূমি! জন্মভূমি ছেড়ে পরভূমিতে কি ঘুম আসে!

কত মধুমাখা নাম– "জন্মভূমি।"

'ফিলিস্তিনী মুক্তি আন্দোলন' সংগঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণের অল্প ক'দিন পরের ঘটনা। লাইলা নেমে পড়লেন এক দুঃসাহসিক অভিযানে। বর্বর সন্ত্রাসীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে বৈধ সন্ত্রাসের মাধ্যমেই। বিশ্ব বিবেকের তুলে ধরতে হবে নিজেদের অধিকারের কথা তবেই না বীরত্ব প্রকাশ পাবে।

রোম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। বসে আছেন লাইলা। পাশে সংগ্রামী সাথী সেলিম ঈসায়ী। লাইলার শরীরে লুকানো স্বয়ংক্রিয় বোমা ও অস্ত্র! চোখের তারায় প্রতিহিংসার আগুন। বুক দুরু দুরু কাঁপছে।

অদূরে দাঁড়ানো পুলিশটি বেশ ক'বার লক্ষ্য করলো তাঁকে। জোরে নিঃশ্বাস নিলেন লাইলা। শরীরে একটি ঝাঁকুটি দিলেন। আত্মত্যাগী সংগ্রামীদের অভিযানে মৃত্যু ভয় থাকতে নেই। ঘড়ির দিকে দৃষ্টি সেলিমের। সময় ঘনিয়ে আসছে। এখনই ল্যান্ড করবে আমেরিকান ফ্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ার লাইন্স (TWA)-এর বিশাল বিমান। অপেক্ষার শেষ হলো এক সময়। ঘোষণা দেওয়া হলো এথেন্স ও তেলআবিবের যাত্রীদের সাথে দৃঢ় চিত্তে লাইলা ও সেলিম বিমানে গিয়ে চড়ে বসলো। সূচনা হলো শত্রুদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের।

লাইলা খালেদের এটিই হলো প্রথম বিমান ছিনতাই। (আরো দু'টি ছিনতাই করেছিলেন পরে।) এই ছিনতাইয়ের মাধ্যমেই তিনি ফিলিস্তিনী নিপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরলেন বিশ্ববাসীর সামনে সাহসিকতার সাথে।

বিমানের রুট ছিলো– নিউইর্য়ক রোম এথেন্স তেলআবিব। প্রেসিডেন্ট (পরবর্তী) ইসহাক রবিনের সেদিন এ বিমানে আসার কথা ছিলো। তিনি তখন ইহুদীদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন আমেরিকাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য লাইলার (অবশ্যই সৌভাগ্য রবিনের), অজ্ঞাত কারণে তার সে যাত্রা বাতিল হয়।

রানওয়ে ঘুরে ঘুরে বিমান কানফাটা আওয়াজ তুলে এ সময়ে উপরে উঠতে শুরু করলো। লাইলা জোরে একটি নিঃশ্বাস নিলেন। হ্যাঁ, এখনই সময়। বিমান

এখন উপরে ওঠা বাদ দিয়ে সোজাভাবে চলছে। কোমরের বেল্ট খুলে উঠে দাঁড়লেন লাইলা। সেলিমের সাথে চোখে চোখে কথা হলো! পাশের সিটের মানুষগুলো বুঝতেই পারলো না– অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে এই মহিলা এক দুঃসাহসিক কাজ করতে যাচ্ছে! এ মহিলার কোমরে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও বোমা। লাইলা সোজা চলে গেল বিমান চালকের ককপিটে। পাইলটকে নির্দেশ দিলেন বিমানের গতি পরিবর্তন করতে। পাইলট লাইলার দিকে তাকালো। চোখে বিস্ময় তার! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। এই মহিলা তাকে বিমানের গতি পরিবর্তন করতে বলছে! বরফের মত শান্ত স্বরে লাইলা শেষ নির্দেশ দিলেন, "গতি পরিবর্তন কর।" পাইলট এই কণ্ঠ শুনে ভয় পেয়ে গেলো। গতি পরিবর্তন করলো সে। লাইলা সাথে সাথে ঘোষণা করলেন– সম্মানিত যাত্রী মহোদয়, "অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদের দুঃসংবাদ দিচ্ছি যে, বিমানটি এখন ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলন কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে। তারা বিমানটি ছিনতাই করছে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের দাবীতে। স্বদেশ উদ্ধার আন্দোলনের একটি অংশ এটি তাদের।"

যাত্রীদের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেলো। বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপছে তাদের! কি হবে এখন! এই বুঝি ভবের লীলা সাঙ্গ হলো। ঈশ্বর আর গডের নাম জপতে লাগলো তারা।

সে সময় লাইলা খালেদের নাম ছিলো "ক্যাপ্টেন শাদিয়া আবু গাজালা"! এটি ছিল তার ছদ্মনাম। শাদিয়া আবু গাজালা ছিলেন ফিলিস্তিনী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম মহিলা আত্ম-উৎসর্গকারী কর্মী। ১৯৬৯ সালে 'নাবালুস শহরে তিনি নিহত হন। লাইলা ওরফে শাদিয়া আবু গাজালা পাইলটকে এথেন্স থেকে মুখ ঘুরিয়ে বিমান তেলআবিবের দিকে নিতে বললেন। লাইলা সকল বিমান ঘাঁটিতে তার বিমান, বিমান ছিনতাইয়ের খবর জানিয়ে দিলেন। সাথে সাথে জানিয়ে দিলেন তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা।

বিমান এক সময় ফিলিস্তিনের উপকণ্ঠে এলো। লাইলা দেখলেন ইসরাইলী জঙ্গিবিমান তাদের বিমানটিকে ঘিরে ধরেছে। বিমানটিকে তারা কোন প্রকারেই তেলআবিব বিমান বন্দরে নামতে দিবে না। লাইলা ও সেলিমের মনে তখন স্বদেশে অবতরণের উদম্য আগ্রহ! ঘটনা কি ঘটে ও মোড় কোন দিকে নিবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। অন্য দিকে ইসরাইলী কন্টোল টাওয়ার থেকে লোকটি তাদেরকে অশ্রাব্য গালি দিচ্ছিলো, লাইলা তাকে জব্দ করার মনস্থ করলেন। লাইলা তাকে বলতে বাধ্য করলেন যে, "বল, ফিলিস্তিন আরব স্বাধীন রাষ্ট্র।

ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলন সংগঠন বিমানটি ছিনতাই করছে।" বাধ্য ছেলের মতো কন্টোল টাওয়ারে বসে গালি দেওয়া লোকটি উপরের কথাগুলো আওড়াতে লাগলো। অবস্থা তখন চরম উত্তেজনাকর। পাইলট, তার সহযোগী এবং ইখিনিয়ার অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলো! ভয়ে তাদের গলা শুকিয়ে গেছে। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়েছে। না জানি এখনেই বিমানটি ধ্বংস হয়ে যায়।

অবশ্য লাইলা ও সেলিমের তেলআবিব বন্দরে অবতরণের তখন আর তেমন ইচ্ছা ছিলো না। তাদের ইচ্ছা ছিলো ইসরাইলী বর্বরদের জানিয়ে দেয়া– আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পেতে চাই। জানিয়ে দেয়া নিপীড়িত ফিলিস্তিনিবাসীকে যারা জেলখানায় ছোট কুটিরে ও অন্যত্র রয়েছে, যে আমরা বীর জাতি! অধিকার আদায়ের জন্য আমরা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। মৃত্যুকে বরণ করবো তবুও সন্ত্রাসী ইহুদীদের অবৈধ বশ্যতা স্বীকার করবো না।

উত্তেজনার পরিস্থিতি তখনো কাটেনি। যাত্রীদের মুখ ভয়ে পাংশা হয়ে গেছে। প্রহর কাটছে মৃত্যুর অপেক্ষায়। কান্নার উঠে গেছে ততক্ষণে। লাইলা ও সেলিমও স্বস্তি পাচ্ছে না। কি করা যায় এখন? কি করা উচিত! সাহস করে হঠাৎ পাইলট প্রশ্ন করলো লাইলাকে–

– আমি এখন কি করবো? কোন দিকে যাবো?

– হাইফার দিকে। লাইলার গলা গুমগুম করে বেজে উঠলো!

– ওখানে তো বিমানবন্দর নাই?

– যা বলেছি তাই করো! এবং একটু নিচু দিয়ে উড়বে।

– ঠিক আছে।

বিমানের মাথা ঘুরে গেল হাইফা শহরের দিকে। জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন লাইলা! ছোট-বড় খেজুর গাছ আর ধূসর বর্ণের বালু যেন চেয়ে আছে বিমানের পানে। মরুর বুকে উটের দল আপন মনে ঘাস চিবুচ্ছে! তার প্রিয় জন্মভূমি হাইফা শহর এই। কোথায় ছিলো তাদের ঘর? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বার বার ঘুরে ফিরতে লাগলো লাইলার। কিন্তু না, তাদের বাড়ি খুঁজে পেলেন না। হয়ত বাড়ির কোন চিহ্নই নাই। বুলডোজার দিয়ে ইহুদী বাহিনী তা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে! দীর্ঘ বিশ বছর পর জন্মভূমির দর্শন মিলল তাঁর। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য। অতি নিকটে এসেও জন্মভূমিতে পা রাখতে পারলো না। এই জন্মভূমিতে তার শিশুকাল কেটেছে। এখানেই চির নিদ্রায় শুয়ে আছে তার পিতা। তবুও আনন্দ– জন্মভূমির নিপীড়িত মানুষের জন্য আজ সে কিছু করতে পেরেছে। তাদের বীরত্বপূর্ণ

সংগঠিত হওয়ার কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে পেরেছে। তাঁর পিতার আত্মা হয়ত কবরে শুয়ে শুয়ে মেয়ের দুঃসাহসিক অভিযান দেখে মুখ টিয়ে হাসছে আর বাহবা দিচ্ছে।

লাইলা ভাবলেন, এভাবে সময় নষ্ট করা সমীচীন নয়। যা হোক, কিছু তো করতে হবে। তেলাআবিব টাওয়ারের সাথে একাধারে যোগাযোগ রক্ষা হয়ে চলেছে। তার দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বার বার জানতে চাওয়া হচ্ছে। আমেরিকা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেভাবেই হোক ছিনতাইয়ের এই ঘটনার অবসান দরকার। লাইলা ঘোষণা দিলেন বিমান ও তার যাত্রীদেরকে অক্ষত রাখা হবে যদি ইহুদীদের জেলখানায় আটক সফল সংগ্রামী নেতা কর্মীদের মুক্তি দেয়া হয়। তারপর পাইলকে দামেশকের দিকে বিমান চালাতে নির্দেশ দিলেন লাইলা।

এটি ছিলো লাইলা খালেদের প্রথম বিমান ছিনতাই। দ্বিতীয়বার ছিনতাই করেন একটি ইসরাইলী বিমান। এই ছিনতাই ঘটনার লাইলার সাথী নিকারাগুয়ার এক সংগ্রামী কর্মী। বাট্রিক আউর গুয়াইলিলি মৃত্যুবরণ করেন বিমানে মধ্যে পিস্তল যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে। এই বিমানে তৎকালীন ইসরাইলী সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন। অনেক ঝক্কি-ঝামেলার পর বিমানটিকে থিব্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয় এবং বাটরিকের লাশ তার পিতা-মাতাকে হস্তান্তর করা হয়। এই ছিনতাইয়ের ফলে লাইলা ইউরোপের কারাগারে বন্দি তাঁর সহকর্মীদের মুক্তি করতে সমর্থ হয়। সাথে সাথে ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামকে জোরদার করতে বিশ্ব বিবেকের সমর্থন আদায়েও সমর্থন হন।

একটি মেয়ের পক্ষে বারবার বিমান ছিনতাই করা জটিল বৈ কি? কিন্তু লাইলার কাছে তা মোটেও জটিল ছিল না তবে তাকে যেন কেউ চিনতে না পারে, সেজন্য অবশ্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন তিনি। তার মধ্যে প্রধান হলো প্লাস্টিক সাজারী। ১৯৭০ সালে তিনি পাল্টিক সার্জারী করান। তবে তা চেহারাকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য নয়, যেন তার সঠিক পরিচয় কেউ না জানে।

লাইলা খালেদ একটি উৎসাহ, একটি আতঙ্ক। বীরাঙ্গনা এই মহিলা পৌঢ় বয়সে এসেও ফিলিস্তিনী 'ইনতেফাদা'কে জোরদারের জন্য সাহস ও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্নভাবে আন্তরিকতার সাথে, বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে।

ফিলিস্তিনী নিপীড়িত, বঞ্চিত জনগণ তাদের অধিকার ফিরে পাক, এই আমাদের কামনা।

বীর শহীদ আনোয়ার পাশা
মুসলিম জাতির বিপ্লবী কণ্ঠস্বর

সমাজতন্ত্রের অতন্ত প্রহরী সোভিয়েত রাশিয়ার লাল বাহিনী ও তাদের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলিম দেশে তুর্কিস্তানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিস্ট পার্টির সেচ্ছাসেবক দল এবং তাদের সহযোগী দল অর্থাৎ বোখারায় সবেমাত্র সংগঠিত একটি বিপদগামী সংঘ অর্থাৎ নবীন বোখারীর দলের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামী ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র জ্ঞান নগরী বোখারার ঐতিহাসিক পতন ঘটে। তৎসহ সহস্রাধিক বছরের লালিত জানা লোক বিতরণকারী দেদীপ্যমান মশালগুলোও চিরকালের তরে নির্বাপিত হয়ে যায়।

সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত, সমস্ত রুশ সম্রাজ্য খৃস্টানদের সবচেয়ে কট্টোরপন্থী সম্পদ্রায় গ্রীক অর্থডক্সোর মতাবলম্বী জার সম্রাটের শাসনাধীনে ছিল। অত্যাচারী জারের দুর্দান্ত শাসনে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। যদ্দরুন দেশময় বিপ্লব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে রুশ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম মধ্য এশিয়ার তিনটি মুসলিম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় ছিল। সেগুলো ছিল বোখারা খীবা ও খোকন্দ। অষ্টদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে নির্মম অত্যাচারী খৃস্টান শক্তি জার সম্রাটের বিরুদ্ধে একের পর এক জিহাদ করে কোনমতে অস্বিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে এসে যখন রুশীয় খৃস্টান শক্তি ধর্মের খোলস ছুড়ে ফেলে দিয়ে নাস্তিকতার রূপ পরিগ্রহণ করে এবং সারা বিশ্বে তাদের সৃষ্ট মতবাদ ঝছিয়ে দিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রথমতঃ খৃস্টান ধর্মের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় একে স্বাগত জানালেও পরিশেষে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল মুসলিম তরুণও এই মতবাদ ও আন্দোলন করে নেয়। ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম যে দলের আর্বিভাব ঘটে তারা ছিল তুরস্কের তরুণ সম্প্রদায়। সমস্ত দেশ জুড়ে তারা অসংখ্য ক্লাব ও সংঘ প্রতিষ্ঠা করে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ শাসন প্রচলনের প্রচেষ্টা চালায়।

দ্বিতীয়ত ঃ এই আন্দোলন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রণালীর ক্ষেত্রে একটি কার্যকর সংশোধনী আনয়ন করে তার মাধ্যমে বৈষয়িক শিক্ষা ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের পরিবর্তন সাধন করা। সমাজ সংস্কারের নিমিত্ত এই আন্দোলন পরিচালিত হলেও অতিসত্বর ইহার

পরিধিও বৃদ্ধি পেল এবং অনতিবিলম্বে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ করার পথ সুগম করে দিল।

নবীন তুরকী আন্দোলনের সাথে মুসলিম অধ্যুষিত মধ্য এশিয়ার সদ্য সৃষ্ট আন্দোলনসমূহের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ধর্মের সাথে এই সমস্ত আন্দোলনের কোন সম্পর্ক না থাকার দরুন ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলনসমূহ নাস্তিকতার রূপ পরিগ্রহণ করে। সর্বোপরি ১৯১৭ সনে রুশ বিপ্লবের সাথে সাথে এই সমস্ত আন্দোলন আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতবাদ পরিত্যাগ করে নাস্তিকতাকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করে সকলেই একতাভুক্ত হয়ে যায়।

এখন হতে সবার উদ্দেশ্য হল একটাই অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলরে নামে সারা বিশ্বে নাস্তিকতা মতবাদের প্রতিষ্ঠা করা।

এতক্ষণ পর্যন্ত নামমাত্র জীবিত সবকয়টি মুসলিম দেশে নতুনত্বের জোয়ার বইতে আরম্ভ করল। তুরস্কের মহান খলীফা এই বিস্ফারিত জোয়ারের ধাক্কায় ভেসে যেতে লাগলেন। নবীনদের এক কুচক্রী নেতা পাশ্চাত্যের আদরের দুলাল কামাল পাশার দুর্দান্ত আঘাতে দেড় হাজার বছর ধরে লালিত খেলাফতের সুদৃঢ় রজ্জুখানা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে খান খান হয়ে গেল। দিশাকুল হারা মুসিলম মিল্লাত যারা এতদিন পর্যন্ত পরিত্রাণের ক্ষীণমান আশা হৃদয়ে পোষণ করে লবেজান হয়ে বেঁচেছিলেন, এবার তারা প্রমাদ গুনতে আরম্ভ করলেন।

পূর্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া হতে আরম্ভ করে পশ্চিমের বোসনিয়া এবং উত্তরের ককেশাস অঞ্চল হতে দক্ষিণঞ্চলের সমস্ত মুসলিম এলাকাই তখন তাদের চিরশক্র খৃস্টানদের করতলগত। রাজনৈতিক স্বার্থ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে দু-তিনটি মুসলিম দেশ শেষবারের ন্যায় একটু শ্বাসগ্রহণের নিমিত্ত মুমূর্ষ রোগীর ন্যায় হাঁপাচ্ছিল। তথাপি ঈমানের বলে বলীয়ান সারা বিশ্বের একদল মুসলিম জান-প্রাণ দিয়ে কোরবান হলেও ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বৃহত্তম ঐক্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

খেলাফতেই ছিল ইসলামী ঐক্যের একমাত্র প্রতীক বেই কলংকিত দিনটি যেদিন মুসলিম নামধারী এক নবনেতার কলংকিত হাতে পরিসমাপ্তি ঘটে। ইসলামী ঐক্য ও জাগরণের ক্ষীয়মাণ আশাটুকুও ঘূর্ণিবার্তার প্রবল আঘাতে বিলীন হয়ে গেলো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস তখন পর্যন্ত পরাধীন ভারতের একদল তরুণ মুসলিম খেলাফত রক্ষার অদম্য প্রচেষ্টায় জীবন প্রাণ কোরবান করে একটার পর একটা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি স্বেচ্ছাসেবকরূপে পর্যন্ত করেছিলেন।

মুসলিম মিল্লাতের মহান কর্মবীর মৌলানা মোহাম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, পীর মাশায়েখ ও একদল আলেম ওলামা এদেশ থেকে খেলাফত রক্ষার শেষ চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। গাছের গোড়া কেটে উপরে পানির দারা দিলে যা

হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। মহান বাঙালি বীর সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী জীবনভর এই ব্যথার অগ্নিশিখা হৃদয় পোষণ করে শেষ দুখের সাগরে ভেগে আত্মবিসর্জন দিলেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক ছিল মিল্লাতে ইসলামিয়ার চরম বিপর্যয়ের বছর। পতনের সূত্রপাত তার এক শতাব্দী পূর্বে শুরু হলেও এই দলকে এসে তা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহণ করল। বিশ্বের সব চেয়ে সমৃদ্ধশীল যে সমস্ত অঞ্চল তার সবটুকসহ অর্ধেক পৃথিবী যাদের সুদৃঢ় কব্জায় ছিল আজ তারা সেসব কিছু হারিয়ে দলছুট মেঘের ন্যায় ক্ষুধার্থ ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়ে আত্মরক্ষার সর্বশেষ চেষ্টা স্বরূপ শুধু চিৎকার করতে লাগল।

শিকারী বিড়ালের প্রখর থাকায় আক্রান্ত অর্ধমৃত মুষিকেরা যেরূপ ভক্ষণের পূর্ব মুহূর্তে শিকারীর পায়ে আঘাতে এদিক ওকিক চটকা চটকীর বস্তুতে পরিণত হয়ে তাকে পশ্চিম এশিয়ার নামমাত্র মুষিক শাসকের ন্যায় শিকারী বিড়ালের খেলার দ্রব্যে পরিণত হয়ে এদিক ওদিক কিছুটা উলট পালট হয়ে হোঁচট খেতে থাকে।

মধ্য এশিয়ার নগর প্রান্তর কানগিরি রাজপ্রাসাদ ও লোকালয়ে যা এতকাল যাবৎ দীন ইসলামের মোহাফেজখানা ছিল তা একে একে রুশিয়া খৃস্টানদের পদানত হয়ে গেলে। মুহূর্তকাল পরেই তারা পরিবর্তিতরূপে আবির্ভূত হয়ে অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুর এবং নির্মম স্বভাব ও আকৃতি ধারণ পূর্বক খৃস্টানদের পরিত্যক্ত এলাকাগুলোও গ্রাস করে নিল। মধ্য এশিয়ার সর্বশেষ ঘাঁটি বোখারার পতনের সাথে সাথে সেখানে হতে ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্যের নাম ধাম সব কিছুরেই অবসান হল। বোখারাসহ সমস্ত মধ্য এশিয়ায় সমাজতন্ত্রের নামাঙ্কিত নাস্তিকতার পতাকাও উত্তোলিত হল।

বিংশ শতাব্দীর ৩য় দশক। দিল্লীতে ইসলামের মাতম জারির দিন। সহস্র বছরের ইসলামী জ্ঞান কেন্দ্র বোখারার পতন হয়েছে। তাকিকিস্তানের মুসলমানদের মাঝে প্রবল উত্তেজনার বিরাজ করছে। বোখারার দূর-দূরান্তর নিকটবর্তী এলাকা সবখানেই বিবাদ ও ক্রোদের ঢেউ খেলছে। ঠিক এই মুহূর্তেও বিংশ শতাব্দীর অমিত তেজা তুর্কি বীর আনোয়ার পাশার অভ্যুদয় হল। বিক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্ত কবর প্রয়াসে তিনি এগিয়ে এলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে তুরস্কে আধুনিকতার জোয়ার বইতে আরম্ভ করেছিল। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ সবখানেই পাশ্চাত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করল। এখনই এক অশুভ মুহূর্তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল। এই নীতিই ইসলামের কর্ণধার তুরস্কের বক্ষে একটি মারাত্মক বিষফোঁড়া সৃষ্টি হল। যে বৈদ্য এই বিষফোঁড়ার চিকিৎসা করতে এগিয়ে এল পরে সেই বৈদ্যই বিষফোঁড়াটিতে সারাতে গিতে মুমূর্ষু রোগীকেও দুনিয়া হতে বিদায় করে দিল।

এই বৈদ্যই হলেন আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল পাশা। শৈল্য চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়েই কামাল পাশা রাজনীতির হাল ধরলেন। ধর্মের নামগন্ধ হতে আরম্ভ করে জাতীয় ভাষায় ব্যবহৃত অক্ষরসমূহ পর্যন্ত তিনি ছিড়াই ফাড়াই করে নিজ হাতে গড়া পুতুলের ন্যায় তুরস্ক গঠন করে ছাড়লেন। চলার পথে কোন বাধাকেই কামার পাশা সহ্য করতে পারলেন না।

তুরস্কে আধুনিকতার বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আনোয়ার পাশা কামাল পাশার পরম শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। তার উঠতি শক্তির সম্মুখে আনোয়ার পাশাকে নিজেকে বিপন্ন মনে করেন। বাধ্য হয়ে তিনি জার্মানী চলে গেলেন। এখানে থাকাও তার মনঃপুত হল না। এরপর তিনি মস্কো চলে গেলেন।

ইংরেজ বিরিাধিতার ব্যাপারে তিনি বলশেভিকদের সমমনা ছিলেন। সুতরাং বাকুর মহা সম্মেলনে তিনি বলশেভিক শক্তিকে স্বাগত জানালেন। সমাজতন্ত্রের প্রশংসা করলেন এবং ইংরেজ রাজতন্ত্রের প্রতি চরম নিন্দা জ্ঞাপন করলেন। এতদসত্ত্বেও আনোয়ার পাশার প্রতি বলশেভিকদের পুরাপুরি আস্থা অর্জিত হয়নি। তুর্কী সরকারের পক্ষ থেকে আনোয়ার পাশা বলশেভিকদের নিকট বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করলেন। কিন্তু বলশেভিকদের নিকট এই ক্ষীয়মাণ শক্তির কোন গুরুত্বই ছিল না। কেননা কামাল পাশার প্রতিশ্রুতিই তখন তাদের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইহার পর কামাল যখন রুশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন, তখন কামাল পাশার ইঙ্গিতে আনোয়ার পাশার প্রতি কড়াকড়ি আরোপ করা হল। আনোয়ার পাশা জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তার মান-সম্ভ্রম ও প্রভাব প্রতিপত্তি দারুণভাবে বিঘ্নিত হল। নিজ দেশেও এখন তার মর্যাদা বিলুপ্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও ধর্মীয় গণ্ডির বহির্ভূত আদর্শ ও সংস্কৃতির ধ্বজাজারী তরুণদের হাতে দেশের সর্বময় ক্ষমতার কুঞ্জিকা আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু অমিত তেজা বীর কেশরী কোন কিছুতেই দমিবার পাত্র নয়। তার দুর্বার শক্তি কারও নিকট অজ্ঞাত নয়। তিনি সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বোখারায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানে বলশেভিকদের স্বপক্ষে কয়েকটি বিবৃতিও প্রদান করলেন। যদ্দরুন বলশেভিকরা তার অতি আস্থাবান হলেন। এমনকি নতুন বোখারা সরকার তাকে লাল বাহিনী পুনর্বিন্যাস করার ভারও অর্পণ করলেন। তিনি সানন্দ চিত্তে এই ডাকে সাড়া দিলেন এবং সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। বলশেভিক সেনাবাহিনীতে থেকেও আনোয়ার পাশা অতি সংগোপনে ইসলাম-এর প্রতি সহানুভূতিশীল এরূপ লোকের অনুসন্ধান করতে থাকেন। অতি সত্তর তার সে সুযোগ হস্তগত হল।

বোখরার রিপাবলিকের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রধান ওসমান খোদিও ছয়শত সেনাসহ তার অনুগামী হলেন। আনোয়ার পাশাও ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। ওখান হতে পলায়ন করে তাজিকিস্তানে চলে গেলেন। কেননা তাকিকিস্তান তখন

গেরিলা যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। ওসমান খেদিভও দলবলসহ এসে তার সঙ্গে মিলিত হলেন। এখানে এসে তিনি একটি বিশেষ ঘোষণাপত্র দিলেন। যাতে বলশেভিকদের ইসলামের শত্রুতার করুণকাহিনী তুলে ধরলেন। এই ঘোষণায় অবদমিত মুসলমানরা দলে দলে আনোয়ার পাশার জিহাদী পতাকার তলে সমবেত হলে লাগতেন।

মুসলমানরা এতদিন এ অবনতির শেষ প্রান্তে পৌছেছিলেন। ধর্মহীনতা ও অর্থপ্রীতি তাদের ওপর আধিপত্র বিস্তার করেছিলেন। সত্যিকার অর্থে এতদিন পর্যন্ত যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল। শক্তিশালী নেতৃত্ব ও সংঘবদ্ধতা ছাড়া জনসাধারণ কখনও সংগঠিত হয় না। শুধু কাগজের বুলিতে মানুষ আস্থা স্থাপন করতে পারে না। বীর কেশরী আনোয়ার পাশার তুমুল যুদ্ধের পর বলশেভিকদের নিকট থেকে কয়েকটি শহর পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

অতঃপর আনোয়ার পাশা এবং সমাজতন্ত্র হতে প্রত্যাবর্তনকারী অন্যান্য মুসলমানরা বোখারার সমাজতন্ত্রী মুসলমানদের নিকট একটি আবেগময়ী পত্র লিখলেন। যার ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

বোখারার বলশেভিক সরকার ও তার পরিষদবর্গ আনোয়ার পাশার এহেন আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তথাপি তার যাবতীয় দোষত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে তাকে বোখারার ফিরে এসে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানালেন। এমনকি তার হারানো মান-মর্যাদা ফিরিয়ে দিবারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। বীর কেশরী আনোয়ার পাশা এই মন যোগানো প্রতিশ্রুতির কোনও প্রকার তোয়াক্কা না করে তাদের নিকট পাল্টা পত্র দিলেন।

বোখারাবাসী ভাই সকল। আমাদের সালাম গ্রহণ করুন। আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় আমরা মংগল মতই আছি। আপনাদের বদান্যতার দরুন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা পত্রে উল্লেখ করেছেন ঃ (মূল ভাষার অনুবাদ)

আন্দোলনের শুরু থেকে আপনি বোখারার বিপ্লবের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আর যে সময় আমরা আপনাকে সেনাবাহিনীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় আপনি দায়িত্বহীন কতিপয় স্বার্থন্বেষী ব্যক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হলেন। আবার ফিরে আসুন আপনার সর্বপ্রকার দোষত্রুটি ক্ষমা করা হবে।

বোখারাবাসী ভাইসব আপনাদের বদান্যতা সত্যিই নজিরবিহীন।

০ হ্যাঁ আমাকে বলুন, আপনারা কি সেই লোক নয়, যারা রুশীয় বলশেভিকদের সহায়তা বোখারাকে লুণ্ঠন করেন নাই? নিপীড়িত জনসাধারণের যে সামান্য অর্থ সম্পদ অবশিষ্ট ছিল তা কি ছিনিয়ে নেন নাই?

০ আপনারা কি সেই লোক নয়– যাদের দ্বারা আমাদের পবিত্র স্থানসমূহ মসজিদগুলো এবং মাদ্রাসাসমূহ পদদলিত হয় নাই?

০ আমাদের নিঃস্ব জনতাকে বুর্জোয়াম জাগীরদার, ভূস্বামী ইত্যাদি নামে অভিহিত করে তাদের জান ও মাল উভয়টাকে লুটে নেয়া হয় নাই?

০ আপনারা কি সেই লোক নন– যারা স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে বলশেভিক ও কম্যুনিজমের মত ভ্রান্ত মতবাদসমূহ গ্রহণ করেন নাই?

০ শুধু রুটির টুকরার বিনিময়ে আপনারা অভিশপ্ত শরীয়তের হাতে আপনাদের ধর্ম আপনাদের ঈমান এবং অন্তঃকরণ বিকিয়ে দিয়েছেন; আপনারা যে সব স্বাধীনতা ও মুক্তির পতাকা উত্তোলন করে এগিয়ে এসে বোখারা প্রাচীরে আরোহণ করেছেন। এখন বলুন তো আপনাদের সেই স্বাধীনতা ও মুক্তি কোথায় রয়েছে? বোখারায় ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের তুফান আরম্ভ হয়েছে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে আপনাদের কার্য নির্বাহী কমিটির সভাপতি এবং বিপ্লবের কর্মধার আজ আপনাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। তিনি এই মিথ্যার বোঝা গর্দানে উঠাতে প্রস্তুত নন।

০ আমি যেহেতু মাতৃভূমির সন্তান। দেশের উন্নতি ও মংগলেই আমার একান্ত কাম্য। আমি এর জন্য সংগ্রাম করছি এবং ভবিষ্যতেও করব যে পর্যন্ত না বলশেভিক রুশ এবং তোমাদের ন্যায় বিশ্বাস ঘাতকদের কাছ থেকে পবিত্র ভূমি মুক্ত করতে পারি। বৃহত্তর বোখারার কোন সন্তান সত্যিকার অর্থে জাতির মংগল কামনা করেন, তোমাদের এই অপবিত্র ধান ধারণা গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে না।

০ আজ আমাদের চোখ বোখারার লাখ লাখ জনতাকে মহর প্রাচীরের অভ্যন্তরের পাহাড়ের উপত্যাকায় উলংগ তরবারির ঝংকার করতে করতে জাতির শত্রুদের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে দেখছ।

০ ওহে কমিউনিস্টরা আমরা দেশের সৎসন্তানদের সাথে হাতে হাত ধরে কাঁধে কাঁদ মিলিয়ে লড়াই করতে থাকব। আমরা শুধু স্বাধীনতা এবং উন্নতির জন্য রিক্রুট করা সৈন্য নই। সত্যিকার অর্থে আমরা জাতির সেবক। আমরা অতি সত্বর মাতৃভূমিকে রুশের থাবা থেকে মুক্তি প্রদান করব।

আল্লাহ অশেষ কৃপায় আমাদের মত ও পথ সঠিক। আমাদের নীতি ও আদর্শ পবিত্র। দেশের আনাচে-কানাচে থেকে মুসলামনদের তাদের মহান ধর্ম ও আদর্শ রক্ষাকল্পে সশস্ত্র হয়ে আমাদের সাহায্যে অগ্রসর হচ্ছে। আপনারা যদি ইসলামের সাচ্চা সৈনিক হতে চাহেন। তাহলে অভিশপ্ত রুশদের আমাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়নের জন্য আমাদের সহায়তা করুন। আমাদের এই কামনা ও বাসনা।

আনোয়ার পাশা যেভাবে অগাধ পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতা সহকারে ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জাতিসমূহকে একত্রে গ্রোথিত করতে চেয়েছিলেন দুর্ভাগ্যবশত তা আর হল না।

নৈতিকতা ও আদর্শ ছাড়া সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কিছু করলে তা বেশি ফলোদয় হয় না। অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও গোত্রীয় কলহ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

ইব্রাহিম বেগ যিনি আনোয়ার পাশার আগে গেরিলা দলসমূহের নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমানে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং আনোয়ার পাশার বিরোধিতা করতে লাগলেন। তিনি ইরানের সাথে সলাপরামর্শ করতে লাগলেন এবং আনোয়ার পাশার বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু বলে ইরান সরকারের কান ঝালাপালা করে তুললেন। আমীর আলম খান বারবার যিনি ইব্রাহীম বেগকে আনোয়ার পাশার অনুগত থাকার জন্য উপদেশ দিয়ে আসছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও আনোয়ার পাশার বিরোধী হয়ে উঠলেন। ইব্রাহিম বেগ সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। কাজেই আনোয়ার পাশা তাকে পাঁচ দিনের জন্য আবদ্ধ করে রাখেন। পরে বাধ্য হয়ে ইব্রাহিম বেগ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলশেভিকরাও গেরিলা দলগুলোর মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টায় রত ছিলেন। তারা কথাবার্তা কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে গেরিলাদলগুলোকে উচ্ছৃংখল ও আনুগত্যহীন করতে চাইলেন। আনোয়ার পাশার ন্যায় সমরকুশলী সেনাধ্যক্ষের কাছে বাহিরের কোন ষড়যন্ত্রই কামিয়াব হল না।

ইব্রাহিম তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে সাছাইতে গমন করলেন এবং স্বাধীনভাবে অবস্থান গ্রহণ করে আনোয়ার পাশার পথে বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন।

অপরদিকে এক নেতা ফয়জুল্লাহ ও তার থেকে পৃথক হয়ে গেল। এখন ময়দানে আনোয়ার পাশা একা রইলেন। আর রইল লাল বাহিনীর প্রবল চাপ। তিনি অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে আফগান সীমানার নিকট ছাউনি ফেললেন। যাতেসময় মত সীমান্তের অপর পার হতে সাহায্য সহযোগিতা লাভ করা যায়।

৪ আগস্ট ১৯২২ সাল। জোয়ান এবং খুজলং পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক উপত্যকায় এক বিরাট জনসমাবেশে আনোয়ার পাশা ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় লাল বাহিনীর একটি কলম সেখানে উপনীত হল এবং পথরোধ করে দাঁড়াল। এখন যুদ্ধ ও আত্মসমর্পণ ছাড়া তার সামনে আর কোন পথই খোলা রইল না।

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হল আনোয়ার পাশার তার দুর্ধষ সংগী-সাথীসহ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। বিশ্ব কাপানো এক সমর বিশারদের তিরোধান হল। জগতের কোন প্রতিকূলতাই তার সম্মুখে বাধা হতে পারেন নাই। আজ তিনি নিজেই প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়ে এ নশ্বর জগৎ থেকে বীরের ন্যায় বিদায় নিলেন। আনোয়ার পাশার হাতিয়ার এবং উর্দী এখনো তাশখন্দের যাদুঘরে সুরক্ষিত রয়েছে।

ইমাম শামিলের উত্তরসূরীরা আমৃত্যু জিহাদ চালিয়ে যাবে

চেচেনযোদ্ধা শামিল বাসায়েভ

শামিল বাসায়েভ

জন্ম ঃ ১৯৬৫।

জন্মস্থান ঃ গ্রাম- ভেদেনো, ভেদেনো জেলা, চেচেন প্রজাতন্ত্র।

পরিবার ঃ তিন ভাই; ১৯৯৫-এর শুরুতে ভেদেনোর শুরুতে এক ভাই নিহত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিরওয়ানী বাসায়েভ ছিলেন বামুট নগরীতে একজন কমান্ড্যান্ড।

বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত।

জীবন ধারা ঃ ১৮৮৭ সালে তিনি মস্কো ইনস্টিটিউট ল্যান্ডে টেনিওর নিয়ার্স এ ভর্তি হন।

১৯৯১ সনে আগস্ট মাসে রাশিয়ায় মস্কোতে হোয়াইট হাউস প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সনে রাশিয়া থেকে চেচনিয়া ফিরে আসেন এবং পিপলস অব ককেশাসের কনফেডারেশন বাহিনীতে সেনাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৯২ সনে আগস্ট মাসে তিনি আব্ খাজিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৪-এর জুলাই পর্যন্ত তিনি আফগানিস্তানে খোস্ত প্রদেশে প্রশিক্ষণে। ১৯৯৪-এর গ্রীষ্মকালে তিনি জাখোর দুদায়েভের পক্ষে সামরিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৫-এর ১৪ জুন তিনি রাশিয়ার বুদেনোভস্ক নগরীতে হাসপাতাল দখল করেন, চেচনিয়ার পরিস্থিতির ওপর বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।

১৯৯৬-এর এপ্রিল মাসে তিনি চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন।

১৯৯৬-এর ডিসেম্বর মাসে চেচেন প্রজাতন্ত্রের আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য তিনি সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। ১৯৯৭-এর ২৭ জানুয়ারী তিনি নির্বাচনে ২৩.৫ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং মাসখাদোভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

শহীদ হাসানুল বান্না ঃ আধুনিক বিশ্বে ইসলামী পুর্নজাগরণের তূর্যবাদক

পৃথিবী গর্ববোধ করে একটি সুসংগঠিত জাতিকে নিয়ে, আবার যে কোন সুসংগঠিত ও সুশৃংখল জাতির কাছে পৃথিবী অনেক কিছু আশা করতে পারে। যে জাতি নিশ্চিদ্র ঐক্যের সীসা ঢালা প্রাচীরে নিজেকে সুবিন্যাস্ত ও সুসংগঠিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছে সে জাতিই পারে স্বর্ণোজ্জ্বল একটি ইতিহাস পৃথিবীকে উপহার দিতে, সেইই হয় মানবতার গৌরব। তার দ্বারাই ঘটতে পারে মানবতার বিকাশ।

পক্ষান্তরে মানব প্রকৃতিই ঐক্যভিলাষী। সে প্রাকৃতিকভাবেই সামাজিব মানব সৃষ্টির উপাদানসমূহ, আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি যেমন অন্য বস্তুর সংমিশ্রণ ব্যতিরেকে ফলপ্রসূ কোন কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ, তেমনিই তৎসমষ্টি মানুষও তার একক সত্তা নিয়ে কোন কাজে অগ্রসর হতে পারে না। তাই মানবীয় বিকাশ ও মানব সমাজের উন্নতি অগ্রগতির জন্য বহু সত্তার সংঘবদ্ধতা ও ঐক্য আবশ্যক।

বহুধা বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, স্বতন্ত্রসত্তা ও স্বাধীনচেতা মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন ত্যাগী, সংযমশীল, আন্তরিক দুর্দান্ত সংগঠক ও আত্মপ্রত্যয়ী-দুসাহসী বীর। এরূপ লোকের ত্যাগ ও বিসর্জনের ফলেই মানব ইতিহাসের অধ্যায় এখনো চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

এক্ষেত্রে যাদের পদচারণা ইতিহাসে ভাস্বর, তাদের মধ্যে শহীদ হাসানুল বান্না একটি প্রসিদ্ধ ও অনন্য নাম। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর দুর্জয় ইস্পাত-কঠিন আত্মপ্রত্যয়ী একজন বীর মুজাহিদ। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সংগ্রামে তাঁর নাম ন্যায় উৎসর্গকৃতপ্রাণ আজো পৃথিবীতে বিরল। দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ সমাজের সকল মানব গড়া মতবাদের মূলোৎপাটন করে এবং বাহ্যশক্তির হাজারো ষড়যন্ত্রের মুখে ছাই দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের আলোকে পথ চলার যে মশাল তিনি জ্বালিয়ে গেছেন তার দীপশিখা এখনও মুসলিম সমাজে আলোকোজ্জ্বল রয়েছে।

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া নামক স্থানে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবদুর রহমান আল বান্নার পবিত্রগৃহে ১৯০৬ সালে এই দিনমণির উদয় ঘটে। মাতা-পিতার প্রাণাধিক আদরের সন্তান হাসানের অন্তরে অতি অল্পবয়সেই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের দীপ্তি পরিব্যাপ্ত হয়। ছোট্টমণি হাসান এখন ৩০ পারা

কুরআনের হাফেজ এবং মৌলিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত। এ সময় থেকেই তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হয় জাতীয়তাবোধ, প্রকাশ ঘটে খোদাপ্রদত্ত প্রতিভার। সমবয়স্ক বালকদের মাঝে তিনি বিস্তার করতে থাকেন ধর্মীয় জ্ঞানালোক, আদেশ নিষেধের মাধ্যমে বালকদের শিক্ষা দিতে থাকেন ধর্মীয় চেতনাবোধের। মাত্র ১৪ বছল বয়সে আলেকজান্দ্রিয়ার মাদ্রাসায় তিনি বিভিন্ন বিষয়সহ পুরা পাঠ্য শেষ করেন। ১৯২১ সালে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করতঃ নিজ কর্ম জীবনের সূচনা করেন। পরে তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কায়রোর দারুল উলুমে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ছিলেন চিন্তায় নিমগ্ন এক স্বতন্ত্র ছাত্র। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় চিন্তায় তিনি ব্যস্ত, মুসলিম বিশ্বের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর হৃদয়ে বুদবুদের ন্যায় প্রভূত প্রশ্নের উদয় হতে থাকে। তাঁর সুতীব্র আত্মজিজ্ঞাসা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাকে মুসলিম বিশ্বের অবক্ষয় করে তুলতে থাকে। ১৯২৭ সালে কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রী পাসের পর তাঁর অন্তরে প্রোথিত ইসলামী সংগ্রামের বীজ যেন মাটি ভেদ করে অংকুরিত হতে থাকে। মিসর তাঁর মাতৃভূমি। কিন্তু তিনি দেখেছেন মাতৃভূমিটি পরোক্ষভাবে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ। বাদশাহ ফারুক শাসিত মিসর বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে কার্যত একটি মিশ্র রাষ্ট্রে পরিণত। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ন্যায়-নিষ্ঠা, সততা ও দেশপ্রেম প্রায় বিলুপ্ত। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ইঙ্গ ফরাসী শক্তির প্রভাবে জাতীয় আয়ের সূত্রসমূহ যেন দেশীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে ঠেকেছে। দেশের আইন শৃংখলা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। শিক্ষা সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বস্তুতঃ ইহুদী-খ্রীস্টানদের ষড়যন্ত্রে প্রায় নিঃশেষিত। নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের যাঁতাকলে মিসর নিষ্পেষিত। নাচগান ব্যাভিচার ইত্যাদির মাধ্যমে মিসরের অভিজাত শ্রেণী যেন অমানুষে পরিণত। দেশের আলেম সম্প্রদায়ের মাঝে বিভিন্ন প্রকারের কু-সংস্কার ও মতানৈক্যের অনুপ্রবেশে তারা নির্জীব, নির্বাক ও নিষ্প্রাণ হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন জাতীয়তাবাদী শক্তি, জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য প্রচারণা শুরু করে। তাদের শ্লোগান ছিল "জাতিগত পরিচয় সকল কিছুর ঊর্ধ্বে, ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে।"

দেশের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় ও দেশী আগ্রসান থেকে দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গতানুগতিক আন্দোলন পর্যাপ্ত নয় ভেবে জনাব হাসানুল বান্না একটি ইসলামী বিপ্লবী সংগঠন, একটি দুর্জয় বিপ্লবী কাফেলা গড়ে তোলার ইচ্ছা করেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় ১ বছর চেষ্টা করেন ছয়জন সমমনা ব্যক্তির সন্ধান লাভ করেন। তাঁরা হলেন হাফেজ আব্দুল হামীদ, আবদুর রহমান হাসাবুল্লাহ, জকীউল নাগরেবী, আমানুল হাসবী, ইসমাইল হজ্জ ও ফুয়াদ ইব্রাহীম। এ ব্যক্তি সমষ্টির সংগঠনেই "ইখওয়ানুর মুসলিমীন" নামে অভিহিত হয়। ১৯২৮ সালের

মার্চে আলেকজান্দ্রিয়ায় ঘটিত এই ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমেই জনাব হাসানুল বান্না ইসলামী বিপ্লবের নব দিগন্তের সূচনা করে। তখন থেকে ইখওয়ান, সমাজ সংস্কার, তৌহীদের প্রচার ও জনগণের আত্মিক সংশোধনের জন্য মসজিদ ও গ্রামভিত্তিক তৎপরতা শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে ইকওয়ানের কেন্দ্রীয় দফতর আরেকজান্দ্রিয়া থেকে কায়রোতে স্থানান্তরিত করে সাংগঠনিক তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়। হাসানুল বান্না ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং বিভিন্ন স্থানে সংস্কার ও সেবামূলক কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯৩৬ সালে বাদশাহ ফুয়াদের সন্তান মুহাম্মদ ফারুক মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁরই প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ মাহমুদ পাশার নিকট হতে জনাব হাসানুল বান্না মিসরের যেসব স্থানে সরকারী বিদ্যালয় নেই সেসব স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ পান। এই সুযোগে তিনি বাদশাহ্ ফারুকসহ তৎকালীন অন্যান্য মুসলিম শাসকগণের নিকট ইসলামের মৌলনীতিমালা ব্যাখ্যা করে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে পত্র দেন।

এ সময় ইখওয়ান মুসলিমীন ইসলামী বিপ্লবে অপরাপর সংগঠনসমূহ থেকে অধিক পরিচিত ও শক্তিশালী সংগঠনের রূপ নেয়। একটি ইসলামী দুর্জয় শক্তি হিসেবে সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহে ভরা ছিল। যুদ্ধকালীন সময়টি মিসরের জন্য ছিল অতি নাজুক সময়। মিসরের ওপর বৃটিশ সরকারের প্রভাব ছিল ভয়াবহ। রীতিমত বৃটিশ মিসরের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছিল। মিসরের ওপর বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদের নীতি বাস্তবায়নের ইখওয়ানকে তারা প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে। এ কারণে প্রধানমন্ত্রী হুসাইন শিরি বৃটিশের চাপের মুখে ইখওয়ানের মুখপত্রত্রয়-এর প্রকাশনা বাতিল করে দেয় এবং হাসানুল বান্নাসহ ইখওয়ানের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের দূরে নির্বাসিত করে। পরে হাসানুল বান্নাকে কায়রো ডেকে এনে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু জনগণের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর নাসাহ পাশা মিসরের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনিও অন্যান্যদের ন্যায় ইখওয়ান প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি ইখওয়ানে নেতৃস্থানীয় সদস্যদের অতি অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু তিনিও ক্ষমতায় বেশি দিন টিকেত পারলেন না, বরং ১৯৪৪ সালে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। তারপর প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন আহমদ মেহের। তিনি ত্বরিত সাধারণ নির্বাচনের ডাক দেন। ইসলামী আন্দোলনকে তীব্রতর করার লক্ষ্যে ইখওয়ানও এই নির্বাচনে যোগ দেয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আহমদ মেহের ছলে বলে, কলা-কৌশলে জয় লাভ করে। বিজয়ী আহমদ মেহের নিজ শক্তিকে

প্রবল করার লক্ষ্যে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেন। এর ফলে জনগণের মাঝে দেখা দেয় অসন্তোষ, পুনরায় দেশে বিক্ষোভের ঝড় উঠে, এমন কি জনৈক আততায়ী তাঁকে হত্যা করে, আততায়ী মিসরের আদালতে আত্মসমর্পণ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উচিত ছিল দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেই মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়া। পরে এই হত্যাকাণ্ডের দায় দায়িত্ব বহন করতে হয় ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে। এমনকি উক্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে হাসানুল বান্নাসহ ইখওয়ানের বহু শীর্ষস্থানীয় নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইসলামের অদম্য সৈনিকদল ইখওয়ান কর্মীরা উক্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে আদালতের সাথে চ্যালেঞ্জ করলে বান্নাসহ সকলেই পুনরায় বন্দিশালা থেকে অব্যাহতি পান। শাসকগোষ্ঠী এমন জুলুম নির্যাতন ও ঘাত-প্রতিঘাতেও ক্রমে ইখওয়ান মিসরের সবচেয়ে প্রবল ও সম্ভাবনাময় দলে পরিণত হয়। জনাব হাসানুল বান্নার আপসহীন ভূমিকা ও অবিরত কর্মতৎপরতার ফলে মিসরে ইখওয়ানের দু'হাজার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৬ সালে "আল-ইখওয়ানুল মুসলেমুন" নামক একটি খ্যাতনামা দৈনিক, তাদের দলীয় মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। অন্য দিকে ইখওয়ান তার প্রত্যেক কর্মীর জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইখওয়ান বৃটেন কর্তৃক নিয়োজিত সৈন্য ও দেশীয় সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ সামরিক শক্তির বিকল্প একটি শক্তিশালী ইসলামী সেনাবাহিনী গঠনে সক্ষম হয়। এরই ভিত্তিতে জনসমর্থনপুষ্ট হাসানুল বান্না নাকরাশী পাশাকে স্বাধীনতার জন্য তীব্রভাবে চাপ দিতে থাকেন। এর জন্য তিনি সরকারের নিকট একটি স্মারক লিপিপেশ করেন। এতে বিষয়টির সমাধান না হওয়ায় লাখ লাখ কর্মী নিয়ে তিনি মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য বিক্ষোভে মিসরের আকাশ বাতাস মুখলিত করে তোলেন। সরকার ইখওয়ানের এহেন তীব্র আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করতে পারলেও নাকরাশী পাশাকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়েছে। এখন নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন মাহমুদ সিদ্দিকী। ইখওয়ান তখন দেশের অন্যান্য দলের সাথে জোটবদ্ধ

হয়ে আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়। চর্তুদিক থেকে ইখওয়ানে নির্যাতিত, এদিকে ঐক্য আন্দোলনেও ব্যর্থ এমনিই মুহূর্তে বাধ্য হয়ে একাধিক ইখওয়ানেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুনরায় তীব্রতর করে তোলে। কিন্তু সরকারের মনুষ্যত্ব পাশবিকতার কাছে হার মেনে যায়। সে কঠোর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ইখওয়ান কর্মীদের গ্রেফতার, বাড়ি তল্লাসীসহ নানাভাবে পৈশাচিক নির্যাতন চালাতে থাকে। সমাজের মহিলাদের অপমান অপদস্থকরা হয়। ফলে সিফকীর এহেন দমন নীতি দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত তার পদচ্যুতি ঘটে।

নাকরাশী পাশা পুনরায় ক্ষমতায় আসেন। হাসানুল বান্নাও আবার আন্দোলনের ডাক দেয়। ইখওয়ান কর্মীগণ পুনরায় মাঠে নেমে পড়ে। অবারিত ইখওয়ান কর্মীদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে সরকার।

ইতিমধ্যে বৃটিশের আশ্রয় প্রশ্রয় ও পুনঃ সহযোগিতায় ফিলিস্তিন ইহুদীদের জবর দখল এবং তথায় ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আরব বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ১৯৪৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর ফিলস্তিন মুক্তির জন্য। শুরু করে ইখওয়ানর এই আহ্বানের এই আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। ইখওয়ানের এই আহ্বানে আরব বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে আত্মউৎসর্গের প্রত্যয় ইহুদীবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে ইহুদী-খ্রীস্টান জগৎ বেসামাল হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরে মহাভীতির সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে আরব বিশ্বের যৌথ সেনাদল ফিলিস্তিনে ইহুদী বসতি স্থাপনায় আক্রমণ করে। এই সেনাবাহিনীতে মিসর, ইরাক, জর্দান, লেবানন, সিরিয়া ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাদের সাথে ইখওয়ান কর্মীরা ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনে অমিতবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা জানমাল কোরবানী করে সর্বাত্মক সংগ্রামে সাফল্যের ঈষৎ আলো যখন দেখছিলেন, ঠিক তেমনি সময়ে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের হাতের ক্রীড়নক মিসর সরকার এক সামরিক ইশতেহারে ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে বে-আইনী ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দলের কর্মীদের ঘরে ঘরে তল্লাশী চালায়। তাদের উপর দৈহিক নির্যাতনসহ নানাবিধ অত্যাচার চালায় এবং নেতৃস্থানীয় সকল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এমনিভাবে ইখয়ানের ইসলামী বিপ্লবকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার পাঁয়তারা করে। জনাব হাসানুল বান্নাকে প্রথমে গ্রেফতার না করলেও তাকে চিরতরে খতম করে দেওয়ার যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলছিল তা পরে ধরা পড়ে। ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় এক কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা করে টেক্সীযোগে ফেরার পথে একদল ঘাতক তাঁর গাড়ির ওপর অনবরত গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই জনাব হাসানুল বান্না শাহাদৎ বরণ করে কাঙ্ক্ষিত মনজিলে চলে যান। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তাঁর শাহাদাতের পর ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের একটি পর্যায়ের সমাপ্তি হলেও তার আরেক পর্যায়ে উত্তরণ ঘটে। তাঁর হাতে গড়া হাজারো কর্মী বছরের পর বছর ধরে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এখনো জনাব হাসানুল বান্না (রঃ)-এর বৈপ্লবিক আদর্শের ওপর বিশ্বের আনাচে কানাচে প্রভূত ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। যার জন্য জনাব হাসানুল বান্না আজও চির অমর হয়ে রয়েছেন।

আলজেরিয়ার এক বীর মুজাহিদ

বিশ্বব্যাপী ন্যায়ের যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা

উপনিবেশিক দখলদার ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে উত্তর আফ্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ চালিয়েছিলেন যে, সকল অকুতোভয় বীর মুজাহিদ তাঁদের অনেককেই সর্মান্তিক শাহাদত-বরণ করতে হয়েছে। তাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে উত্তর আফ্রিকার উষর ভূমি। তাঁদের অনেকেই হয়েছেন নির্বাসিত স্বদেশ ও স্বজাতি থেকে বহুদূরে এবং বিদেশের মাটিতেই ছেড়েছেন শেষ নিঃশ্বাস। তাঁরা ইতিহাসের পাতায় ভাস্কর হয়ে আছেন। যুগে যুগে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণারূপে। তাঁদেরই একজন বীর মুজাহিদ আব্দুল কাদির।

তিনি ছিলেন আলজিরিয়ার প্রথম জাতীয় বীর। পনেরো বছর তিনি সংগ্রাম করেছিলেন ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। বিদেশী আগ্রাসন এবং উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীকরূপে মুসলিম জাহান তথা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের নিকট থেকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন।

আলজেরিয়ার ওরান প্রদেশের মাসকরা শহর থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে ওয়াদী আল হাম্মাম। সেখান জন্মগ্রহণ করেছিলেন আব্দুর কাদির ১৮০৮ সালে। স্থানীয় হাশেমী গোত্রের মধ্যে তাঁর পরিবারই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। পবিত্র লোকদের পরিবাররূপে জনসাধারণ তাঁদের শ্রদ্ধা করত। তাঁর পিতামহ মোস্তফা মোহাম্মদ বিন মোখতার এবং সর্বোপরি তাঁর পিতা মুহিউদ্দীনের ধার্মিকতা এবং দানশীলতা পরিবারের জন্য এই খ্যাতি এনে দিয়েছিল। এই পরিবারটি দীর্ঘকাল বাস করছিল মরক্কোতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁরা ওরান প্রদেশে বসতি স্থাপন করেন।

তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন ধর্মীয় পরিবেশে। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তাঁর পিতার নির্দেশে আত্মনিয়োগ করেন অস্ত্র চালনা ও শরীরচর্চায়। শিগগিরই এত দক্ষতা অর্জন করেন, যা পরবর্তীকালে সহায়ক হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বীর মুজাহিদ এবং নেতার ভূমিকা পালন করতে। পিতার মতই ছিলেন সাহিত্যক এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত। তাঁর পিতা তাকে পাঠিয়েছিলেন ওরানে। ওরান তখন ছিল তুর্কীদের অধীনে। তখনকার তুর্কীদের সামরিক এবং রাজনৈতিক দুর্বলতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। আলজিরিয়ার বিদ্রোহী গোত্রগুলো তাঁর পিতাকে মেনে নিয়েছিল তাদের নেতা হিসেবে। ফলে তাঁরা পিতা তুর্কী গভর্ণর হাসান বে'র

কোপানলে পড়লেন। হাসান বে'র নির্দেশে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। অবশ্য পরে তিনি আলজিরিয়া ত্যাগের অনুমতি পেয়েছিলেন। তারপর মুহিউদ্দীন মক্কা ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সাথে নিয়েছিলেন আব্দুর কাদিরকে। দু'বছর সেখানে ছিলেন। এ ভ্রমণ আব্দুল কাদিরের মানসিক বিকাশে যথেষ্ট মহায়ক হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে এসে আব্দুল কাদির এবং তাঁর পিতা অবসর জীবন-যাপন করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাবলী তাঁদের নিয়ে এলো সংগ্রামময় কর্মক্ষেত্রে।

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফরাসীরা আলজিয়ার্স শহর দখল করে নয়। তুর্কী গভর্ণর হাসান যে আত্মসমর্পণ করেন। আব্দুল কাদিরের পিতা মুহিউদ্দীন ওরানে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আব্দুল কাদির যুদ্ধে সাহস, অশ্বারোহণে দক্ষতা এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

মুহিউদ্দীনকে আলজিরিয়ার গোত্রগুলো সুলতান উপাধি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি রাজি হননি।

সুতরাং তারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার জন্য আব্দুল কাদিরকেই নেতা বলে বরণ করে নেয়। পরবর্তীকালে তাঁকে সুলতান বলে ঘোষণা করা হয়। (২১ নভেম্বর, ১৮৩২)। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সে উপাধি তিনি ব্যবহার করেননি। কারণ, এতে ফেজ-এর শরীফ তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেন। ফলে নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি হতো অন্তর্বিবাদের। তাই তিনি আমীন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। চব্বিশ বছরের এই ধার্মিক তরুণ পরিণত হলেন বিপুল কর্মশক্তিসম্পন্ন এক বীর মুজাহিদরূপে। তাঁর সংগ্রাম এবং সাধনা ছিল ধর্মীয় চেতনা এবং মূল্যবোধে উজ্জীবিত। তাঁর এই প্রচেষ্টা সৃষ্টি করে আলজিরীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। তাঁর প্রথম কাজ ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ও আক্রমণকারী ফরাসীদের সাহায্যকারী গোত্র।

মাসকারা শহরে রাজধানী স্থাপন করে তিনি সমগ্র পশ্চিম এলাকা তাঁর শাসনের আনতে চেষ্টা কররেন। তাঁকে তখন দুই শত্রুর মোকাবেলা করতে হলো। এদিকে সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী শক্তি অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বজাতীয়গণ।

অবশেষে ফরাসীদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৪। কিন্তু এ চুক্তিটি ছিল অস্পষ্ট। আরবী এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত চুক্তিটিতে ছিল ভাষাগত পার্থক্য। তারই সুযোগ গ্রহণ করেন আব্দুল কাদির। এই চুক্তিটিতে কয়েকটি শহর বাদে ওরান প্রদেশ এবং আলজিরিয়ার আরও কিছু অংশের ওপরে আব্দুল কাদিরের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া হয়।

এই চুক্তির ফলে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। ফরাসীরা যে সকল স্থানে তখনও আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি সেগুলোও আব্দুল কাদির নিজের অধীনে আনতে লাগলেন। ফরাসী গভর্ণর জেনারেলের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি মেডিয়া ও মিলিয়ানা দখল করে নিলেন। সেসব জায়গায় মোতায়েন করলেন নিজের সেনাদল এবং কর্মচারী। সুতরাং ফরাসীদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধের সূত্রপাত হলো। কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী ফরাসীদের আশ্রয়গ্রহণ করেছিল। ফরাসীরা তাদের আব্দুল কাদিরের নিকট ফেরত দিতে অস্বীকার করল। তিনি তখন ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং মাকটার যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন। (২৬শে জুলাই, ১৮৩৫)। এই যুদ্ধে আব্দুল কাদির জয়ী হওয়ায় ফরাসীরাও অধিকতর সক্রিয় হলো। ফরাসী সেনাপতি মার্শাল ক্লাউজেল আব্দুল কাদিরের রাজধানী মাসকারা আক্রমণ করে তা পুড়িয়ে দিলেন। এছাড়াও ফরাসী সরকার আব্দুল কাদিরকে দমন করার জন্য বিখ্যাত ফরাসী সেনাপতি মার্শাল বুগিয়াউদলকে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে মার্শাল বুদিয়াউদের খ্যাতি ছিল। মেশওয়ার দুর্গে অবস্থানরত তুর্কীরাও তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। ফলে আব্দুল কাদিরের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। অবশেষে ওয়াদী সিক্কার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। এভাবেই ফরাসীরা মাকটার যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল। কিন্তু এ বিজয় ফরাসীদের জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কারণ, আবদুল কাদির দমে যাবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর সৈন্যেরা তাঁর দুর্দিনে তাঁকে তিবার পরিত্যাগ করলেও তিনি আবার তাদের একত্রিত করেন। এবার ফরাসীদের অবস্থাও খারাপ হয়ে গেল। তাদের দখল করা শহরগুলো কাদিরের সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলো। শুধু তাই নয়, ফরাসী সৈন্যদের তারা বার বার আক্রমণ করে হয়রান করতে লাগল। ফরাসীদের মিত্ররাও শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেলো না। ফরাসীদের আরও একটি বাহিনী কনস্টান্টাইন দখলের যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফরাসীরা এই অবস্থায় আব্দুল কাদিরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবশেষে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হলোশে (মে, ১৮৩৭)। এই চুক্তি তাফনা চুক্তি নামে খ্যাত।

এই চুক্তির ফলে আলজিরিয়ায় আব্দুল কাদিরের অধিকার আর বিস্তৃত হলো। আলজিরিয়ার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভূভাগ এসে গেল আব্দুল কাদিরের আধিপত্যে। তাফনা চুক্তির পরবর্তী দু'বছর আব্দুল কাদির নিজের শক্তি ও আধিপত্য বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করেন। সাহারা অঞ্চলে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আব্দুল কাদিরের বিরোধী ছিলেন। পাঁচ মাস অবরুদ্ধ থাকার পর তিনি আব্দুল কাদিরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। (১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৮)। তুর্কীরাও তাদের শাসনামলে এতদূর অগ্রসর হতে পারেনি। মোহাম্মদ তিজানীর পতনের পর অন্যান্য বিরোধী গোত্র নেতারা বুঝতে পারলেন আব্দুল কাদিরকে বাধা দেওয়ার মত শক্তি তাদের নেই।

এভাবে যুদ্ধ এবং কূটনীতির বলে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন একটি মুসলিম রাষ্ট্র। তাফনা চুক্তির পরবর্তী শান্তিপূর্ণ দু'বছর তিনি নতুন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, সংগঠন এবং শক্তি বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন। তুর্কী শাসনের আমলে আরজিয়ার্সে যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তিনি তার অনেকখানি দূর করলেন। সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলার জন্য গড়ে তুললেন একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী।

আলজিরিয়ার বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ছিল সাহসী যোদ্ধা। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল শৃঙ্খলার অভাব। আব্দুল কাদির তাদের সঙ্গে যোগ করলেন পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ বাহিনী সমবায়ে গঠিত সেনাদল। এদের প্রশিক্ষণের ভার ছিল তিউনিস ও ত্রিপলীর সৈন্য দল এবং ফরাসী বাহিনী থেকে পলাতক সৈন্যদের ওপর। তিনি সৈন্যদের পোশাক, খাদ্য, বেতন পদোন্নতি, শৃংখলা, সামরিক পুরস্কার বিষয়ে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন। সৈন্যদের জন্য খাদ্য গুদাম এবং অস্ত্র কারখানা তৈরী করেন। পুরাতন দুর্গগুলো মেরামত করে নির্মাণ করেন নতুন নতুন দুর্গ। কারণ, তাঁর লক্ষ্য ছিল খ্রীস্টান শক্তির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা।

তাফনা চুক্তির কতকগুলো ধারা নিয়ে ফরাসী সরকারেরর সঙ্গে আব্দুর কাদিরের মতভেদ হয়। চুক্তির শর্তসমূহ পরিবর্তনের জন্য ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে মার্শাল ভ্যালী আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হলো। ফলে ফরাসীদের সংগে বিবাদ অনিবার্য হয়ে উঠলে। মার্শাল ভ্যালী এবং ডিক ডি অর্লিন্সের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ফরাসী সেনাদল কনস্টানটাইন প্রদেশের ওপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে গেল। ফরাসীদের এই কার্যকলাপকে তাফনা চুক্তির লংঘন বলেই আব্দুল কাদির মনে করলেন; আর ফরাসীদের এই কাজটাই ছিল উস্কানিমূলক।

তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন এবং তাঁর সেনাপতি বেন সালেমকে মিতিজা আক্রমণের নির্দেশ দিরেন। ফলে সেখানকার ফরাসী খামারগুলো বিধ্বস্ত হলো এবং নিহত হলো বহু ফরাসী অধিবাসী। (২০শে নভেম্বর, ১৮৩৯)।

অবশেষে ফরাসী সরকার মার্শাল বুদিয়াউদকে গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করে পাঠালেন। ফ্রান্স এবং আব্দুল কাদিরের মধ্যে শুরু হলো রক্তক্ষয়ী জীবনমরণ সংগ্রাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল অসম যুদ্ধ। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের বিপুল সমরশক্তি, অপরদিকে উত্তর আফ্রিকার এক ক্ষুদ্র এলাকার আমীর। কাজেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বুগিয়াউদ বুঝতে পেরেছিলেন আলজিরিয়ায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে আব্দুল কাদিরের ক্ষমতা শেষ করতে হবে। তাই তিনি রণকৌশলের পরিবর্তন ঘটালেন। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৩

পর্যন্ত আব্দুল কাদিরের অধিকৃত বহু শহর দখল করতে তিনি সক্ষম হলেন। বহু সুরক্ষিত ঘাটির পতন ঘটতে লাগল। আব্দুর কাদিরকে বন্দি এবং তাঁর সমর্থনকারীদের ধ্বংস করার জন্য বুগিয়াউদ অভিযান পরিচালনা করে। তাঁর ভ্রাম্যমাণ রাজধানীও দখল করে নিলেন। (১৬ই মে, ১৮৪৩)।

এটা ছিল আব্দুল কাদিরের জন্য মারাত্মক আঘাত। আলজিরিয়ার গোত্রগুলো ফরাসীদের নিকট আত্মসমর্পণ করলো। আব্দুল কাদিরের পেছনে দাওয়া করলো ফরাসী সৈন্যদল। দুর্বল হযে পড়লেন তিনি।

বছরের শেষ দুর্বল আব্দুল কাদির আশ্রয় নিলেন মরক্কোর সীমান্তে। সেখান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে এই আশা করেছিলেন।

এদিকে মরক্কোর সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ ঘটে গেল। ফরাসীরা তানজিয়ার এবং মোগাদোরে গোলাবর্ষণ করে। (৬ ও ১৫ই আগস্ট, ১৮৪৪)। সুলতান মৌলে আব্দুর রহিমকে বাধ্য করা হয় আব্দুল কাদিরকে সমর্থন না করতে এবং তাঁকে বেআইনী ব্যক্তি বলে ঘোষণা করতে, কিন্তু চুক্তির এ ধারা বাস্তবায়িত হয়নি। আব্দুল কাদির আলজেরিয়া সীমান্তে অবস্থান গ্রহণ করে ঘটনাবলীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখলেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

১৮৪৬ সালে চতুর্দিকে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য আবার আবির্ভূত হলেন এবং প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেন সিদি ইব্রাহিমের যুদ্ধে। কিন্তু ফরাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োগ করল আঠারোটি সেনাদল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিরামহীন অভিযান চালিয়ে গেল। আবার তিনি হটে এলেন মরক্কোতে। কিন্তু ফরাসীদের চাপে মরক্কোর সুলতানও তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তাছাড়া অন্য কারণও ছিলো। সুলতানও তাঁকে তাঁর বিপজনক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলেন। বিভিন্ন গোত্র এবং সুলতানের সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আব্দুল কাদির আবার আলজেরিয়া সীমান্ত অতিক্রম করলেন। তাঁর শক্তি তখন নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তিনি দক্ষিণ দিকে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু সে পথও রুদ্ধ দেখে অবশেষে ফরাসীদের অবশেষে ফরাসীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। (২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৪৭)।

তাঁর আত্মসমর্পণের শর্ত ছিল তাঁকে তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া অথবা একার শহরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু ফরাসীরা এই প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেননি। তাঁকে ফ্রান্সের তুলোন শহরের পরে পাউ এবং এম্বয়সে সপরিবারে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৮৪৮ সালে আর একটি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় আব্দুল কাদিরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অস্থায়ী ফরাসী সরকার রক্ষা করতে পারেনি। এম্বয়সে তিনি ১৮৫২ সালের ১৬ ফিব্রুয়ারী পর্যন্ত ছিলেন। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট প্রিন্স লুই ফিলিপ তাঁকে তাঁকে মুক্তি দিলেন। (১৬ অক্টোবর, ১৮৫২)।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে কিছুকাল অবস্থান করে প্রথমে যান কনস্টান্টিনোপেলে, পরে ব্রুসায়। ব্রুসায় তিনি ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ভূমিকম্পে ব্রুসা শহরটি ধ্বংস হলে তিনি তুর্কী এবং ফরাসী সরকারের অনুমোদনক্রমে দামেস্কে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য চলে যান। ফরাসী সরকার তার জন্য পেনশন মঞ্জুর করেছিলেন।

দামেশকে তিনি যাপন করেন অবসর জীবন। তাঁর সংগ্রাম এবং সংঘাতময় জীবনের এই অখণ্ড অবসরে তাঁর সময়কে অধ্যয়ন, ধর্মকর্ম এবং তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দানের ব্যয় করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদিও ছিলেন কঠোর সংগ্রামী যোদ্ধা তবু তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে বিদ্রোহী দ্রুত মুসলমানরা খ্রীস্টানদের হত্যা করতে উদ্যত হয়। আব্দুর কাদির এই অন্যায়কে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি আলজিরীয় উদ্বাস্তুদের সহায়তায় ফরাসী কনসালসহ প্রায় পনেরোশ' লোককে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর এই মহৎ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ফরাসী সরকার তাঁকে দিয়েছিলেন Grand cross of the hegion of ghonour. উপাধি।

১৮৬৫ সালে ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাকে আলজিরিয়ার ভাইসরয় নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

একটি অভিজাত ধার্মিক মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন আব্দুল কাদির। ধর্মবিশ্বাসে বলীয়ান একজন ঈমানদার, নিষ্ঠাবান সত্যিকারের মুসলমান ছিলেন তিনি। কোরআন শরীফ এবং ধর্মীয় সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ পণ্ডিত্য। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা মুসরমানদের ছাড়াও অনেক ইউরোপীয়ানকেও করেছিল অনুপ্রাণিত। যেমন অস্ত্র চালনা তেমনি বাগ্মীতায় ছিল তাঁর দক্ষতা। তিনি কবিতাও লিখতেন। ব্রুসায় অবস্থানকালে তিনি রচনা করেছিলেন দর্শন এবং বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ। আর এস্বয়সের বন্দি জীবনে লিখেছিলেন আত্মজীবনী এবং আরও একখানি পুস্তক।

আলজিরিয়ার প্রথম জাতীয় বীর, মহান মুক্তিযোদ্ধা, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মানবতাবাদী আব্দুল কাদির স্বদেশ থেকে বহুদুবে সিরিয়ার দামেশক শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ত্যাগতিতিক্ষা এবং কঠোর সংগ্রামের পথ ধরে পরবর্তীকালে এগিয়ে এসেছিল লক্ষ লক্ষ অকুতোভয় মুজাহিদ। বহু রক্তের বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সকে হটিয়ে দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিল মাতৃভূমি আলজিরিয়ার স্বাধীনতা।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের রক্ত হিম করা আতংক

মহান সেনাপতি খাইরুদ্দীন বারবারোসা

তুরস্কের উত্তর প্রান্তে বসরুরাস প্রণালীর তীরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি সমাধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে সমাধি ধারণ করে আছে বিখ্যাত মুসলিম নৌ অধিনায়ক খাউরুদ্দীন বারবারোসার নশ্বর দেহ। তার যুগে যে সকল মুসলিম-অমুসলিম নৌসেনাপতি ছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি শুধু ওসমানীয় সাম্রাজ্যের গৌরবকেই বড় করে তুলেননি, ইসলামের ইতিহাসেও সংযোজন করে গেছেন এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের (রাঃ) অনুমোদন নিয়ে সিরিয়ার গভর্ণর মোয়াবিয়া (রাঃ) মুসলিম নৌশক্তির সূত্রপাত করেন। মোয়াবিয়াকেই বলা যায় মুসলিম নৌশক্তির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। এরপর ক্রমবর্ধমান মুসলিম নৌশক্তি উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর, এমনকি দূরপ্রাচ্যেও আধিপত্য বিস্তার করেছে। মোয়াবিয়া বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে দুশ' জাহাজের একটি বহর পাঠিয়েছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে বাইজান্টাইনগণের ছিল ছশ' জাহাজ। কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বাইজান্টাইন নৌবহর পরাজয় বরণ করেছিল। ৩০ হিজরীতে মুসলিম সেনাপতি যুনাদা বিন আবু উমাইয়া আল-আজাদী বাইজান্টাইনদের নিকট থেকে রোডস দ্বীপ কেড়ে নিয়েছিলেন। ৪৩ হিজরীতে মোয়াবিয়া এক বিরাট নৌবহর পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু গ্রীকদের প্রচণ্ড আগুনে গোলাবর্ষণের মুখে নৌবাহিনী ফিরে আসে। ৬৮/৬৯ হিজরীতে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ২০০ জাহাজ সিসিলি আক্রমণ করেছিল। খলিফা আল-ওয়ালীদের রাজত্বকালে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ ও স্পেন ও সিন্ধুদেশ শক্তিশালী মুসলিম নৌবাহিনীর সাহায্যে জয় করা হয়েছিল। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসায়েরের স্বল্পকালীন শাসনামলে শুধুমাত্র তিউনিসের জাহাজ নির্মাণ কারখানায় ‘কশ’ যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছিল। আব্বাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে মুসলিম নৌবহর ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর চষে বেড়িয়েছে। এমনকি কলম্বাসের পূর্বেই যে আরবরা আমেরিকায় পদার্পণ

করেছিল এখন তা প্রমাণিত হচ্ছে। (Arab Discovary of Amirica edited by Dr. Hassan Zaman). খলিফা আল মামুনের রাজত্বকালে মুসলিম নৌবাহিনী সিসিলি জয় করে।

কিন্তু তুর্কী খেলাফতের সময় বিশেষ করে মহান খলিফা সুলাইমানের সময় মুসলিম নৌশক্তির চরম বিকাশ ঘটেছিল। মুসলমানদের পূর্বসূরিগণ নৌশক্তি বৃদ্ধির জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু সুলায়মান এদের চেয়ে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছিলেন। তাঁর নৌ সেনাপতিদের সাহস ও নৈপূণ্য স্থলবাহিনীর মতই অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। সুলায়মানের রাজত্বের প্রথমদিকে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর শাসকগণ ছিল অযোগ্য ও চরিত্রহীন। দেশের ভেতরের আরব অধিবাসীদের ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সমুদ্রতীরের শহরগুলোতে জলদস্যুদের আড্ডা। এই জলদস্যুরা সময়ে সময়ে ঐ সমস্ত দেশের পতাকা উড়িয়ে চলত। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে নিজেদের পতাকাই উড়াত। ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য জাহাজগুলো তারা লুট করত। লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে আসত নিজেদের বন্দরে। লোকজন ধরে নিয়ে আসত। বিক্রি করত ক্রীতদাস হিসেবে। যার ফলে একমাত্র তিউনিসেই ২০ হাজার খৃস্টান বন্দি ছিল এই দস্যুরা ১০ থেকে ২০টি জাহাজের একটি স্কোয়াড্রনের এক একজন অধিনায়ক থাকত। তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে সাহসী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিটিকে অধিনায়করূপে বাছাই করা হতো। এই জলদস্যুরা লোকজনকে হত্যা করত। নিজেদের আইন ছাড়া অন্য কোন আইন মানত না তারা। এদের অধিনায়করা ছিল জাহাজ চালনায় খুবই দক্ষ। তারা ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন এমনকি ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যান্ডের উপকূলীয় শহর ও গ্রামগুলো আক্রমণ করে লুটতরাজ করত।

খলিফা সুলায়মান বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তূর্কী নৌশক্তির বিকাশ সাধন করেছিলেন বটে। কিন্তু তিনি জানতেন নৈপূণ্যে, সাহসে, অভিজ্ঞতায় তার নৌ সেনাপতিগণ জলদস্যু অধিনায়কদের সমক নয়। তাই বিচক্ষণ শাসকের মত তিনি এই জলদস্যু অধিনায়কদের মধ্য থেকে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং সক্ষম লোকদের তাদের জাহাজ এবং লোকজন সমেত তাঁর অধীনে চাকরি নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তাঁর নৌবাহিনীর নিয়মিত অফিসারদের ডিঙ্গিয়ে আরও উচ্চপদে নিয়োগ করলেন এদের। কাউকে দিলেন এ্যাডমিরালের পদ, কাউকে নিয়োগ করলেন নৌবাহিনীর

প্রধান সেনাপতি হিসেবে। এদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল খাইরুদ্দীন। ইতিহাসে যার পরিচয় বারবারোসারূপে। প্রধানত তাঁর চেষ্টায় উত্তর আফ্রিকার মুসলমান দেশগুলো বশ্যতা স্বীকার করে নেয় তুরস্কের সুলতানাতের। ফলে তুর্কী নৌবাহিনীর শক্তির বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কারণ, সুলতানের নৌবাহিনী পেয়ে যায় আফ্রিকার উত্তর উপকূলের আল-জেরিয়া, তিউনিস ও ত্রিপলীর চমৎকার পোতাশ্রয়গুলো, সুদৃঢ় দুর্গ ও শহর, সুনির্মিত ও সুসংগঠিত নৌবহর, সর্বোপরি সাহসী ও সুনিপূণ নাবিক ও নৌঅধিনায়ক।

খাইরুদ্দীন বারবারোসা জন্মগ্রহণ করেন মাইটিলিনি দ্বীপে তাঁর পিতা ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। খাইরুদ্দীনের আরও তিনভাই ছিলেন। ইসহাক ছিলেন সকলের বড়। তিনি মাইটিলিনিতে ব্যবসা করতেন। ইলিয়াস ও উরুদুশ ব্যবসা করতেন, জলদস্যুতাও করতেন। এক নৌযুদ্ধে ইলিয়াস রোড্‌স দ্বীপের নাইটদের হাতে নিহত হন। উরুদুশ বন্দি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মুক্তি পান। খাইরুদ্দীন এবং উরুদুশ দেখতে পেয়েছিলেন উত্তর আফ্রিকার মুসলমান শাসকরা দুর্বল। অপরদিকে তুর্কী সাম্রাজ্যের শক্তির কথা তারা জানতেন। তাই তুর্কী সুলতানের আনুকূল্য পাওয়ার জন্য কনষ্টান্টিনোপলে তারা পাঠালেন মূল্যবান উপঢৌকন। পরিবর্তে পেলেন দু'টো যুদ্ধজাহাজ এবং সম্মানসূচক পোশাক। উত্তর আফ্রিকার উপকূলের কয়েকটি ছোট শহরের অধিপতি হয়ে উঠলেন তাঁরা। মাইটিলিনি দ্বীপের ব্যবসায়ী তাদের বড় ভাই ইসহাকও এসে যোগ দিলেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে তাঁদের জাহাজের সংখ্যা বাড়ালেন এবং আলজিয়ার্সসহ আরও কয়েকটি স্থান দখল করে নিলেন। স্পেনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে শিগগিরই নিহত হলেন ইসহাক ও উরুদুশ। খাইরুদ্দীন একাই বিজিত স্থানসমূহের অধিকারী হয়ে গেলেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিলেন তুরস্কের সার্বভৌমত্ব। সুলতান সেলিমের নিকট থেকে পদমর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ পেলেন একটি অশ্বারোহীর বাঁকা তলোয়ার, একটি অশ্ব এবং একটি নিশান। বারবারোসা স্পেনীয়দের এবং দুটো স্বাধীন আরব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। আলজিয়ার্স বন্দরের সম্মুখে একটি দ্বীপ প্রায় চৌদ্দ বছর স্পেনীয়দের দখলে ছিল। খাইরুদ্দীন তা দখল করে নেন। শুধু তাই নয় সেখানকার স্পেনীয় সৈন্যদলকে সাহায্য করার জন্য প্রেরিত একটি নৌবহরকেও পরাজিত করে দখল করে নেন। খাইরুদ্দীন তার এই কার্যাবলীর রিপোর্ট নিয়মিতভাবে পাঠাতেন কনস্টান্টিনোপলে। তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল ফরাসী উপকূল বা ফরাসী জাহাজ আক্রমণ না করতে ; কারণ, ফ্রান্সের সঙ্গে তুরস্কের সন্ধিসূত্রে বন্ধুত্ব ছিল।

স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের প্রিয় যুদ্ধ নিপুণ সেনাপতি ছিলেন ডোরিয়া। জারবেল দ্বীপের নিকট খাইরুদ্দীন ডোরিয়ার এক আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং জলদস্যু সিনানের জাহাজগুলো সঙ্গে নিয়ে ভিন্ন এলাকা বিধ্বস্ত করেন। তারপর স্পেনের অত্যাচারিত ৭০,০০০ মুসলমানকে উদ্ধার করে আলজেরিয়ায় নিয়ে আসেন। এরফলে আলজেরিয়ায় খাইরুদ্দীনের অবস্থান আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে ডোরিয়া তুর্কীদের নিকট থেকে কারোন দ্বীপ দখল করেছেন। সুলায়মান বুঝেছিলেন মুসলিম নৌ সেনাপতিদের মধ্যে একমাত্র খাইরুদ্দীনই পারেন ডোরিয়ার মোকাবেলা করতে। তাই সুলায়মান স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা নিয়ে আলোচনার জন্য খাইরুদ্দীনকে ডেকে পাঠালেন কনস্টান্টিনোপলে। ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে ১৮টি জাহাজ নিয়ে খাইরুদ্দীন আলজিয়ার্স থেকে যাত্রা করেন। পথে ডোরিয়ার দু'টো জাহাজ দখল করে নিলেন।

সুলতান সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে সারাটা শীতকাল কনস্টান্টিনোপলের অস্ত্র কারখানাগুলো চুরাশিটি জাহাজের একটি শক্তিশালী বহরকে অস্ত্র সজ্জিত করার জন্য কর্মমুখর রইল। ১৫৩৪ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে খাইরুদ্দীন ইতালীর উদ্দেশ্যে জাহাজগুলো নিয়ে রওনা হলেন। আর সুলায়মান পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। বারবারোসার হাতে বিধ্বস্ত হলো ইতালীর কয়েকটি শহর।

পরবর্তীকালে সুলায়মান খাইরুদ্দীনকে নিয়োজিত করলেন তিউনিস জয় করতে। মৌলে হাসান তখন তিউনিসের শাসনকর্তা। মৌলে হাসান ছিল চরিত্রহীন। সে তার চুয়াল্লিশ ভাই-এর মধ্যে তেতাল্লিশ জনকেই হত্যা করে তিউনিসের কর্তা হয়ে বসেছিল। সে নীচ আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকত। খাইরুদ্দীন অনায়াসেই তিউনিস জয় করে তাকে বহিষ্কার করলেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন এই শহর নিজের দখলে রাখতে পারলেন না। মৌল হাসান স্পেনের রাজা চার্লসের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাল। চার্লস নিজ পরিচালনায় পাঁচশ জাহাজ আর ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে খাইরুদ্দীনকে আক্রমণ করল। এবার খাইরুদ্দীনকে পরাজয় বরণ করতে হলো। খাইরুদ্দীন পরাজিত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিলেন, আর তাঁর জাহাজগুলো চার্লস দখল করে নিল। দুঃখজনক হলেও সত্যি, তিউনিসের অধিবাসীরা স্পেনীয়দের আক্রমণের মোকাবিলায় খাইরুদ্দীনকে কোন সাহায্যই প্রদান করেনি। তার ফলটা তারা

হাতে হাতেই পেল। অমানুষিক ও অবিশ্বাস্য বর্বরতা এবং নিষ্ঠুরতার সাথে স্পেনীয় সৈন্যদল তিউনিসে লুটতরাজ, ধ্বংস আর হত্যাকাণ্ড চালাল।

তুর্কী শাসন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল তিউনিস। স্পেনীয়রা অযোগ্য, চরিত্রহীন মৌল হাসানের হাতে তিউনিস ফিরিয়ে দিল বটে তাও স্পেনীয়দের ওপর নির্ভরতার শর্তে। অবশেষে তিউনিস তুর্কীদের দখলে এসেছিল কিন্তু তাও বহু বছর পর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে। যদিও বারবারোসা তিউনিস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছিলেন আলজিয়ার্সে। সেখান থেকে সতেরটি জাহাজ নিয়ে স্পেনের অধীন মিনার্কা দ্বীপ আক্রমণ করে লুটতরাজ করেন। এভাবে স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। তারপর তিনি কনস্টান্টিনোপল চলে যান। সুলতান তাঁকে নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করলেন। তাঁর উপাধি হলো ক্যাপ্টেন পাশা। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইতালীর উপকূল বিধ্বস্ত করেন। ভেনিস সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভেনিসের অধীন প্রায় সবগুলো দ্বীপ দখর করে নিয়েছিলেন। তিনি কারোন শহরও পুনরুদ্ধার করেছিলেন স্পেনীয়দের নিকট থেকে। খাইরুদ্দীন সম্ভবত তার জীবনের সবচেয়ে বড় এবং বীরত্বপূর্ণ নৌযুদ্ধে লিপ্ত হন ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর। খৃষ্টান ধর্মগুরু পোপ, ভেনিস এবং রাজা চার্লসের সম্মিলিত নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর জাহাজ সংখ্যা ছিল কম। আকারেও ছোট। কিন্তু সেই যুগের শ্রেষ্ঠ নৌসেনাপতি খাইরুদ্দীন বারবারোসা নৌযুদ্ধে তার নৈপুণ্য এবং সাহসিকতার দ্বারা শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ এবং গৌরবোজ্জ্বল জয়লাভ করেন। কিন্তু খৃষ্টানদের ভাগ্য ভাল ছিল বলতে হবে। রাত্রির আগমনের সুযোগে তাদের নৌবাহিনী বেশি ক্ষতি ছাড়াই পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু এই পরাজয় সত্ত্বেও চার্লস তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে আলজিয়ার্স আক্রমণ করেন। এবার খাইরুদ্দীনকে যুদ্ধ করতে হয়নি। প্রকৃতিই ছিল স্পেনীয়দের প্রতি বিরূপ। প্রচণ্ড ঝড়ে খাইরুদ্দীনের জাহাজগুলো পোতাশ্রয়ে আটক হয়ে রইল। কিন্তু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল স্পেনের জাহাজগুলো। সুলতানের আদেশে খাইরুদ্দীন তার শেষ যুদ্ধটি করেন ১৫৪৩ সালে। ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের নৌবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সুলতান সুলায়মান তুর্কী নৌবহরের সঙ্গে খাইরুদ্দীনকে প্রেরণ করেন। তিনি ফরাসী নৌবহরের সহযোগিতায় কাজ করছিলেন। তিনি নিস শহর দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু দুর্গটি তাঁর আক্রমণের মুখে টিকেছিল। ফরাসী নৌবাহিনীর রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়াও ছিল কর্তব্যে অবহেলা। এজন্য ফরাসী অফিসারদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের তিরস্কার করেছিলেন। তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে এই অভিজ্ঞ নৌযোদ্ধার তিরস্কার বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিল। ফরাসী নৌবহরের অধিনায়কের একান্ত অনুরোধ এবং ক্ষমা চাওয়ায় বারবারোসার রাগ পড়ে এল।

তাঁর জীবনের পরবর্তী বছরগুলোতে যখন সমুদ্রে তার কর্তব্য থাকত না, তখন নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন পাশা হিসাবে নিয়মিত উপস্থিত হতেন সুলতান সুলায়মানের মন্ত্রণাগৃহে। সেখানে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ শ্রবণ করা হত অত্যন্ত গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। ১৫৪৬ খৃস্টাব্দে সে যুগের শ্রেষ্ঠ নৌসেনাপতি, ইসলামের বিজয় ইতিহাসের গৌরব খাইরুদ্দীন বারবারোসা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফলে মুসলমানদের সোনালী যুগের আর একটি তারকা খসে পড়ল। তাঁর ধনৈশ্বর্য দান করে গেছেন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগ তাঁর জীবনের একটি মহৎ দিক আমাদের নিকট তুলে ধরে। তার মরদেহ সমাহিত করা হয় বসফরাসের তীরে যেখানে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের অথৈ পানির ঢেউ-যে সমুদ্রে তাঁর নৌবহর পরিচালনা করেছেন শত্রুর বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছেন অকুতোভয়ে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে, তাঁর বীরত্ব কাহিনী স্মরণ করে বসফরাসের তীরে তাঁর সমাধির পাশে। আর জানিয়ে যায় তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা।

রীফ নেতা মুজাহিদ আব্দুল করিম

আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বীর যোদ্ধা

মৃত্যুবরণ করেন সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁর গৌরবময় জীবনের বেদনাভরা স্মৃতি বুকে নিয়ে। মৃত্যু তাঁকে দিয়েছিল বন্দি জীবন থেকে মহামুক্তি। আর আব্দুল করিম কাটিয়েছিলেন ভারত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপ রিইউনিয়নে তাঁর নির্বাসিত জীবনের বিশটি বছর বিদেশীদের পদানত মাতৃভূমির বেদনাভরা স্মৃতি নিয়ে।

আব্দুল করিম জন্মগ্রহণ করেছিলেন মরক্কোর রীফ পার্বত্য অঞ্চলের আযাদীরে বার্বার গোত্রে ১৮৮২ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন একটি ইসলামী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কোরআন শরীফ শিক্ষার পর তাঁর পরিবার চলে যায় তিতুয়ানে। লেখাপড়া করার সময় ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন। তারপর ফেজের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে ১৯০৬ সালে একটি স্পেনীয় পত্রিকার আরবী বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর পরের বছর Spanish Burean of Native Affairs-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালে উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভ করেন তিনি। ১৯১৪ সালে নিযুক্ত হন মেলিল্লা অঞ্চলের প্রধান ধর্মীয় বিচারকরূপে। এভাবেই পরিচিত হন উত্তর মরক্কোর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরূপে। তাঁর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। এভাবেই তিনি উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য অর্জন করেন উপযুক্ত নেতার গুণাবলী।

মরক্কোতে স্পেন ও ফ্রান্সের আগ্রাসন ও সেখানকার অধিবাসীদের মুক্তি সংগ্রাম চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। জাতীয়তাবাদী একটি দলের ছত্রছায়ায় তৈরি করেছিলেন আরেকটি গোপন সংগঠন। তাদের কাজ ছিল বিদেশী আধিপত্যের বিপদ সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা। কিন্তু মরক্কোয় বাক্‌স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকায় তারা তানজিয়ার এবং তিউনিসের সংবাদপত্রগুলোর মাধ্যমে প্রচার চালাতেন। জাতীয় স্বার্থে তাঁদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন শেখ ও সুফীগণ। তাঁরাও আন্দোলন চালাতেন স্বাধীনতা, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংস্কারের জন্য। নেতৃস্থানীয় সদস্যরা ছিলেন শিক্ষিত ও বুদ্ধিদীপ্ত। সমকালীন পৃথিবীর প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা এবং মুসলিম দেশসমূহের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁদের ছিল সম্যক পরিচিতি। তাঁরা তৈরি করেছিলেন মার্গারব সংবিধান।

এই জাতীয়তাবাদী দলটির অনেক আশা-ভরসা ছিল সুলতান আব্দুল হাফিজের ওপর। তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁকে সুলতান বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে এবং বিদেশী ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সজাগ থাকতে সুলতানকে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন জাপান অথবা তুরস্কের মত সাংবিধানিক সরকার। কিন্তু ফরাসী সরকারের চাপের মুখে সুলতান আব্দুল হাফিজ তাঁদের আশা-আকঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হলেন।

ফরাসীরা জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছিল একটি বন্দর। বিদ্রোহ দমন এবং সুলতানকে রক্ষার অজুহাতে ফরাসীরা দখল করে ফেজ বন্দর। আর স্পেনের সৈনরা দখল করে পশ্চিম উপকূলের লার্স্ বন্দর। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারলেন না সুলতান আবদুল হাফিজ। তখনকার সময়ে আর একটি উদীয়মান শক্তি জার্মানী মরক্কোর ওপর স্পেন ও ফ্রান্সের একতরফা আধিপত্য স্বীকার করে নেয়নি। সেও নিজের উপস্থিতি জাহির করার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আগাদীর বন্দরে পাঠিয়ে দিল প্যানথার নামক একটি গানবোট। (জুলাই ১৯১১) দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর দু'টি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জার্মানী এবং ফ্রান্সের মধ্যে (নভেম্বর ১৯১১) স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স জার্মানীকে ছেড়ে দিল আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলের ২ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার স্থান। বিনিময়ে জার্মানীও স্বীকার করে নিল মরোক্কর ওপর ফ্রান্সের অধিকার। মরক্কো তথা মুসলিম জাহানের দুর্বলতার সুযোগে এই দুই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মরক্কোর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ল।

এবার ফ্রান্স সামরিক শক্তি প্রয়োগ করল। লক্ষ্য ছিল মরক্কোর দেশপ্রেমিকদের দমন এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন। ১৯২২ সালে সুলতান আব্দুল হাফিজকে মরক্কোর ওপর ফ্রান্সের অছিগিরি মেনে নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়।

কিন্তু সুলতান নতি স্বীকার করলেও জনসাধারণ নতি স্বীকার করেনি। একজন গোত্র সর্দার আল-জাইন আল-হাইয়ামী বিশ হাজার সশস্ত্র লোক নিয়ে ফেজ শহর আক্রমণ করলেন এবং সারাদেশের লোক ফরাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। ফরাসী প্রেসিডেন্ট জেনারেল এবং ফরাসী বাহিনীর অধিনায়ক লিয়াউটিকে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন।

১৯১২ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত নিহত হলো ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ফরাসী সৈন্য। গড়ে উঠেছিল পাঁচটি প্রতিরোধ কেন্দ্র। জাবালাই এবং রীফ অঞ্চল স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে ও মধ্য আটলাস, উচ্চ আটলাস, টাফিলেট আয়াত অঞ্চল ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল।

১৯০৪ সারে সম্পাদিত ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিল ফরাসীরা মরক্কো আক্রমণ করলে স্পেনও উক্ত অঞ্চল অধিকার করবে। সেই চুক্তি অনুযায়ী স্পেনের সৈন্যরা এই অঞ্চলে অবতরণ করে। কয়েক বছর যুদ্ধের পর জাবালাহ্ গোত্র স্পেনীয়দের বিতাড়িত করে। আটলাস পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা বহু বছর যাবৎ ফরাসী ও স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে রীফ নেতা আব্দুল করিমের দক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে তারা পরিচালিত হয়। তাঁর পিতা এবং ভাইয়েরাও স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য লড়াই করেছিলেন।

আব্দুল করিমের দক্ষ নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরও জোরদার হয়ে ওঠে। তিনি মাত্র তিনশ' লোক নিয়ে স্পেনীয়দের আক্রমণ করেন। পরাজিত হলো স্পেনীয়রা। নিহত হলো তাদের চারশ' লোক। রীফ বাহিনী অনেক গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিল পরায়নপর স্পেনীয় বাহিনী। সিদি বিসানেও যুদ্ধ হলো। সেখানেও ৩১৪ জন সৈন্যের মৃতদেহ রেখে পালিয়ে গেল স্পেনীয়রা। গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘঠিত হলো এনুয়েল নামক স্থানে। ছয় দিন যুদ্ধের পর স্পেনীয় সেনাপতি সিলভেস্টে পিছু হটে গেলেন। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল স্পেনীয় সৈন্যদের মাঝে। একশ' সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে গেল তারা। নিহত হলো হাজার হাজার স্পেনীয় সৈন্য। সাতশ' হলো বন্দি। তাদের ২০০ কামান, ২ হাজার রাইফেল ও কিছু যানবাহন আব্দুল করিমের হাতে এল। আরও অনেক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্পেনীয়রা মেলিল্লায় পিছু হটে গেল। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেশপ্রেমিক যুদ্ধারা দখল করে নেয়। ১৯২২ সালে স্পেনীয় রেসিডেন্ট জেনারেল বেরেংগুয়েন আবার আক্রমণ করলেন। কিন্তু পরাজিত হলেন এবং নিজেও আহত হলেন। যুদ্ধে ৫ হাজার স্পেনীয় সৈন্য নিহত এবং ৩ হাজার হলো বন্দি। মেলিল্লায়া উপসাগরে কয়েকটি স্পেনীয় জাহাজও ডুবিয়ে দেয়া হলো। অবশেষে যুদ্ধবিরতি হলো, যুদ্ধবন্দি বিনিময়ও করা হলো। কিন্তু ভেঙ্গে গেল শান্তির আলোচনা। কারণ, আব্দুল করিম দাবী করেছিলেন সকল স্পেনীয় সৈন্যকে প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু স্পেনীয়রা চেয়েছিল শুধু অভ্যন্তরীণ শাসনভার ছেড়ে দিতে।

১৯২৩ সালে পুনরায় যুদ্ধ বেধে গেল। আবার আলোচনায় বসল উভয় পক্ষ। আবার তা ভেঙ্গে গেল।

১৯২৪ সারে তেতুয়ান নদীর অববাহিকায় জাবলাহ্ গোত্র আব্দুল করিমের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। অবরোধ করল তেতুয়ান শহর। বিচ্ছিন্ন করে দিল তেতুয়ান এবং তানজিয়ারের যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফলে স্পেনীয়দের অবস্থা হলো সংগীন।

স্পেনীশ ডাইরেক্টর জেনারেল প্রিমো ডি রিভোরা তেতুয়ানে এলেন, নিজে দায়িত গ্রহণ করলেন এবং জারি করলেন সামরিক শাসন। মরক্কোতে নামতে লাগল নতুন নতুন স্পেনীয় সৈন্যদল। কিন্তু তারা শুধু গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের রক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল।

আবার শান্তি স্থাপনের জন্য আলাপ-আলোচনার বৈঠক বসল। স্পেনীয়রা যে যে এলাকা হারিয়েছে সেগুলো তারা আব্দুল করিমকেই দিতে চাইল। কিন্তু আব্দুল করিম দাবী করলেন মরক্কোর অন্যান্য অংশ থেকেও স্পেনীয় বাহিনীকে মেলিল্লায়া এবং সিউটক সীমান্ত পর্যন্ত প্রত্যাহার করতে হবে। ২ কোটি পেসেস্টা (স্পেনীয় মুদ্রা) স্পেনীশ কূটনীতিকরা এই শর্ত মানলেন না। সুতরাং ভেড়ে গেল আলোচনা। কিন্তু স্পেনীয় সৈন্যদল দু'শ সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

এতদিন আব্দুল করিম শুধু স্পেনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফরাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ফরাসীরা মরক্কোতে তাদের অধিকার সম্প্রসারিত করে, বিশেষ করে ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে।

প্রথমে তারা আব্দুল করিমকে মোকাবিলার কাজটা স্পেনীয়দের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখতে পেলেন তিনি একটির পর একটি বিজয় লাভ করে অনেক এলাকা পুনরুদ্ধার করছেন আর স্পেনীয়রা শোচনীয়ভাবে মার খাচ্ছে তখন তারা শংকিত হয়ে উঠল। বুঝতে পারল মরক্কোতে তাদের অবস্থানও বিপদাপন্ন। তাই তারা আব্দুল করিমের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য ওয়ের্গা উপত্যকা বার্বারগুলোতে আক্রমণ করে বসল। তিনি একেই সময়ে স্পেন ও ফ্রান্স এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে দু'ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন একটিকে পরাজিত করে আর একটির মোকাবিলা করতে। কিন্তু ফরাসীরে আক্রমণের ফলে তাদের বিরুদ্ধেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হলো। ১৯২৫ সালে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হলো ফরাসীরা। বার্বার গোত্রগুলো তাঁর পতাকার নীচে সমবেত হলো। এবার ফ্রান্স ও স্পেন উভয়ে সম্মিলিতভাবে তাদের কমন শত্রু আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলো।

তখন উভয় দেশ ছিল নিজ নিজ শ্রমিক সরকারের শাসনে। তারা তাদের পূর্বতন সরকারের নীতি পরিবর্তন করতে চাইল এবং এই ব্যয়বহুল উপনিবেশিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী তারা ছিল না। উভয় সরকার চেয়েছিল এই ব্যয়বহুল যুদ্ধের অবসান হউক। সেজন্য মরক্কোর সুলতানের নামমাত্র সর্বভৌমত্বের আওতায় রীফ এবং জাবালাহ্ অঞ্চলকে দিতে চেয়েছিল স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় বীর আব্দুল করিম তাদের এই করুণার দান প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র মরক্কো থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। সুতরাং তাঁকে যুদ্ধ করতে হলো।

ফ্রান্স ও স্পেনের মিলিত বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলো। আর কিফাস ও আল-বিবাসে যুদ্ধ হলো। পরাজিত হলো সম্মিলিত শত্রুবাহিনী। তখন ফরাসী সেনাপতি মার্শাল পেতা বাধ্য হলেন ফ্রান্স থেকে নতুন নতুন সৈন্য দল এবং সামরিক সরঞ্জাম আনতে। বিমান বাহিনীসহ পূর্ণ সজ্জিত বিশাল ফরাসী বাহিনী আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। পরাজিত হলেন রীফ আব্দুল করিম। (২৫ মে ১৯২৬) তাঁকে বন্দি করে রাখা হয় প্রথম ফেজ শহরে। তারপর তাঁকে সপরিবারে নির্বাসিত করা হয় সুদূর ভারত মহাসাগরের রিইউনিয়ন দ্বীপে।

সেখানে নির্বাসনে কেটে গেছে বিশটি বছর। জীবনের পরমায়ু থেকে ঝড়ে পড়েছে একটি দিন। হয়ত কেটেছে তাঁর তিন নির্জন সমুদ্রতীরে, হয়ত অপরিচিত জনতার কোলাহলে অথবা তাঁর সংগ্রামময় জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করে তাঁর দুর্ভাগা দেশ ও জাতির কথা স্মলন করে। কিংবা হয়ত কোন সামুদ্রিক ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের দিনে ভারত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় দেখেছেন বিদেশীদের পদানত স্বদেশ। জন্মভূমির বেদনা এবং বিদেশী সাম্রজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর রুদ্ধ আক্রোশের অভিব্যক্তি।

দীর্ঘ বিশ বছর পর একদিন ফরাসী সরকার তাঁকে দিল ফ্রান্সে যাওয়ার অনুমতি। এক নির্বাসন থেকে আর এক নির্বাসনে।

ফ্রান্সে যাওয়ার পথে তাঁকে বহনকারী জাহাজটি যখন অপরিসর সুয়েজখান অতিক্রম করছিল তখন তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিলেন সুয়েজখালের পানিতে। তীরে উঠে আশ্রয় চাইলেন মিসরের তৎকালীন রাজা ফারুকের নিকট। মিসরই ছিল তাঁর শেষ জীবনের আশ্রয়স্থল।

১৯৫২ সালে কর্ণেল নাসের যখন মিসরে ক্ষমতায় আলেন, তখন মিসরের রাজধানী কায়রো পরিণত হলো আরব জাগরণের কেন্দ্ররূপে। বৃদ্ধ আব্দুল করিমকে সকলে সম্মান করত, শ্রদ্ধা করত এবং দেখত উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে ঐতিহাসিক শক্তির প্রতীক এবং প্রেরণার উৎসরূপে। আরব জাহান, মুসিলম বিশ্ব, তথা সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক নক্ষত্র হিসেবে ইতিহাসে তিনি চিরদিন থাকবেন ভাস্কর হয়ে।

তিনি আর নিজ দেশে ফিরে যাননি। মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় আন্দোলন ও জাগরণের অন্যতম কেন্দ্র মিসরের রাজধানী কায়রো শহরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩।

তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ নতুন প্রজন্মের হাজার হাজার মুজাহিদ। তারাই মরক্কোকে মুক্ত করেছে বিদেশী শক্তির আধিপত্য থেকে ১৯৫৬ সালে।

তাই মৃত্যুর পূর্বে তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন বিদেশী শাসন ও শোষণমুক্ত মরক্কো। তাঁর সংগ্রামের ফসল স্বাধীন মরক্কো।

স্পেনের শেষ মুসলিম বীর : বুকের তাজা খুন দিয়ে শুরু যাত্রা যেখানে চোখের অশ্রু দিয়ে শেষ হলো

মুসলিম স্পেনের রাজধানী গ্রানাডা। সুদীর্ঘ আটশ বছর যাবত মহা গৌরবের সঙ্গে এখানে রাজত্ব করছে মুসলমানরা দোর্দন্ড প্রতাপে। অফুরন্ত ধন-দৌলত আর ফুলে-ফলে, লাত-পল্লবে, অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরপুর সারা নগরী। দেশ-বিদেশের বাণিজ্য বহর রাজপথে অবিশ্রান্ত ধারায় ধাবিত। সবুজ উদ্যান আর ফুল বাগিচার চারু বেষ্টনীর মাঝে দাঁড়িয়ে সভাসদ গৃহ 'আল-হামরা' প্রাসাদ। রাজা-প্রজা, আমির-ফকির, ছোট-বড় সকলেই মহা আনন্দে, সুখে কালাতিপাত করছে। কোথাও নেই অন্যায়, মিথ্যা-জুলুম। চারিদিকে শুধু শান্তির ফল্গু ধারা।

কিন্তু, এই অমিয় শান্তিধারা সহ্য হলোনা স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলার। পর পর দু'দুবার তারা গ্রানাডা নগরী আক্রমণ করে ফলমূল, শস্যাদি যা জন্মেছিল সবই লুটে নিয়ে গেল। আর যা নিতে পারলোনা, তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিল। কৃষকেরা বন্ধ করল চাষ-আবাদ। সমস্ত ফসল ধ্বংস করেও রাজ দম্পতির হিংসার অনল নিভলোনা। গ্রানাডাকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত যেন তাদের মনে স্বস্তি নেই। তাই, তারা ১৪৯১-এর এপ্রিল মাসের ১১ তারিখে, শীত মৌসুমে গ্রানাডার উদ্দেশে শেষবারের মত যাত্রা করলো। এক্কেবারে আদাজল খেয়ে। সাথে ৪০ হাজার পদাতিক এবং ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। মনের একান্ত আকাশ সম আকাংখা যতদিন আল-হামরায় খ্রীষ্ট ধর্মের নিশান না উড়বে, ততদিন নড়বেন না। গ্রানাডাকে সর্বদিক দিয়ে সম্পর্ণরূপে অবরোধ করে বসলেন রাজ দম্পতি। বিশাল বাহিনীর আবির্ভাবে উত্ত্যক্ত নগরবাসীদের মুখ শুকিয়ে কাঠ। অন্তর ত্রাসে কেঁপে উঠল। তাঁরা বুঝলো, শেষ পরীক্ষার দিন সমাগত। আসন্ন। সামনে মহা দুঃখের মহাসাগর। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

গ্রানাডার মুসলিম শাসক আবু আব্দুল্লাহ। তিনি মন্ত্রণা সভা ডাকলেন। মন্ত্রণা কক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছে দূরে ভেগা নদীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে খ্রীস্টান বাহিনীর শাণিত অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যুৎ ঝলক দিচ্ছে। মন্ত্রণা সভায় সবাই সন্ত্রস্ত। কী হবে! কী হবে!! কেউ কেউ পরামর্শ দিল আত্মসমর্পণ করার জন্য। কিন্তু মুসলিম বীরবাহু যার শিরায় শিরায় বিজয়ের রক্ত প্রবহমান, সিংহের ন্যায় যার সাহস; বুকে আল্লাহ

রাসূল (সাঃ)-এর ভালবাসার পর্বত। জান্নাতের সুঘ্রাণের জন্য যিনি অপেক্ষামান। ধ্বংস আর মৃত্যু অনিবার্য জেনেও যিনি অগ্রপথিক। বিদ্রোহী কবির সেই 'শির দেগা তবু নাহি দেগা আমামা' গুণের অধিকারী মর্দে মু'মিনঃ মুজাহিদ। অন্যতম বীর সেনাপতি বীরবর মূসা।

তিনি কিছুতেই আত্মসমর্পণের কথা ভাবতে পারেন না। তাই আবেগপূর্ণ কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সভাসদদের সম্বোধন করে বলেন- " যে সমস্ত বিশ্ব বিশ্রুত মহাপুরুষেরা স্পেন জয় করেছিল, তাদের পবিত্র খুন আজও আমাদের করায়ত্ব হবেই। অশ্বারোহী আর পদাতিক উভয় শ্রেণীর যথেষ্ট সেনা আমাদের আজ্ঞাহধীন। যুদ্ধ আমাদের নিত্যকার ব্যবসা। যুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন আমাদের শরীরের সর্বত্র বিরাজমান... ।"

এমন মুহূর্তে শত্রু পক্ষের রণদামামা বাজতে লাগলো নগর তোরণের সামনে। মুসলিম শাসক আবু আব্দুল্লাহ বললেন ঃ "এখন যা দরকার আপনারা তা করুন। এ নগরীর ও জনসধারণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনাদের হাতেই সমর্পণ করলাম। আপনারাই এ নগরীর রক্ষক। ইনশাআল্লাহ আমাদের ধর্মের অবমাননা এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গের মৃত্যু, মাতৃভূমির দুঃখ-দুদর্শার আপনারা উপযুক্ত ভাবে জবাব দিবেন।" বলেই তিনি নিজ প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন।

চারিদিকে শুরু হলো অস্ত্রের ঝন-ঝন শব্দ। সামরিক আয়োজনের হট্টগোল যোদ্ধারা মেতে উঠল যুদ্ধের জন্য। স্পেনের সমস্ত অঞ্চল হাতছাড়া হলেও এই গ্রানাডা নগরী কিছুতেই খৃস্টানদের হাতে ছাড়বেননা মুসলমানরা। রাজধানী গ্রানাডায় তাঁদের একমাত্র আবাস স্থল। বেরিয়ে পড়ল যোদ্ধারা। সেনাপতি বীর মুসা অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি খণ্ডযুদ্ধ এবং নগর তোরণের রক্ষণা-বেক্ষনের ও তার সাথে আকস্মিক অভিযানের ভারও নিজের উপর তুলে নিয়ে ছুটে চললেন বীর বিক্রমে। সেনাপতি মুসা তথা মুসলমান সৈন্যদের হাবভাব দেখে খ্রীস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড স্পষ্টই বুঝলেন যে, বাহু বলে গ্রানাডা জয় করা অসম্ভব। অবাস্তব। চেষ্টা করলে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। অনেক কাঠ খড়ি পুড়িয়ে স্পেনের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করেছি। এই গ্রানাডা অবশ্যই দখল করতে হবে, নইলে কোন মুল্যই নেই স্পেনের। কেননা এই নগরী, রাজধানী। এই গ্রানাডা জয় করতে না পারলে সমস্ত আয়োজন পন্ড। এই নগরীতেই রয়েছে আল হামরা। দেশের সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং, যে করেই

হোক, গ্রানাডা দখল করতেই হবে। তাই, শক্তির সাহায্যে নয়, কৌশলে মতলব হাসিলই শ্রেয়।

বিচক্ষণ রাজা ফার্ডিন্যান্ড আদেশ জারি করলেনঃ গ্রানাডার পাশে একটি স্থায়ী ছোট নগরী নির্মাণ করার জন্য ; যাতে মুসলমানরা বুঝুক, যতদিন না তারা আত্মসমর্পণ করবে, ততদিন এই অবরোধ বহাল থাকবে। কিছু দিনের মধ্যে নগর নির্মিত হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা বাধলো যে, নগরীর নাম কি হবে? অবশেষে, সর্বসম্মতিক্রমে এই নতুন নগরীর নাম রাখা হলো Santafe (সান্টা ফে) বা পবিত্র ধর্মের নগরী।

বিভিন্ন দেশ থেকে সওদাগরেরা আসতে লাগলো বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রীর বহর নিয়ে। বিচিত্র পণ্য-সম্ভার পূর্ণ অসংখ্য বিপণী শোভা পেতে লাগলো সর্বত্র। যে শোভায় মুখরিত ছিল গ্রানাডা। সেই দৃশ্যে অবগাহন করছে আজ Santa Fe আর অদুরে হতভাগ্য গ্রানাডা অর্গলাবদ্ধ। পরিত্যক্ত। সমস্ত নগর তোরণ তালাবদ্ধ। গ্রানাডা যেন একটি সম্পূর্ণ জেলহাজত।

দীর্ঘ দিন চলল গ্রানাডা অবরোধ। সবার মনে নৈরাশ্য। চারিদিকে হাহাকার। খাদ্য সম্ভার শেষ। এমন কী সৈন্যদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অশ্বগুলোকে হত্যা করতে হচ্ছে। অপর কোন দেশের সাথে নেই কোন আদান-প্রদান। সর্বদিক বন্ধ। সাত হাজার ঘোড়ার মধ্যে মাত্র তিন'শ আছে। দুইলক্ষ বাসিন্দার মুখে শুধু আহারের জন্য করুণ ক্রন্দন। বিলাপ ধ্বনি। গ্রানাডায় এখন দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি। রসদ সামগ্রীর রাস্তা চারিদিকে বন্ধ। একদা পার্শ্ববর্তী দেশ আল মুজারিজের একটি দল কিছু সাহায্য নিয়ে আসছিল। কিন্তু খ্রীস্টান যোদ্ধা মারকুইস অবকেডিজ তার বাহিনী নিয়ে ছুটে এসে এসব লুট করে নিয়ে গেল মুসলমানদের সামনেই।

আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করাও গ্রানাডাবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। অবরোধের কষ্ট তাঁরা আর সহ্য করতে পারছে না। ওদিকে খ্রীস্টান শত্রুপক্ষ তাদের অবরোধ জারি রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মুসলমানদের সামনে এখন দু'টো পথ। মৃত্যু অথবা শত্রুপক্ষের কিনট আত্মসমর্পণ। বেশ কিছু দুর্বল ঈমানের যোদ্ধা খ্রীস্টান বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। মনোবল হারিয়ে ফেলেছে অনেকে, খণ্ড যুদ্ধে তারিকসহ বেশ কিছু স্বনামধন্য যোদ্ধাও মারা গেছেন।

শেষ সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণা সভা ডাকা হলো। মুসলিম সম্রাট আবু আব্দুল্লাহ বিভ্রান্ত। ম্লান মুখে চুপটি মেরে বসে আছেন তিনি। ক্ষীণ আশাও নেই মনে। অবশেষে, দুর্বল রাজা আবু আব্দুল্লাহ খ্রীস্টান বাহিনীর তথা রাজ দম্পতির কাছে আত্মসমর্পণ করাই সমীচীন বলে স্থির করলেন। সর্বজনমান্য আবুল কাসেমকে

খ্রীস্টান শিবিরে (Santafe- তে) প্রেরণ করা হলো, সমর্পণের শর্তাদি স্থির করার জন্য।

বীরবাহু মুসা দেখলেন সকলেই আত্মসমর্পণের পক্ষে। তিনি আর নিশ্চুপ নির্বাক থাকতে পারলেন না। ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে তিনি উপস্থিত সভাসদদের সম্বোধন করে বললেনঃ যে বিপদ এবং লাঞ্ছনা আমি দিবাচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তার তুলনায় মৃত্যু অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমাদের চোখের সামনেই এই প্রিয় নগরী। লুণ্ঠিত-লাঞ্ছিত হবে; মসজিদ, এবাদতগাহ প্রভৃতি নিগৃহীত অপমানিত হবে; আমাদের গৃহ-সংসার ধ্বংশ বিধ্বস্ত হবে; স্ত্রী-কন্যারা উৎপীড়িতা-ধর্ষিতা হবে। নিষ্ঠুর অত্যাচার, হৃদয়হীন অসহিষ্ণুতা, চাবুক এবং শৃংখল; অন্ধকার কারাগৃহ; মৃত্যুর অগ্নিকুণ্ড; ফাঁসির কাষ্ঠ এ সবই আমাদের সহ্য করতে হবে। অন্ততঃ হতভাগ্য কাপুরুষেরা এসব দেখবে এখন যারা সম্মানজনক মৃত্যুকে বরণে কুণ্ঠিত। নিজের বিষয়ে আমি বলতে পারি-ইনশাআল্লাহ আমার চোখ দিয়ে এসব কখনও অবলোকন করবো না।'

কথাগুলো শেষ করেই অকুতোভয় বীরবাহু মুসা সভাস্থল ত্যাগ করলেন। ঘরে ফিরে অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত করলেন নিজেকে। আরোহন করলেন প্রিয় অশ্বে। তারপর! তারপর এলভিরা নামক নগর-তোরণ অতিক্রম করে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চললেন।

সন্ধ্যার গোধুলি। ১০/১২ জন খ্রীস্টান অশ্বারোহী সৈন্য ভেগা নদীর তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। হঠাৎ তারা আপাদমস্তক বর্মে আচ্ছাদিত এক মুসলিম অশ্বারোহীকে তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখতে পেল; বর্শা তাঁর শত্রুকে আক্রমণের জন্য উদ্যত। তেজস্বী অশ্ব তার ন্যায়ই বর্মে ঢাকা।

কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই একজন খ্রীস্টান সওয়ারকে বর্শাফলকে বিদ্ধ করে ভূমিতলে নিক্ষেপ করলেন। তারপর অবশিষ্ট খ্রীস্টান সৈন্যদের সাথে লড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় অর্ধেক সৈন্য অজ্ঞাত সৈনিকের আঘাতে মারা গেল। অবশেষে অজ্ঞাত সৈনিকও চরমভাবে আহত হয়ে ছিটকে পড়লেন মাটিতে। সমস্ত খ্রীস্টান যোদ্ধা অজ্ঞাত নামা মুসলিম সৈন্যের সাহস এবং বীরত্ব দেখে বিস্মিত; হতবাক। মুসলিম যোদ্ধা হাঁটুর উপর ভর করে তীক্ষ্ণধার ছোরা নিয়েই লড়ছেন। শত্রু নিপাতের জন্য যেন তিনি বদ্ধপরিকর। এক সময় যখন তিনি বুঝলেন যুদ্ধ করা আর সম্ভবপর নয়, তখন শত্রু যাতে তাঁকে বন্দি করতে না পারে, সে জন্য শরীরের সকল শক্তিকে সংযত করে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন

নদীগর্ভে। ভারিবর্ম নিয়ে তিনি বেশি দূর সাঁতরে যেতে পারলেন না। নদীতেই হলো তার সলিল সমাধি।

ঐতিহাসিকগণ বলেন; এই মুসলিম যোদ্ধা ছিল বীর মুজাহিদ মুসা। খ্রীস্টানদের সাথে যে সমস্ত মুসলিম যোদ্ধা যোগ দিয়েছিল, তারা মুসার ঘোড়াকে দেখে সনাক্ত করেছিল যে সেই অজ্ঞাত মুসলিম যোদ্ধাই বীরবাহু 'মুসা'।

১৪৯১-এর ২৫শে নভেম্বর গ্রানাডার আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। তার সাথে অবসান হলো সুদীর্ঘ আটশ বছরের স্পেনের মুসলিম শাসনের।

সেদিনের স্পেনের মুসলমানরা বিলাসী জীবন এবং কোরান-সুন্নাহর পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই কারবালার পর মুসলিম ইতিহাসের সবচে বড় শোকবহ ঘটনা, স্পেনের মুসলিম শাসনের অবসান হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় এর চাইতে বৃহত্তর ট্রাজেডি আর কী থাকতে পারে?

কিন্তু, আমরা মুসলমান আজ আল্লাহ-রসূল (সাঃ)-এর আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে পাশ্চাত্য তথা খ্রীস্টানদের অনুসরণ-অনুকরণ করাকেই শ্রেয় মনে করি। কী আশ্চর্য! যারা আমাদের জাতশত্রু। যারা কখনোই মুসলমানদের মঙ্গল চায় না। যারা সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিম নিধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; যারা সুযোগ পেলেই কাল বিলম্ব না করে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে; ছোবল মারে! আমরা আজ তাদেরই অনুসারী।

কিন্তু আর নয়। এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না। চলতে পারে না। ওমর, আলী, ওলীদ, তারিক, মুসার অনুসরণ করে আল কোরান এবং হাদীসের সুন্নাহর রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জাগ্রত হয়ে দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার এখনই সময়।

বীর মুজাহিদ নূরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী

খৃস্ট জগত কোন দিনও যে নামটি ভুলতে পারবে না

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী রেখে গিয়েছিলেন চারপুত্র। এদের মধ্যে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পিতার মতই ইতিহাস ভাস্বর হয়ে আছেন নূরুদ্দীন মাহমুদ। তার জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা সাইফুদ্দীন মাহমুদ গাজী ছিলেন মসুলের শাসনকর্তা। আর নূরুদ্দীন মাহমুদের হাতে ছিল আলেপ্পোর শাসনকর্তৃত্ব। সেইসূত্রে তাঁরও উপাধি ছিল আলেপ্পোর আতাবেক। অপর দু'পুত্র ছিলেন কুতুবুদ্দীন মওদুদ এবং নুসরাত উদ্দিন আমীর মীরান।

বর্বর খৃস্টান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছিল নূরুদ্দীন মাহমুদের ওপর। আর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন গৌরবময় কৃতিত্ব এবং যোগ্যতার সঙ্গে। তিনি ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন এবং খৃস্টানদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন প্রায় সকল হারানো ভূখণ্ড।

এ মহাবীরের পুরো নাম ছির নূরুদ্দীন আবুল কাসিম মাহমুদ বিন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী। তাঁর জন্ম হয়েছিল ৫১১ হিজরীর শাওয়াল মাসে। জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন পিতার শিবিরে। কালাত জাবির অবরোধকালে তাঁর পিতা ইমাদুদ্দীন জঙ্গি নিহত হন গুপ্তঘাতকের হাতে। ৫ রবিউল আওয়াল, ৫৪১ হিঃ ১৪ সেপ্টেম্বর ১১৪৬ খৃষ্টাব্দ। সে সময় পিতার সঙ্গে সে অপরোধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি।

জঙ্গীর অকস্মাৎ তিরোধাম মুসলিমজাহানের জন্য ছিল অশনি সংকেত আর ইসলামের শত্রুদের জন্য ছিল আক্রমণের সবুজ সংকেত। জঙ্গির আকস্মিক মৃত্যু ইসলামের শত্রুদের নিকট ছিল সুসংবাদ। ইসলামের শত্রুরা জানত যে কোন মুসলিম রাজা-বাদশার মৃত্য হলে তাঁর রাজ্য বা সাম্রাজ্য নিয়ে জ্ঞাতিবিরোধ দেখা যায়। জঙ্গির পুত্রদের মধ্যেও তাই ঘটল। শত্রুরা এই সুযোগটাই গ্রহণ করলো।

এন্টিওকের খৃস্টান শাসনকর্তা রেমন্ড হামলা করলেন আলোপ্পোর প্রাচীর পর্যন্ত। দ্বিতীয় জোসেরিন পরিকল্পনা করলেন এডেসা পুনর্দখলের। তাঁর প্রেরিত লোকেরা যোগাযোগ স্থাপন করল এডেসার অধিবাসীদের সঙ্গে। এডেসা ছিল খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের শক্ত ঘাঁটি। জাসেলিন তখন অবস্থান করছিলেন জেলবাসির

নামক স্থানে। জঙ্গি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এডেসা শহরটি দখল করেছিলেন। জঙ্গির মৃত্যু সংবাদ পেয়েই জোসেলিন অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযেগ করে তাদের আশ্বাস পেয়েছিলেন জোসেলিন শহরটি আক্রমণ করলে তারা সহযোগিতা করবে। কাজেই শহরটি দখল করতে জোসেলিনের বেগ পেতে হয়নি। বিশ্বাসঘাতক খৃস্টানরা মুসিলম অধিবাসী এবং সৈন্যদের হত্যা করল। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ নূরুদ্দীন ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন শহরটির ওপর। পরাজিত হলো খৃস্টানরা। জোসেলিন পালিয়ে গেল প্রাণ নিয়ে। বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুসলমানদের হত্যার ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিলেন নূরুদ্দীন। জোসেলিনের সৈন্যদের এবং যারা জোসেলিনকে সাহায্য করেছিল শহরের এই বিশ্বাস ঘাতক খৃস্টানদের নিক্ষেপ করলেন তরবারির মুখে। খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগসাজশকারী আর্মেনিয়ানদের বহিষ্কার করলেন শহর থেকে। শুধু কয়েকজন অধিবাসীকে রেখে গেলেন শহরে।

মুসলমানদের হাতে এডেসার এই দ্বিতীয়বার পতনের ফলে ইউরোপে সৃষ্টি হলো প্রবল উত্তেজনা। কেয়ার ভাউক্সের সাধু বানার্ড ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন করে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানালেন। ১১৪৭ খৃস্টাব্দে জার্মান সম্রাট তৃতীয় কর্নার্ড, ফ্রান্সের সম্রাট সপ্তম লই খৃস্টানদের গৌরব উদ্ধারের জন্য এই ধর্ম যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সমসাময়িক ইতিহাসে দেখা যায় সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের খৃস্টানদের সাহায্য করার জন্য তারা তাদের সম্মিলিত পতাকার নীচে জড়ো করেছিলেন ৯ লাখ লোক। সপ্তম লুই এর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন তার স্ত্রী ইলিসর। (পরবর্তীকালে তিনি ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরিকে বিয়ে করেন)। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেক মহিলা যোগ দিয়েছিল এই দুর্ভাগ্যজনক অভিযানে। জার্মানদের মধ্যে ছিল বর্শা এবং বর্মসজ্জিত অশ্বারোহী একটি বড় নারী বাহিনী। এদিক দিয়ে ফরাসীরাও পিছিয়ে ছিল না। ফরাসী স্ত্রীলোকেরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে যোগ দিল। নারী-পুরুষের মিশ্রিত বাহিনী মুসমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। খৃস্টান-নারী-পুরুষের এই মেলামেশার অনিবার্য ফল যা হবার তাই হলো। এই ধর্মযোদ্ধাদের মধ্যে দেখা দিল গুরুতর অধর্ম, নৈতিক অধঃপতন ও ব্যভিচার। এই দুই খৃস্টান সেনাবাহিনীর ভাগ্যে যা ঘটল ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে আছে। সিরিয়া অভিমুখে অভিযাত্রায় উভয় সম্রাটের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় শোচনীয়ভাবে। লাউভিসিয়ার সন্নিকটে নির্মূল হয়ে যায় কর্নার্ডের সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশ আর সমুদ উপকূল দিয়ে অগ্রসরমান লুই এর সেনাদল

ক্যাডমাসের (বর্তমানে সেলজুকদের দ্বারা পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হয়। এন্টিওক শহরটি রানী ইলিনরের চাচার দখলে ছিল। লুই যখন এন্টিওক শহরে পৌঁছলেন তখন দেখা গেল তার সেনাদলের তিন-চতুর্থাংশই ধ্বংশ হয়ে গেছে। পাপাচারে পূর্ণ এই শহরে তখন অবস্থান করছিলেন অনেক রূপসী এবং অভিজাত মহিলা। তাদের মধ্যে তুলোর কাউন্টেস, ব্লইসের ফাউন্টেস, ফ্লান্ডার্সের সিবিলি, রাউসির ফাউন্টেস মরিলি, বউলিয়নের ডাচেস। তাদের মধ্যে সেরা ছিলেন ইলিনর। এন্টিওকে ক্রোশের যোদ্ধারা অবাধ লাম্পট্যে এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণতার গা ভাসিয়ে দিল এবং রেমন্ডের উসবগুলো রাত্রিকালে পূর্ণ হয়ে উঠল মাতালের হৈ চৈ পূর্ণ প্রচণ্ড তাণ্ডবে এবং রানী ইলিনরের খোলামেলা লজ্জাকর আচরণ অবাক করে দিল সকলকে। এন্টিওকে যথেষ্ট ভোগ-বিলাসের পর খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের সম্মিলিত বাহিনী এগিয়ে গেল দামেশকের দিকে। কয়েক মাস তারা অবরোধ করে রাখল শহরটিকে। শহরটি মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন সাইফুদ্দীন গাজী এবং নূরুদ্দীন মাহমুদ। তখন আক্রমণকারীরা অবরোধ তুলে নিয়ে দ্রুত হটে গেল প্যালেস্টাইনের দিকে। ধর্মযুদ্ধের ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কর্নার্ড এবং লুই যাত্রা করলেন ইউরোপ শেষ হলো দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ।

এবার নূরুদ্দীন ফ্রাঙ্কদের দমন করতে উদ্যোগী হলেন। ফ্রাঙ্করা ছিল জার্মান বংশোদ্ভূত খৃস্টান। তিনি সিরিয়া সীমান্তে ফ্রাঙ্কদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গগুলোর অন্যতম আল-আরেমিয়া দখল করেন এবং কয়েক মাস পর এন্টিওকের নিকটে জগরা নামক স্থানে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। আন্নেব শহরের (প্রাচীন মেলা) নিকটে নিহত হলেন রেমন্ড। তাঁর সৈন্যরা পরাচিত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়। নিহত হলো অনেক সৈন্য। রেমন্ড বোহেমন্ড নামক এক নাবালক পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। রেমন্ডের স্ত্রী ছিলেন তার অভিভাবক। কিন্তু এই মহিলা দীর্ঘকাল বিধবা অবস্থায় থাকেননি। তিনি আবার বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় স্বামীও রেমন্ডের মত প্রায় একই ভাগ্যবরণ করেন। তিনি এক খণ্ডযুদ্ধে নূরুদ্দীনের হাতে ধরা পড়েন। এই যুদ্ধে ফ্রাঙ্করা আবার পরাজিত হয়।

৫৪৪ হিজরীতে (১১৪৯-৫০ খৃ) নূরুদ্দীন গুরুত্বপূর্ণ আফেমিয়া দুর্গটি দখল করেন। দু'বছর পরে নূরুদ্দীন পরাজিত হন দ্বিতীয় জোসেফিকের নিকট। কিন্তু শিগগিরই জোসেলিক বন্দি করে এর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। "কারান" ইবনুল আথির বলেন, "জোসেলিন ছিল ফ্রাঙ্কদের মধ্যে চরম ধর্মান্ধ নিষ্ঠুর লোকদের একজন এবং মুলমানদের প্রতি বিদ্বেষে সে সকলকে অতিক্রম করে গেয়েছিল। যখনই ফ্রাঙ্করা কোন যুদ্ধযাত্রা করত তখন তাকেই তারা

সেনাপতির দায়িত্বে বরণ করে নিত। কারণ, তারা তার সাহস, দূরদৃষ্টি, ইসলামের বিরুদ্ধে এবং এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তার অন্তরের কঠোরতাকে পছন্দ করত।

এই ভয়ঙ্কর শত্রু বন্দি হওয়ার ফলে নূরুদ্দীনের সুবিধা হয়ে গেল। তিনি শিগগিরই খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের দখলকৃত অনেক শহর এবং দুর্গ দখল করে নিলেন। দুলুক নামক জায়গায়, একটি যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এখানেও ফ্রাঙ্কদের গুরুতর বিপর্যয় ঘটল। নূরুদ্দীন দখল করে নিলেন এন্টিওক এলাকার অধিকাংশ ভূভাগ। দামেস্ক ঝিল এক স্বাধীন সুলতানের অধীন। তার বিশ্বস্ততা ছিল অনিশ্চিত। তাই নুরুদ্দীন তার পিতা ইমাদ্দুদীন জঙ্গির মতই এই এলাকার খৃস্টাব ধর্মযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়লেন। সমুদ্র উপকূলে আস্কালন দখল করতে পেরে। খৃস্টানরা সাহসী হয়ে উঠল। তারা তখন পরিকল্পনা করতে লাগল সিরিয়ার রাজধানী জয়ের। বিপদ দেখে দামেশকের অধিবাসীরা নূরুদ্দীনের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাল। নূরুদ্দীনও তৎক্ষণাৎ তাদের আবেদনে সাড়া দিলেন। দামেশকের শাসনকর্তাকে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য দিলেন এমেসা শহরে জায়গীরদারী। দামেশকের অধিবাসীরা জয়ধ্বনি করে নূরুদ্দীনকে বরণ করে দিন তাদের সুলতানরূপে।

এই রক্তপাতহীন বিজয়ের ফলে নুরুদ্দনি পেলেন বাগদাদের খলিফা প্রদত্ত উপাধি মালিক আল আদল (ন্যায়পরায়ণ রাজা)। আর তিনিও এই উপাধির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। ছয় বছর পর নূরুদ্দীন এক স্মরণীয় অভিযান প্রেরণ করেন মিসরের যা মুসলমান এবং ফ্রাঙ্ক উভয়ের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মিসরের ফাতেমীয় বংশ তখন পতনোন্মুখ। এই বংশের শেষ খলিফা আজিদ লিদিন ইল্লাহ ছিলেন অসুস্থ ব্যক্তি। তাই রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল তাঁর মন্ত্রী সাভের আসসাদীর হাতে। একটি ছোট ষড়যন্ত্রকারী দল দ্বারা তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন দামেশকে এবং নূরুদ্দীন আহমদের সাহায্য প্রার্থনায় করেন। বিনিময়ে খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মিসিরীয় ফৌজ দিয়ে তিনি নুরুদ্দীনকে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। কিছুটা দ্বিধা করে তাঁর প্রার্থনায় নূরুদ্দীন সম্মতি হলেন। আসাদুদ্দীন শিরকুহ এর অধীনে সশস্ত্র সৈন্যদের পাহারায় সাভেরকে পাঠালেন মিসরে। আসাদুদ্দীন শিরকুহ ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত ধর্মযোদ্ধা বীর সালাউদ্দীনের চাচা। কিন্তু সাভের ছিলেন বিশ্বাসঘাতক। তাঁর ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার পরেই তিনি হাত মিলাল ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে এবং মিসর ত্যাগের নির্দেশ দেন শিরকুহকে। শিরকুহ তার ক্ষদ্র বাহিনী নিয়ে বিলবাইস

নামক স্থানে ফ্রাঙ্ক এবং মিসরীয় বাহিনীকে প্রবল বাধা দেন কিন্তু অবশেষে সরে আসতে বাধ্য হলেন। ৫৫৯ হিজরীর রমজান মাসে (১১৬৪ খৃঃ) নূরুদ্দীন ফ্রাঙ্ক এবং গ্রীকদের সম্মিলিত বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হলেন। হারিস শহরের সন্নিকটে যে যুদ্ধ হলো তা ধর্মযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষগুলোর অন্যতম। শোচনীয় পরাজয় বরণ করল খৃস্টানরা। তাদের নায়করা এন্টিওকের যুবরাজ, ত্রিপলীর রেমন্ড, তৃতীয় জোসেলিন, গ্রীক সেনাপতি কালাসারেরডিউক বন্দি হলেন। এই বিরাট বিজয়ের ফলস্বরূপ হারিসসহ কয়েকটি শহর দখল করে নিলেন বীর মুজাহিদ নূরুদ্দীন মাহমুদ।

শিরকুহ আবার মিসরে প্রবেশ করেন ১১৬৭ খৃস্টাব্দে। তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য সাভের আবার সাহায্য চাইল ফ্রাঙ্কদের। তখন এ্যামরি ছিলেন জেরুজালেমের সিংহাসনে। তিনি আশা করেছিলেন এই সুযোগে মিসর জয় করে নিবেন। তাই সাভেরকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন এক সৈন্যদল। বাবেইন নামক স্থানে ফ্রাঙ্ক এবং মিসরীয় সম্মিলিত বাহিনী শিরকুহ-এর নিকট চরমভাবে পরাজিত হলো। এটা ছিল এক চমকপ্রদ সামরিক বিজয়। এই বিজয় ছিল এক উচ্চমানের সামরিক নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আথির বলেন, "মাত্র এক হাজার মিসরীয় সম্মিলিত বাহিনী বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়ে অসাধারণ ঘটনা ইতিহাসে আর কখনও লিপিবদ্ধ হয়নি।"

এই বিরাট সাফল্যের পর শিরকুহ দখল করেন আলেকজান্দ্রিয়া এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন নিজেকে। পরবর্তীতে এক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্ত ছিল যে এ্যমরি তাঁর সেনাবাহিনী মিসর থেকে সরিয়ে নিবেন এবং মিসরের ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করবেন না এবং পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শিরকুহ আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ফিরে যাবেন সিরিয়ায়। কিন্তু ফ্রাঙ্করা সাভেরের সঙ্গে এক গোপন চুক্তির বফে কায়রোতে তাদের একজন প্রতিনিধি রাখা, তাদের সৈন্যদের দ্বারা কতগুলো শহর অধিকারে রাখা এবং বার্ষিক এক লাখ স্বর্ণমুদ্রা সরকারী সাহায্য পাওয়ার অধিকার আদায় করে নিল। এটা ছিল শিরকুহের সঙ্গে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির গুরুতর লংঘন। অবশেষে খৃস্টান ধর্মযুদ্ধাদের ব্যবহার এমন উদ্ধত হয়ে উঠল এবং তাদের অত্যাচার এমন চরমে পৌছল যে অসুস্থ সুলতান আল আজিজ নিজেই নূরুদ্দীনের নিকট সাহায্য চাইলেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ফ্রাঙ্কদের মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট সৈন্যসহ পুনরায় শিরকুহকে পাঠালেন মিসরে। শিরকুহের আগমনে খৃস্টান ধর্মযুদ্ধারা তাড়াহুড়া করে তাদের লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে চলে গেল দেশ ছেড়ে। ১১৬৯ খৃস্টাব্দের ৮ জানুয়ারী

শিরকুহ্ আবার প্রবেশ করলেন কায়রো শহরে। জনসাধারণ এবং ফাতেমীয় খলিফা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, মিসরের ত্রাণকর্তারূপে। ক্রুদ্ধ খলিফা সাভেরকে প্রাণদণ্ড দিলেন। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করলেন শিরকুহকে। এই দু'মাস পরে শিরকুহর মৃত্যু হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহান সালাহউদ্দীন ইউসুফ। তাঁর উপাধি হয় মালিকউন নাসির। যদিও বাইরে প্রকাশ ছিল তিনি মিসরের ফাতেমীয় খলিফার মন্ত্রী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সালাউদ্দীন নিজেকে মনে করতেন নূরুদ্দীন মাহমুদের সহকারী।

সালাউদ্দীন তাঁর ঔদার্য এবং ন্যায়পরায়ণতায় সকলের মন জয় করছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হানাফী। চিরগুগণ্ শেষ ফাতেমীর খলিফা আল আজিদের মৃত্যু হলে তিনি ধীরে ধীরে মিসরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন হানাফী খলিফাদের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব।

১১৭৩ খৃস্টাব্দে নূরুদ্দীন আক্রমণ করেন এশিয়ার মাইনর। কয়েকটি শহরও দখল করেন। যখন তিনি এই অভিযানে ব্যস্ত, তখন এলেন বাগদাদের খলিফার দূত সনদ নিয়ে। এই সনদে খলিফা তাকে স্বীকৃতি দিলেন, আল মাওয়াসিল, আলজাজিরা, ইরফিল, খিলাত, সিরিয়া, মিসর এবং কার্নিয়ার অধিপতিরূপে।

১১৭৪ খৃস্টাব্দে দামেশকে মৃত্যু হয় তাঁর। ঝড়ে পড়ে ইসলামের আকাশ থেকে আর একটি উজ্জ্বল তারকা। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই মহান সৈনিকের নাম ইতিহাসে থাকবে চিরভাস্কর হয়ে।

তাঁকে প্রথম দুর্গে কবর দেয়া হয়। পরবর্তীকালে তাঁর নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়।

নূরুদ্দীন সম্বন্ধে ইবনুল আথির বলেন, "আমি অনেক শাসনকর্তার জীবনী অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু আইনসম্মত খলিফাগণ এবং ওমর বিন আব্দুল আজিজের সময়ের পর থেকে এমন কাউকে পাইনি যাঁর জীবন ছিল নূরুদ্দীনের চেয়ে পবিত্রতর এবং যাঁর ছিল ন্যায়পরায়ণতার জন্য অধিকতর উৎসাহ।" রাসূলুল্লাহর (সা.) শিক্ষার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন তিনি। একজন ঈমানদার হিসেবে কোরআন ও সুন্নাহর নীতিমালা কঠোরভাবে জীবনের সকল স্তরে মেনে চলায় ছিল তাঁর আগ্রহ।

ন্যায়বিচারের জন্য তাঁর ছিল বিশেষ সুখ্যাতি। তিনি শুধু সন্দেহের বশে কাউকে শাস্তি দিতেন না। তিনি নিম্নস্তরের আদালতগুলোতে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বার্থপরতা এবং লোভ তাঁর চরিত্রে ছিল অনুপস্থিত। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত মালামাল ও অর্থ জনসাধারণের কাজে, ধর্মীয় কাজে এবং ইসলামের জন্য ব্যয় করতেন। সিরিয়ার অনেকগুলো শহর সুরক্ষিত করেছিলেন।

তিনি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার শিবিরে। তাঁর ব্যক্তিগত সাহসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভা। এই জন্য তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সেনাবাহিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা।

তিনি শুধু একজন সৈনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আইনজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। এমনকি শত্রুরাও তাঁর ন্যায়বোধ, তাঁর বদান্যতা এবং তাঁর ধার্মিকতার প্রশংসা করত। লোক চরিত্র সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। তাঁর মন্ত্রীরা এবং সেনাপতিরা ছিলেন উপযুক্ত কর্মদক্ষ এবং তাঁর প্রতি অনুগত। শিল্পকলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের তিনি ছিলেন উদার পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজ্যের বিভিন্নাংশে তিনি স্থাপন করেছিলেন কলেজ এবং হাসপাতাল। তাঁর দরবারে ভিড় করতেন পণ্ডিত এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ। তিনি তাঁদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন উচ্চতর বিচারালয়, যাকে বলা হত দারুল আদল।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন তার স্বভাবসিদ্ধ বিশ্লেষণে বলেন, "রাজা-বাদশাহদের সত্যিকারের প্রশংসা হয় তাঁর মৃত্যুর পর এবং তা আসে তাঁদের শত্রুদের মুখ থেকে। টায়ারের বিশপ ইউলিয়াম বিন নূরুদ্দীনকে খৃস্টানদের নিপীড়নকারী বলে মনে করতেন। তিনিও স্বীকার করেছেন নূরুদ্দীন ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ, উদ্যমশীল,পরিণামদর্শী, ধার্মিক। জনসাধারণের সমৃদ্ধিই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। জনসাধারণও তাঁকে তাঁর ন্যায়বিচার, দয়া এবং মিতাচারের জন্য শ্রদ্ধা করত।

বীর মুজাহিদ সুলতান গাজী সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী

পাশ্চাত্যের মায়েরা যার নাম নিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়াতো

ইতিহাসের পাতা বাড়তে থাকে। ইসলামের চার খলীফা গেলেন। উমাইয়া খলীফাদের রাজত্ব শেষ হলো। আব্বাসী খলীফাদের গৌরব শেষ হয়ে গেল। কত খলীফা গেলেন। তবু ইসলামের গৌরব থাকলো। শিক্ষা-দীক্ষায়, সভ্যতায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যে তখনও আরবরা দুনিয়ার সেরা। আর মুসলিমজাহান তখনও তিন মহাদেশে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে ধীরে ধীরে মুসলিমজাহানের নেতৃত্ব চলে আসছিল আরবদের হাত থেকে অনারব মুসলিমদের হাতে। খলীফার রাজ্যের উত্তর-পূর্বে বাস করত তুর্কী উপজাতীয় লোকেরা। এই তুর্কী মুসলমানরা ছিল যেমন কর্মঠ করিৎকর্মা তেমনই ভাল সেনার জাত। আরবের মুসলমানরা যখন নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদে কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মগ্ন, তখন এই তুর্কী মুসলমানরা ধীরে ধীরে খলীফার রাজত্বের বড় বড় পদ দখল করতে লাগলো। শেষে এমনি দাঁড়াল যে, একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কীরা মেসোপটেমিয়ায় এসে খলীফাকে বলতে গেলে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল। খলীফা শুধু নামেমাত্র খলীফা ছিলেন। আসলে এই সেলজুক তুর্কীরাই সব শাসনকাজ চালাতো। সেলজুক তুর্কীরাই আর্মেনিয়া জয় করে। এশিয়া মাইনরে ইউরোপের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের যা-ও কিছু এ যাবৎ অবশিষ্ট ছিল মুসলিমদের অভিযান থেকে, সেখানেও তারা আঘাত হানলো। মেলাজগার্ডের যুদ্ধে ১০৭১ সালে বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনী মুসলিমদের হাতে চরম পরাজয় বরণ করে। এশিয়ায় খৃষ্টান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের লেশ আর রইলো না। শেষ অবধি তারা বাইজেন্টাইনের রাজধানী কনস্টানটিনোপল পর্যন্ত ধাওয়া করলো।

বাইজেন্টাইন সম্রাট মাইকেল মুসলিমদের আক্রমণের কথা শুনে ভয়ে কাঁপা শুরু করলেন। ভয়ে দিশা না পেয়ে তিনি তখন খৃষ্টানদের ধর্মরাজ্যের প্রধান রোমের পোপের কাছে সাহায্য চাইলেন। এর মধ্যে খৃষ্টানরা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পোপ নিজের অধীনে সমস্ত খৃষ্টানকে এক করার এই বিরাট সুযোগ ছাড়লেন না। এতদিন খৃষ্টানরা ইউরোপে নিজেরা নিজেরা লড়াই করছিল। পোপ

তাদের বোঝালেন, মুসলিমরা ইউরোপে এগিয়ে আসছে। তারা জয়লাভ করলে খৃস্টধর্মের সর্বনাশ হবে। আর তাছাড়া খৃস্টানদের পবিত্র স্থান জেরুজালেম এখনও বিধর্মী মুসলমানদের হাতে। আর তাছাড়া খৃস্টানদের পবিত্র কাজ হলো, মুসলমানদের ইউরোপ থেকে হটিয়ে শেষতক জেরুজালেম উদ্ধার করা। তাই পবিত্র স্থান জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য সমস্ত ইউরোপের খৃস্টানরা এক হতে লাগলো। ধর্মের জন্য জান দিয়ে, বিধর্মী মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করে বেহেশতে যাবার এ সুযোগ কোন খৃস্টানই ছাড়তে চাইলো না। সমস্ত ইউরোপে তাই মহাজাগরণ পড়ে গেল। সাজ সাজ রব উঠলো ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের জন্য।

কয়েকবার ব্যর্থতার পর শেষ পর্যন্ত ১০৯৭ সালে খৃস্টান ক্রুসেড বাহিনী বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করে সত্যসত্যই এশিয়ার মাটিতে পা দিল। নিকেয়া দখল করে তারা এগুতে লাগল এনটিওকের পথে। এক বছর খৃস্টান বাহিনী এন্‌টিওক অবরোধ করে রইলো। শেষ পর্যন্ত ১০৯৯ সালে খৃস্টান বাহিনী মুসলিম, ইহুদী এবং খৃস্টান এই তিন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান জেরুজালেম আক্রমণ করলো। খৃস্টান ও মুসলমানের রক্তে লাল হয়ে গেল পবিত্র ভূমি জেরুজালেম। শেষ পর্যন্ত খৃস্টান বাহিনী জেরুজালেম দখল করলো। মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়ে এশিয়া-মাইনরের অধিকাংশই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু ১১৪৪ সালে পুনরায় মুসলমানরা খৃস্টানদের হাত থেকে ইডেসা জয় করলো। খৃস্টানরা আবার দ্বিতীয় ক্রুসেড ঘোষণা করলো। তবে এবার তারা ইডেসা জয় করতে পারলো না। তেমনি মুসলিম বাহিনীও চেষ্টা করেও এনটিকে পুনরুদ্ধার করতে পারলো না।

নিজেদের কলহ-বিবাদ আর দুর্বলতার মাশুল তাই মুসলমানদের বড় কঠিনভাবেই দিতে হলো। পবিত্র জেরুজালেমকে তাদের খৃস্টানদের হাতে শুধু তুলেই দিতে হয়নি, খৃস্টানদের হাতে পরাজিত হয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসও কমে আসতে শুরু করলো...

প্রায় পাঁচশ বছর জেরুজালেম মুসলমানদের দখলে থাকার পর এমনিভাবে আবার খৃস্টানদের হাতে চলে গেল।

১১৩২ সালের একটি বিকেল বেলা। তাইগ্রিস নদীর তীরে ক'জন অশ্বারোহী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল। পেছনে তাদের শত্রু। তারা সংখ্যায় মাত্র গুটিতিনেক। শত্রুদের হাতে পড়লে তাদের বাঁচবার আর কোন উপায়ই থাকবে না। অথচ সামনে নদী, পার হবার সহজ উপায় নেই। অথচ নদীর ওপারেই

তেকরিতের অভেদ্য দুর্গ। সেখানে গিয়ে উঠতে পারলে আর কোন ভয় থাকবে না। দলপতি হতাশ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায়। ওদিকে পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসছিল।

এমন সময় আল্লাহ বুঝি তাদের সহায় হলেন। একজন সেনা একটি নৌকা দেখতে পেল। মাত্র একজন মাঝি আছে। তাকে ইশারায় ডাকা হলো।

মাঝি নৌকা নিয়ে তীরে এল। দলপতি দেখলেন শক্ত-সুঠাম এক তরুণকে। চোখেমুখে নির্ভীকতা। দলপতি তাকে বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা। তরুণটি রাজি হলো সৈন্য কয়জনকে নদীর অপর পারে নিরাপদে পৌঁছে দিতে।

তিকরিতের অভেদ্য দুর্গে আশ্রয় পেয়ে পলাতক দলপতি দেখলেন তরুণটিই তাঁর আশ্রয়দাতা। তখন তিনি তরুণটির কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। পলাতক দলপতি আর কেউ নন। তখনকার দিনের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা জংগী। জংগী তার সৌভাগ্যের দিনে তরুণ আশ্রয়দাতাকে ভুলেননি। তার কৃতজ্ঞতার দানেই সেই তরুণ আইয়ুবের ভাগ্যে খ্যাতি এলো।

তবে সে খ্যাতি এলো অনেক পরে। প্রথমে জংগীকে সহায়তা করার ফলে এল দুর্ভাগ্য। আইয়ুবের আব্বা শাধি ছিলেন তখনকার দিনের উত্তর আর্মেনিয়ার রাজধানী হর ডাওয়িনের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। শাধির অনেক ছেলে ছিল। তাই তিনি ঠিক করলেন খলীফার রাজধানী বাগদাদে গিয়ে ছেলেদের জন্য ভাল চাকরির চেষ্টা করবেন। শাধির এক গ্রীক দোস্ত ছিল। নাম তার বিহরুয। বেহরুয সেলজুক রাজকুমারদের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও খলীফার দরবারে তাঁর বেশ প্রভাব ছিল। বেহরুযের চেষ্টায় শাধির ছেলে আইয়ুব তিকরিতের দুর্গের সেনাপতির চাকরি পান। শাধি তার অন্য ছেলে শিরকুহকে (অর্থঃ পার্বত্য সিংহ) নিয়ে ছেলে আইয়ুবের দুর্গে বাস করতে থাকেন। শিরকুহ ছিলেন অত্যন্ত দুর্দম প্রকৃতির। ফলে বেহরুয তার ওপরে খুব রেগে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে শক্তিশালী দলপতি জংগীর সাথেও বেহরুযের সদভাব ছিল না। তাই জংগীকে আশ্রয় দেবার দরুন বেহরুয আইয়ুবের চাকরি নিয়ে নিলেন এবং দুইভাইকে তিকরিত ত্যাগ করার আদেশ দিলেন।

আইয়ুব এবং শিরকুহ খুব ভার মনে দুর্গ ছেড়ে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। কিন্তু তাদের যাত্রা করার প্রথম পদক্ষেপই ব্যাহত হলো এক সদ্যজাত শিশুর কান্নায়। আইয়ুবের কপাল কুঁচকে এল বিরক্তিতে। কারণ এ শিশু তাঁরই। কিন্তু খুশি হবার বদলে ছেলে জন্মটা তাঁর কাছে সে অবস্থায় আপদ বলে মনে হলো।

১১৩৮ সালের সেই রাত যে রাতে আইয়ুব আশ্রয় ছেড়ে যাবার বেদনায় মুষড়ে আছেন, নতুন ছেলের জন্ম যাঁর কাছে অমংগল বলে মনে হয়েছিল সেই শিশুই কিন্তু মুসলিম ইতিহাসে আর দেশ-বিদেশের গল্প গাঁথায় অমর হয়ে আছেন মহাগাজী সালাহ্ উদ্দীন বলে।

বিপদের দিনে আইয়ুব এবং শিরকুহ ঠিক করলেন তাঁরা আতাবেগ জংগীর কাছেই আশ্রয় চাইবেন। একদিন আইয়ুব তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিলেন, আজকে সহায়হীন হয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলে তিনি নিশ্চয় আইয়ুবকে বিমুখ করবেন না। তাই তিকরিত ত্যাগ করে মোসলের দিকেই চলতে লাগলেন।

জংগী ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। আইয়ুব যখন জংগীর কাছে আশ্রয় নিতে চললেন তখন জংগীর ভাগ্য ঊর্ধ্বাকাশের দিকে চলছে। সেলজুক সুলতানদের দরবারে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা হওয়া ছাড়াও তিনি সেলজুক রাজকুমারদের শিক্ষকতা করতেন। ইদেশার যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব তাঁকে অনেক খ্যাতি এনে দিয়েছে। তেমনি খৃষ্টানদের সাথে জেরুজালেম নিয়ে লড়াইয়েও তাঁর বীরত্বের কথা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

জংগী মানুষ চিনতেন। তাই আইয়ুব তাঁর কাছে আশ্রয় পেলেন। জংগীর সেনাবাহিনীতে দুই ভাই যোগদান করলেন। এক বছর পরই জংগী আইয়ুবকে বালবেক বা হেলিওপোলিজের গবর্নর নিযুক্ত করলেন। বালবেক সিরিয়ার সবচেয়ে ঠাণ্ডা শহর বলে পরিচিত ছিল। আইয়ুব যখন বালবেকের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন বালবেক বেশ গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। বালবেক জংগীর রাজ্যের সীমানার সর্বদক্ষিণে সবচেয়ে দরকারী ঘাঁটি ছিল। সেখান থেকে দামেশক মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। এবং তখন দামেশকের অধিপতির সাথে জংগীর সদ্ভাব ছিল না। কাজেই এরকম গুরুত্বপূর্ণ জায়গার ভার আইয়ুবকে দেবার অর্থ হলো জংগী আইয়ুবকে যথেষ্ট বিশ্বাস করতেন।

যাহোক বালবেকের শাসনকর্তা আইয়ুবের ছেলে সালাহ্ উদ্দীনের ছোটবেলা তাই বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটছিল। তখনকার দিনের মুসলিম সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের মত সবচেয়ে ভাল সুযোগই সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন পড়াশোনা করার। আব্বা আইয়ুব ছিলেন খুব পরহেজগার সূফী মানুষ। তাই সালাহ্ উদ্দীন ছোটবেলায় কুরআন পড়তে শিখলেন, আরবী ব্যাকরণ, ছন্দ, কবিতা, ধর্মশাস্ত্র এসবের পড়াশুনাও করলেন।

সাত বছর শাসনকর্তা থাকার পর মনে হলো আইয়ুবের কপালে আবার দুর্ভোগ এল। তাঁর আশ্রয়দাতা মহাবীর আতাবেগ জংগী খৃস্টানদের হাত থেকে ইদেশা জয় করার কিছুদিন পর আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। বাষট্টি বছর বয়সে বীর জংগীর মৃত্যুতে মুসলমানদের জন্য জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের কাজ আবার পিছিয়ে গেল।

বালবেক আগে ছিল দামেশকের অধিপতি। জংগীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেদের মধ্যে কলহের সুযোগ নিয়ে দামেশকের অধিপতি তাঁদের পুরনো শহর দখল করতে এগিয়ে এলেন। আইয়ুব খুব চালাক-চতুর ছিলেন। তিনি দেখলেন জেংগীর দুই ছেলেই নিজেরা ঝগড়া করছে। মোসলও বালবেক থেকে অনেক দূরে। অন্যদিকে দামেশক বালবেকের খুব কাছে। জেংগীর ছেলেদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবারও কোন আশা নেই। তাই দামেশকের সৈন্যবাহিনী বালবেকের কাছে এলে তিনি তাদের বশ্যতা স্বীকার করলেন। শুধু তাই নয়, দামেশক-অধিপতি এত খুশি হলেন যে, তিনি আইয়ুবকে শুধু প্রচুর পুরস্কার দিলেন না, দামেশকের নিকটের দশটা গ্রাম তাঁকে ছেড়ে দিলেন। এমনকি রাজধানীতে আইয়ুবের জন্য একটি বাড়িও দিলেন। চতুর আইয়ুব অল্পদিনের মধ্যেই দামেশকের দরবারে উঁচু আসন পেলেন। ক'বছর পরেই তাঁকে দেখা গেল দামেশক সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে।

এদিকে বীর আতাবেগ জংগীর ইনতিকালের পর তাঁর রাজ্য তাঁর দুই ছেলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। বড় ভাই সাইফুদ্দিন পেলেন মোসল। আর ছোট ভাই নূরুদ্দিন পেলেন সিরিয়া ও আলেপ্পো। এই ছোট নূরুদ্দিন কিন্তু ইতিহাসে নাম করেছেন। খৃস্টানদের আক্রমণে যাঁরা লড়াই করেছেন তাঁদের মধ্যে নূরুদ্দিনের স্থান খুব উঁচুতে। নূরুদ্দিন আলেপ্পোর শাসক হয়ে বসেই সেনাবাহিনী শক্তিশালী করে তুললেন।

জংগীর মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে খৃস্টানরা হঠাৎ একদিন ইদেশা পুনরায় দখল করল। কিন্তু নূরুদ্দিন খৃস্টানদের একেবারে ফুরাত নদী পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন এবং ইদেশা জয় করলেন। এর মধ্যে খৃস্টানগণ দামেশক আক্রমণ করতে গিয়েও লজ্জা পায়। আইয়ুবের বীরত্বে তাদের সেনাবাহিনী পালাতে বাধ্য হয়। ১১৪৯ সালে দ্বিতীয় ক্রুসেডের খৃস্টান সেনাবাহিনী দেশে ফিরতে থাকে।

খৃস্টানদের ঝামেলা আপাতত চুকিয়ে ফেলে নূরুদ্দিন ঘরের কাজে মন দিলেন। জংগীর আশা ছিল দামেশককে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী সিরিয়া সাম্রাজ্য গঠন। তারপর জেরুজালেমের বুক থেকে খৃস্টানদের চিরদিনের জন্য

তাড়িয়ে দিয়ে পবিত্র ভূমি মুসলমানদের হাতে আনবেন। দামেশককে এতদিন শক্তিশালী আনার জংগীকে বারবার বাধা দিয়েছেন। আনার মারা গেলে আইয়ুব দামেশকের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন।

এদিকে আইয়ুবের ছোট ভাই শিরকুহ নূরুদ্দিনের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা দেখিয়ে তিনি 'পর্বত সিংহ' উপাধি পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নূরুদ্দিনের দামেশক অভিযানের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। দুই ভাই দু'পক্ষের নায়ক সামনাসামনি যুদ্ধের জোগাড় করতে লাগলেন। কিন্তু কোন যুদ্ধই হলো না। আইয়ুব কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করলেন। তাঁর পরামর্শে দামেশক নূরুদ্দিনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করল। তখনকার মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বাদশা নূরুদ্দিন বিনা বাধায় দামেশকে প্রবেশ করলেন। আবার এক শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্মের সূচনা হলো। নূরুদ্দিন দুই ভাইকে সম্মানিত এবং পুরস্কৃত করলেন। আইয়ুব হলেন দামেশকের শাসনকর্তা বা গবর্নর।

আইয়ুব সৌভাগ্যের উঁচু শিখরে উঠলেও সালাহ্ উদ্দীন লোকচোখের আড়ালেই থেকে গেলেন। নূরুদ্দিনের প্রিয় শাসনকর্তার বড় ছেলে হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই সালাহ্ উদ্দীন যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এমন কিছু করেননি যাতে বোঝা যায় যে বড় একটা কিছু হবেন। সিরিয়ার সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা তখন পড়াশুনার সাথে সাথে যুদ্ধবিদ্যা শিখত। শিকারে যেত। সিংহের সাথে লড়াই করত। শিকারী হিসেবেও সালাহ্ উদ্দীন নাম অর্জন করেননি। সালাহ্ উদ্দীন বরং ভাল বাসতেন একা একা চুপচাপ থাকতে। আব্বার মত অল্প বয়সেই সালাহ্ উদ্দীন পরহেজগার হয়ে উঠেছিলেন। সালাহ্ উদ্দীন কবিতা ভালবাসতেন। হাদীসের বয়ান শুনতে ভালবাসতেন। বিভিন্ন আইন-কানুন নিয়ে মাথা ঘামাতেন। কুরআন শরীফের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করতে আনন্দ পেতেন। রাজ কাজের হৈচৈ তার ভাল লাগত না। চাচা শিরকুহর এসব ভাল লাগত না। তিনি সালাহ্ উদ্দীনকে একদিন ডেকে বললেন, তুই এত ঘরকুনো হচ্ছিস কেন? শুধু হাদীস-কুরআন আর কবিতা হলেই রাজ্য চলে না। যুদ্ধ, আইন-কানুন, ষড়যন্ত্র, কুটনীতি এসব শিখতে হবে। সালাহ্ উদ্দিন বিনম্র যুবক তখন। সে শুধু বলল, চাচাজান, এসব আমার ভাল লাগে না। আমাকে আমার মতই থাকতে দাও। আমি চাই না তোমাদের মত রাজা-উযির হতে।

চাচা শিরকুহ ছিলেন পুরুষ সিংহ। তিনি রেগে উঠলেন–তাহলে তুই চাস্ শাধির নাতি হয়ে, আইয়ুবের ছেলে হয়ে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হয়ে মেষের মত মরতে। নাহ্, তা হবে না। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না। আলেম হয়েছিস ভাল কথা। কিন্তু রাজ্যও চালাতে হবে।

শিরকুহ চলে গেলেন বড় ভাইয়ের কাছে। আইয়ুব চাইতেন সালাহ্ উদ্দিন বংশের নাম রক্ষা করুক। চাই কি, তাঁদের জীবনে না হলেও ঠিকমত শিক্ষা পেলে সালাহ্ উদ্দীনই তাঁদের বংশের নামে একদিন রাজা বা সুলতান হয়ে বসতে পারবে। দুই ভাই ঠিক করলেন, এখন থেকে সালাহ্ উদ্দীন শাসনকাজ পরিচালনা শিখবে ভাল করে। আর সৈন্য পরিচালনা শিখবে বীর চাচা শিরকুহর কাছে।

কিন্তু সালাহ্ উদ্দীন তখন কোথায়? আইয়ুব আর শিরকুহ লোক পাঠালেন সালাহ্ উদ্দীনকে ডেকে আনবার জন্যে। সালাহ্ উদ্দীন তখন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রাজদরবার ছেড়ে দামেশকের উমাইয়া বড় মসজিদের চত্বরে বসে মহাপণ্ডিত ইবনে আবি উমরুনের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনছেন। সব শুনে আইয়ুব আর শিরকুহ হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন।

ইতিমধ্যে শিরকুহর ক্ষমতা আর খ্যাতি দুই-ই বাড়তে লাগল। তিনি শুধু নূরুদ্দিনের সবচেয়ে বড় সহায়ই হলেন না, কোন কোন সময় তিনি নিজেই সুলতান হয়ে বসবার আশা পোষণ করতে লাগলেন। শুধু চতুর আইয়ুব তাকে বাধা দিয়ে রাখলেন। আইয়ুব জানতেন নূরুদ্দিন মারা না গেলে কিছু করা বোকামি হবে। ১১৬০ সালে শিরকুহ মহা জাঁকজমকের সাথে হজ্জযাত্রা করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে জিতে শিরকুহ বারবার নূরুদ্দিনের সম্মান বাড়াতে লাগলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শিরকুহ সালাহ্ উদ্দীনকে বাইরের জগতে আনতে পারলেন না।

শিরকুহ ভ্রাতুষ্পুত্রের এ ধরনের হাব-ভাবে খুব বিরক্ত হলেন। তাই যেবার মিসর জয়ে যাত্রা করলেন, সেবার আর তিনি কোন কথাই শুনলেন না। এবার সালাহ্ উদ্দীনকে চাচার বাহিনীর সাথে যুদ্ধযাত্রা করতে হলো। জংগীর মৃত্যুর পর ইসলামকে রক্ষা করেছে নূরুদ্দিন এবং শিরকুহ। এবারে নতুন এক সিপাহসালারের আবির্ভাবের সূচনা বুঝি হলো।

মিসরে তখন ফাতেমী বংশের খলীফার রাজত্ব করছেন। তাঁরা শুধু নামেমাত্র খলীফা ছিলেন। পূর্বেকার গৌরব হারিয়ে তাঁরা বিলাসব্যসনে মগ্ন থাকতেন। বলতে গেলে উযিরই ছিল দেশের সর্বেসর্বা। খলীফা ছিলেন তাঁদের হাতের পুতুল। বাগদাদের খলীফার সাথে মিসরের খলীফার মধ্যে আদৌ ভাব ছিল না। বাগদাদের খলীফা ছিলেন সুন্নী মুসলমান আর মিসরের খলীফা ছিলেন শিয়া।

তাদের মিল ছিল শুধু এক জায়গায়—দুই খলীফাই ছিলেন উযির-নাযির আর বিভিন্ন দলপতিদের হাতের পুতুল মাত্র।

নূরুদ্দিন যখন সিরিয়া দখল করলেন, তখনই সবকিছুর যেন তাল হারিয়ে ফেললেন। জেরুজালেমের খৃস্টান রাজা মুসলমানদের শক্তি বাড়তে দেখে শংকিত হলেন। তিনি ভাবলেন, নূরুদ্দিন এখন যদি মিসরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিসর দখল করেন, তাহলে তার শক্তি এত বেড়ে যাবে যে মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম আর রক্ষা করা যাবে না। এদিকে সিরিয়া অধিপতি নূরুদ্দিনও দেখলেন খৃস্টানরা যদি মিসরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিসর দখল করে, তাহলে সমস্ত তল্লাটে তাদের দাপট অত্যন্ত বেড়ে যাবে। মুসলমানদের আর রক্ষা থাকবে না।

উযির-নাযিররা দেশের সর্বেসর্বা হলে যা হয়, মিসরে একটুও শান্তি ছিল না। আজ যদি শাওয়ার উযির হয়, কালই তাঁকে গদী ছাড়তে হয় আর একজনের কাছে। এমনি করেই শাওয়ার উযিরের পদ ছাড়তে বাধ্য হলেন দিরঘিমের কাছে। শাওয়ার তখন দামেশকে এসে নূরুদ্দিনের কাছে সাহায্য চাইলেন। নূরুদ্দিন জানতেন মিসর দখল করতে পারলে তার মত বড় সুলতান আর কেউ থাকবে না। কিন্তু এর ফলে জেরুজালেমের রাজার সাথে তার আবার যুদ্ধ বাধতে পারে। নূরুদ্দিন সেজন্যে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে দিরঘিমের সাথে জেরুজালেমের রাজার গণ্ডগোল বাধল। জেরুজালেমের রাজা অমালরিককে বহু সোনা-দানা দিয়ে সন্ধি স্থাপন করলেন। এ খবর পেয়ে নূরুদ্দিনের আর কোন উপায় থাকল না। অমালরিক কিছু বুঝবার আগেই শাওয়ার দামেশক-বাহিনীর সাহায্য নিয়ে মিসর আক্রমণ করলেন। তাকে সাহায্য করার জন্য পেছনে পেছনে সেরা তুর্কী সেনাদের নিয়ে এগুতে লাগলেন বীর-কেশরী শিরকুহ। শিরকুহর সাথে থাকলেন সালাহ্ উদ্দীন।

শাওয়ার কিন্তু দিরঘিমকে পরাজিত করে উযির হয়ে বসেই সব ভুলে গেলেন। দামেশকে যে সব ওয়াদা করে এসেছেন বেমালুম তা অস্বীকার করে বসলেন। তেজী সেনাপতি শিরকুহ এটা সহ্য করতে রাযী হলেন না। তিনি কায়রো অবরোধ করে বসলেন। আর সালাহ্ উদ্দীনকে পাঠালেন বিলবেজ এবং আর আর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলো দখল করতে।

মিসরের নতুন উযির শাওয়ার তখন আগেকার শত্রুতা ভুলে গিয়ে অমালরিকের কাছে সাহায্য চাইল। অমালরিক জানতেন মিসরে নূরুদ্দিনের জয়লাভ মানেই হলো একদিন না একদিন মুসলমানদের হাতে জেরুজালেম ছেড়ে

দেয়া। তাই তিনি তাড়াতাড়ি মিসরে সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু সৈন্য পাঠাবার পরই তিনি বুঝলেন যে, মিসরে সেনাবাহিনী পাঠানোর ফলে তার রাজধানী অরক্ষিত হয়ে গেছে। এদিকে শিরকুহও অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বেকায়দায় পড়ে গেলেন। তাই দু'দলই আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল।

প্রথম ব্যর্থতায় শিরকুহর জেদ আরও বেড়ে গেল। তিনি মিসর থেকে ফাতেমী খলীফাদের দুর্বলতা খুব ভাল করেই বুঝে এসেছিলেন। মনে মনে তার উচ্চাশাও ছিল প্রায়-স্বাধীন মিসরের শাসনকর্তা হবার। নূরুদ্দিনও তার পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত মত দিলেন। বাগদাদের খলীফাও দোয়া-পত্র পাঠালেন তার শত্রু ফাতেমী বংশকে যাতে পরাস্ত করতে পারেন।

দুই হাজার সেরা অশ্বারোহী সেনা নিয়ে শিরকুহ আবার মিসরের পথে যাত্রা করলেন ১১৬৭ সালের প্রথমদিকে। কায়রোর চল্লিশ মাইল দক্ষিণে নীল নদীর তীরে শিরকুহ কোন বাধা ছাড়াই এসে পৌঁছলেন। নদীর পশ্চিম তীরে তার সেনাবাহিনী পার না হতেই পূর্ব তীরে অমালরিক তার সেনাবাহিনী নিয়ে হাযির হলেন। কেউ কাউকে আক্রমণ না করে নদীর দু'তীর ধরে কায়রোর পানে এগিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত কায়রোর কাছে ফুসতাতে এসে অমালরিক তাঁবু গাড়লেন আর শিরকুহও ঘাঁটি গাড়লেন গির্জার কাছে। খৃস্টান বাহিনীর সাথে শাওয়ার এক চুক্তি করলেন যাতে খলীফা স্বয়ং স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। অমালরিকের সেনাপতি খলীফার প্রাসাদের কারুকার্য এবং শিল্প নৈপূণ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল। যাহোক এবার মিসরীয় সেনাবাহিনী এবং জেরুজালেমের খৃস্টান সেনারা মুষ্টিমেয় সেনাকে আক্রমণ করার আয়োজন শুরু করল।

শিরকুহর সেনাপতিদের কেউ কেউ আক্রমণ না করে চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিল। কারণ, শত্রুপক্ষ তাঁদের চেয়ে দলে ভারী ছিল। কিন্তু একজন তরুণ সেনাপতি এতে বিদ্রূপ করে তাদের বললেন, যে, যারা এত ভীরু তাদের উচিত যুদ্ধ করা নয়, বাড়ি গিয়ে চাষবাস করা। শিরকুহও তাই আক্রমণ করার পক্ষেই মত দিলেন। ফলে মিসরের সেনাবাহিনী অতি সহজেই পরাজিত হলো। জেরুজালেম বাহিনী এতে সাহস হারিয়ে পিছু হটতে লাগল। শিরকুহ কিন্তু এত অল্প সেনা নিয়ে কায়রো পর্যন্ত এগুতে সাহস পেলেন না। তিনি ঘুরো পথ ধরে মরুভূমি পার হয়ে আচমকা আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে, সালাহ্ উদ্দীনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। অর্ধেক সৈন্য নিয়ে তিনি এবার দক্ষিণ মিসরে নিজের আধিপত্য স্থাপনের জন্য বের হলেন।

শিরকুহ আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করার কিছু পরই সালাহ্ উদ্দীন বিপদের সম্মুখীন হলেন। খৃস্টান নৌবাহিনী সমুদ্রপথে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করল। আর অন্যদিকে জেরুজালেমের খৃস্টান এবং মিসরের খলীফার সেনাদল একসাথে আলেকজান্দ্রিয়া ঘেরাও করল। ইতিমধ্যেই সালাহ্ উদ্দীন নীল নদের যুদ্ধে খুব সাহসিকতা এবং রণকৌশলতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রথম তিনি স্বাধীনভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। প্রথমটায় তিনি খুব অসুবিধায় পড়লেন অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে। এর ওপর স্থানীয় লোকরাও ভাবল, সালাহ্ উদ্দীনের পক্ষে যুদ্ধ করে তাদের আর কি লাভ। শহরে অবরোধের দরুন খাদ্যাভাবও দেখা দিল। সালাহ্ উদ্দীন চাচার কাছে খবর পাঠিয়ে শহর রক্ষা করতে লাগলেন দিনের পর দিন। স্থানীয় লোকদের বোঝালেন যে, খৃস্টানরা শহর অধিকার করলে তাদের জানেমালে রক্ষা থাকবে না। এ কথাটা সবাই জানত। তখন স্থানীয় লোকেরাও সালাহ্ উদ্দীনকে সাহায্য করতে লাগল। ইতিমধ্যে শিরকুহ বহু সোনাদানা নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার পানে এগিয়ে আসছেন শুনে সালাহ্ উদ্দীনের সেনাবাহিনীর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যখন খবর এল শিরকুহ কায়রো অবরোধ করছেন তখন অমালরিক বাধ্য হয়ে সন্ধি স্থাপন করলেন। ঠিক হলো মিসর মিসরের লোকেরাই শাসন করবে।

শিরকুহ এবং সালাহ্ উদ্দীন দামেশকে ফিরে এলেন। শিরকুহ এবং সালাহ্ উদ্দীন তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে দামেশকে ফিরে এলেন বটে কিন্তু জেরুজালেমের রাজা সন্ধির শর্ত ভুলে গেলেন। তিনি কায়রোয় এবং ফুসতাতে খৃস্টান পাঠাতে শুরু করলেন। বিশেষ করে অমালরিকের সেনাপতিরা সকলে মিসর জয় করে খৃস্টান রাজ্য গড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। খৃস্টান বাহিনী বিলরেজ দখল করে হাজার হাজার মুসলিম নর-নারীকে হত্যা করল, নারী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ বিচার না করে। ১১৬৮ সালের এই ঘটনা সমস্ত মিসরবাসীকে একত্রীভূত করল। লোভী খৃস্টান সৈন্যগণ যখন লুটতরাজে মশগুল তখন মিসরবাসী তাদের রক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করে তুলতে লাগল। যাতে খৃস্টানরা কোন মাথা গুঁজবার জায়গা না পায় সেজন্যে ফুসতাত নগরে শাওয়ারের আদেশে আগুন লাগান হলো। চুয়ান্ন দিন ধরে সেই আগুন জ্বলছিল।

অমালরিক তখন কায়রো অবরোধ করার জন্য এগুতে থাকলেন। শাওয়ার তখন তাকে বহু সোনাদানার লোভ দেখিয়ে আক্রমণের দিন পিছাতে লাগলেন। এর মধ্যে মিসরের তরুণ খলীফা নিজে দামেশকে নূরুদ্দিনের কাছে সাহায্যের অনুরোধ করে লিখলেন। এতদিন শিরকুহর কোন অভিযানেই নূরুদ্দিন মন দিয়ে

সাহায্য করেননি। কিন্তু এবার তিনি খৃস্টানদের মতলব ভাল করেই বুঝলেন। নিজের দেহরক্ষী দু'হাজার অশ্বারোহী সেনা, ছ'হাজার তুর্কী সেনা এবং পিছনে আরও বহু সৈন্য নিয়ে শিরকুহ এবার জেরুজালেমের রাজা অমালরিককে সন্ধির শর্ত ভাঙার শাস্তি দিতে অগ্রসর হলেন।

সবই যখন তৈরি তখন সালাহ্ উদ্দীন অনুপস্থিত। চাচা শিরকুহ অবাক হলেন। সুলতান নূরুদ্দিনও অবাক হলেন। লোক পাঠান হলো। সালাহ্ উদ্দীন এলেন।

চাচা শুধালেন; কি সালাহ উদ্দীন, তুই এখনও তৈরি হস্‌নি? নে চল।

সালাহ্ উদ্দীন জবাব দিলেন, চাচাজান, আমাকে মাফ করুন। মিসরের সিংহাসন দিলেও আমার যাবার ইচ্ছে নেই। ওসব যুদ্ধ-বিগ্রহ আমার ধাতে সয় না।

নূরুদ্দিন খুবই অবাক হলেন। কারণ সালাহ্ উদ্দীনের বীরত্বের কথা তিনি শুনেছিলেন। তিনি শুনলেন সালাহ্ উদ্দীন পরহেজগার আলেমদের সাথেই থাকতে বেশি ভালবাসেন। নিরূপদ্রব শান্তিতে থাকতে চান।

শিরকুহ কিন্তু ওসব কোন কথা শুনতে রাজি নন। তিনি বললেন, সুলতানকে যে সালাহ্ উদ্দীনকে তার চাই-ই। নূরুদ্দিন তখন তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করালেন।

শেষ পর্যন্ত ১১৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রচুর সৈন্যসামন্ত, রসদ আর টাকা-পয়সা নিয়ে শিরকুহ বাহ্যত শাওয়ারকে উদ্ধার করার জন্য মিসরের পথে রওয়ানা দিলেন। প্যালেস্টাইন রাজা তখন বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। খৃস্টানরা শিরকুহর কাছে একেবারে অপদস্ত হয়। সিরিয়ার সেনাবাহিনী শিরকুহর পরিচালনায় বিজয়গর্বে কায়রো প্রবেশ করল। খলীফা স্বয়ং শিরকুহরকে সম্মানিত করলেন।

শাওয়ার কিন্তু এত বাড়াবাড়ি সহ্য করতে রাজি হলেন না। বাইরে বাইরে খুব বন্ধুত্বের ভাব দেখাতে লাগলেন বটে, কিন্তু তলে তলে মতলব ভাজতে লাগলেন কি করে শিরকুহকে মারা যায়। সালাহ্ উদ্দীন তা টের পেয়ে গোপনে শাওয়ারকে হত্যা করালেন। শাওয়ারের মৃত্যুতে খলীফাও খুব খুশি হলেন। কারণ দিনের পর দিন শাওয়ারের আধিপত্য তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

খলীফা তখন শিরকুহকে উযির মনোনীত করলেন। কায়রোর অধিবাসীরাও এতে খুশি হয়ে বিপুল উৎসাহে শিরকুহকে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু শিরকুহর কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। বৃহত্তর কাজ যে করবে তার জন্য পথ খোলা রেখে

শিরকুহ মাত্র দুমাস পরই ইনতিকাল করলেন। তার মত রণনিপুণ কঠোর সাহসী দিলখোলা অথচ ভয়ংকর লোক কমই ছিল। সবাই যেমন তাকে ভয় করত তেমনি ভালও বাসত।

বীর শিরকুহর ইনতিকালের তিনদিন পর ফাতেমীয় খলীফা সালাহ্ উদ্দীনকে উজির পদে নিযুক্ত করলেন। ১১৬৯ সালের মার্চ মাসে সালাহ্ উদ্দীন উযির হলেন বটে কিন্তু তিনি বুঝলেন খলীফা তাকে উযির নিযুক্ত করায় সকলে খুশি হয়নি। বিশেস করে শিরকুহর সেনাদলে তারচেয়ে অভিজ্ঞ অনেক সেনাপতি ছিলেন। শিরকুহর অনেক সেনাপতিই সালাহ্ উদ্দীনের অধীনে কাজ করার চেয়ে দামেশকে ফিরে যাওয়াই সম্মানজনক মনে করলেন। আর যারা থেকে গেলেন তাঁদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে নানাভাবে বশ মানান হলো।

উযির হবার পর থেকে সালাহ্ উদ্দীন আরও কঠোরভাবে জীবন যাপন করতে লাগলেন। আগে থেকেই তিনি পরহেজগার ছিলেন। এবার থেকে তার একমাত্র স্বপ্ন হলো পবিত্র ভূমি জেরুজালেমকে খৃষ্টানদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করা। এজন্য প্রথমেই দরকার হবে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য। এখন থেকেই তিনি তাঁর আয়োজন শুরু করলেন।

প্রথমেই তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কায়রোতে নিয়ে এসে নিজের দল ভারী করলেন। আব্বা আইয়ুব এবং সালাহ্ উদ্দীনের অন্য ভাইয়েরাও এলেন। আব্বাকে, এমন কি সালাহ্ উদ্দীন উযিরের পদ ছেড়ে দিতে চাইলেন।

কিন্তু চির-বিচক্ষণ বিবেচক আইয়ুব তাতে রাজি হলেন না। ছেলেকে বললেন, দ্যাখ, আল্লাহ তোমাকে এ পদের উপযুক্তই ভেবেছেন। নচেত এ পদ তুমি পেতে না। তোমার উন্নতিতে আমি কেন বাদ সাধতে যাব।

সালাহ্ উদ্দীনের অবস্থা তখন বেশ অদ্ভুত। তিনি একদিকে গোঁড়া সুন্নী মুসলিম খলীফা এবং তার সুলতানের সেনাপতি, অন্যদিকে তিনি শিয়া মুসলিম খলীফার প্রধানমন্ত্রী। কায়রোর শিয়া মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল, এমন কি বিদ্রোহও করল। তিনি তা কঠোরভাবে দমন করলেন। শুধু তাই নয় তার ভাইদের সাহায্যে তিনি নতুন নতুন জায়গা দখল করে নিজের শক্তি বাড়াতে লাগলেন।

সালাহ্ উদ্দীন তখনও নূরুদ্দিনের সেনাপতি মাত্র। যদিও মিসরের ব্যাপারে তখন তিনিই নূরুদ্দিন সর্বেসর্বা। তাই সালাহ্ উদ্দীন জানতেন তার শক্তি বেশি বাড়লে, একদিকে নূরুদ্দিন যেমন তাকে সন্দেহ করতে শুরু করবেন, অন্যদিকে মিসরের শিয়া খলীফা এবং তার অনুচররাও তাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

তিনি তাই এমন সব জনহিতকর কাজে হাত দিলেন যাতে মিসরের সকল সাধারণ মানুষের কাছে তিনি খুব প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। সালাহ্ উদ্দীনের ধর্মপ্রীতি, দানশীলতা, বহু জনহিতকর কাজের কথা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। মিসর ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

জেরুজালেমের খৃস্টানরা চুপচাপ বসে ছিল না। তারা ঠিকই বুঝলো যে, সালাহ্ উদ্দীনের শক্তি বাড়তে থাকলে তাদের সমূহ বিপদ। এদিকে সিরিয়ার শক্তিশালী সুলতান নূরুদ্দীন অন্যদিকে তখন পর্যন্ত তাঁর সেনাপতি, প্রকৃতপক্ষে মিসরের অধিপতি সালাহ্ উদ্দীন এই দুই মুসলিম শক্তির মাঝখানে জেরুজালেমে খৃস্টানরা বেশিদিন টিকতে পারবে না। তাই সালাহ্ উদ্দিনের শক্তি অঙ্কুরেই শেষ করার জন্য খৃস্টানরা তৈরি হলো।

আলেকজান্দ্রিয়া এবং দেমিয়েটা বন্দর তখন সালাহ্ উদ্দীনের হাতে। খৃস্টানরা দেখলো এ বন্দরগুলো যদি মুসলমানদের হাতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে ইউরোপ থেকে খৃস্টান বাহিনীর আসাই মুশকিল হবে, তাই তারা ২২০টি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে প্রথমে দেমিয়েটা অবরোধ করল। অন্যদিক থেকে জেরুজালেমের বাহিনীও মিসর আক্রমণ করল।

সালাহ্ উদ্দীন তখনও প্রকৃতপক্ষে সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দিনের সেনাপতি। তিনি সুলতানের কাছে সাহায্য চেয়ে অনুরোধ জানালেন। ভয়ংকর যুদ্ধে খৃস্টানদের যুদ্ধজাহাজ সব ধ্বংস হয়ে গেল। খৃস্টানরা নিদারুণভাবে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরল। এরপর সালাহ্ উদ্দীন খৃস্টানদের সাজা দিতে চললেন। খৃস্টানদের সীমান্ত শহর সাজা আক্রমণ করে তাদের উত্ত্যক্ত করতে শুরু করলেন। লোহিত সাগরের দ্বারমুখ এইলা বন্দর খৃস্টানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হজ্জযাত্রীদের যাত্রাপথ সুগম করলেন। তাছাড়া বহু রণতরী নির্মাণ করতে লাগলেন।

মিসরের লোকদের কাছে সালাহ্ উদ্দীন আগেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এবারে সমস্ত মুসলিম জাহানে তিনি সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন।

এতদিন জুমার নামাযের খোৎবার সময় মিসরে আব্বাসী ও ফাতেমী বা সুন্নী এবং শিয়া দুই খলীফারই নাম উচ্চারণ করা হতো। সালাহ্ উদ্দীন নিজে সুন্নী। তিনি এটা পছন্দ না করলেও মিসরের লোকদের খুশি রাখার জন্য ফাতেমী খলীফার নাম নেবার রেওয়াজ চালু রেখেছিলেন। যখন সালাহ্ উদ্দীন বুঝলেন যে, এবার তার কথা আর কেউ অমান্য করার সাহস পাবে না, তখন তিনি শুধু বাগদাদের খলীফার নাম খোৎবায় উচ্চারণ করার প্রথা মিসরে চালু করলেন।

বাগদাদের আব্বাসী খলীফা এতে খুশি হয়ে তার সুলতান নূরুদ্দিন এবং সেনাপতি সালাহ্ উদ্দীনকে সম্মানিত করলেন।

ইতিমধ্যে ফাতেমী খলীফা মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করলেন। সালাহ্ উদ্দীনের পথ এবার উন্মুক্ত হলো।

সিরিয়া অধিপতি নূরুদ্দিন তার সেনাপতি সালাহ্ উদ্দীনের দিনদিন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে চিন্তিত হলেন। তাই তিনি সালাহ্ উদ্দীনের শক্তি খর্ব করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ হবার আগেই ১১৭৪ সালের ১৫ মে তিনি ইনতিকাল করলেন। এর আগেই সালাহ্ উদ্দীন খৃস্টানদের সিসিল থেকে এক নয়া অভিযান প্রতিহত করেছেন। তার বিরুদ্ধে সভাকবি ওমারার ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে দলের চাঁইদের শাস্তি দিয়েছেন। সুদান পর্যন্ত জয় করে বিপুল সম্মান, অর্থ আর শক্তির অধিকারী হয়েছেন। নূরুদ্দিনের মৃত্যুতে সিরিয়ার সিংহাসন এবারে তাঁকে হাতছানি দিতে লাগলো।

নূরুদ্দিনের ছেলে সালিহ্ ইসমাইল তখন নেহাৎ এগার বছরের বালক। কাজেই তার অভিভাবক কে হবেন, এই নিয়ে সেনাপতিদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। জংগী এবং নূরুদ্দীনের রক্তে গড়া সিরিয়া সাম্রাজ্য বিভিন্ন সেনাপতিদের মধ্যে খণ্ডবিখণ্ড হতে লাগলো। এ সময়ে জেরুজালেমের খৃস্টান রাজা অমালরিক মারা যান। তা না হলে মুসলমানদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিতে তারা কখনই কসুর করত না। সালাহ্ উদ্দীন তাঁর পূর্বতন প্রভুর সাম্রাজ্যের বিপদের কথা বুঝতে পারলেন। এ পর্যন্ত যে বংশের জন্য তাদের উত্থান, সেই বংশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে চাইছিলেন না। কিন্তু যখন জেংগীর সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদের কথা তিনি ভাবলেন, তখন তার আর কোন উপায় থাকলো না। তিনি সুলতান সালিহকে তার প্রভু হিসেবে মেনে চিঠি দিলেন। মিসরে খোৎবার নতুন খলীফার নাম জুড়ে দেয়া হলো। মুদ্রায় নতুন খলীফার নাম খোদাই করা হলো। কিন্তু সালাহ্ উদ্দীনকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। আলেপ্পোয় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করলেন। নূরুদ্দিনের পুরাতন সেনাপতি তখন আলেপ্পোর শাসনকর্তা। তিনি খলীফার অভিভাবক হয়ে বসলেন। দামেশকের আমীর ওমরাহগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ভয়ে খৃস্টানদের প্রচুর টাকা দিয়ে সন্ধি করল।

এতে সালাহ্ উদ্দীন আরও রেগে গেলেন। তিনি কায়রো থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। দামেশক জয় করে তাঁর ভাই তুঘতিগিনকে শাসনকর্তা

নিযুক্ত করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আলেপ্পো ছাড়া নূরুদ্দিনের সমস্ত সিরিয়া সাম্রাজ্য সালাহ্ উদ্দীনের হাতে চলে এল।

নূরুদ্দিনের অন্য ভাই জেংগীর সাম্রাজ্যের যে ভাগ পেয়েছিলেন তার নাম মোসল। মোসলে তখন রাজত্ব করছিলেন নূরুদ্দিনের ভাইয়ের ছেলে দ্বিতীয় সাইফ উদ্দীন গাজী। চাচার মৃত্যুর পর চাচাত ভাইয়ের রাজত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এতদিন তিনি সালিহর রাজ্যের ওপরে থাবা দিতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু যখন দেখলেন সালাহ্ উদ্দীন হঠাৎ উড়ে এসে তাদের বংশের ওপর থাবা বিস্তার করছে, তখন তার বংশমর্যাদায় আঘাত লাগলো। তখন তিনি আলেপ্পোয় তার চাচাত ভাই সালিহর বাহিনীর সাহায্যে মস্ত এক বাহিনী পাঠালেন। আলেপ্পো এবং মোসলের মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে আলেপ্পো অবরোধ করলেন। তখন সালিহ্ এবং তার উপদেষ্টারা সন্ধি করতে বাধ্য হলো।

সালাহ্ উদ্দীন এখন মিসর, সিরিয়ার দামেশক প্রদেশ, ইমেসা ও হামাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হলেন। এমনকি আলেপ্পো পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হলো। এতদিন পর এই প্রথম সালাহ্ উদ্দীন নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। মুসলিম জাহানের খলীফা বাগদাদ থেকে তাকে ১১৭৫ সালে দোয়া এবং সনদপত্র পাঠালেন।

বছরখানিক সালাহ্ উদ্দীন আর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন না। নিজের সামাজ্য গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত থাকলেন। এদিকে মোসলের সুলতান সাইফ উদ্দীন আবার বিরাট বাহিনী নিয়ে সালাহ্ উদ্দীনকে তাড়িয়ে দেবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ১১৭৬ সালের এই যুদ্ধে সাইফ উদ্দীন কোন মতে প্রাণ হাতে করে বাঁচলেন। সালাহ্ উদ্দীনের সাথে এই যুদ্ধে সাইফ উদ্দীনের অধিকাংশ সেনাপতি মারা গেলেন। বন্দি এবং আহতদের সাথে সালাহ্ উদ্দীন খুব ভাল ব্যবহার করলেন। অনেককে মুক্ত করে দেবার সময় এমন কি টাকা-পয়সা দিলেন। নিজের জন্য কিছু মাত্র না রেখে যুদ্ধে যত টাকা-পয়সা পেয়েছিলেন সব সৈন্যদের দিয়ে দিলেন। ফরে সালাহ্ উদ্দীন শত্রুপক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে যারা লড়েছিল তাদেরকে যেমন জয় করলেন, তেমনি তাঁর নিজের বাহিনীও তার প্রতি এমন অনুগত হয়ে রইলো যে, তাঁর জন্য হাসিমুখে সবকিছু করতে তাদের বাধতো না।

এই সময়ে সালাহ্ উদ্দীন আততায়ীর হাত থেকে কোন মতে প্রাণ বাঁচান। একদিন সালাহ্ উদ্দীন তার তাঁবুতে বিশ্রাম করছেন এমন সময় হঠাৎ এক আততায়ী ছুরি নিয়ে তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সালাহ্ উদ্দীনের মাথায় মোটা টুপি ছিল তাই ছুরি তাঁর মাথায় লেগেও কিছু করতে পারলো না। ততক্ষণে

আততায়ীকে আঘাত করেছে। একটু পরেই ছুরি হাতে আততায়ী ধপাস করে পড়ে গেল।

সালাহ্ উদ্দীন বুঝলেন এ কাদের কাজ। তিনি সেজন্যে আরও সাবধানে চলতে লাগলেন, আযাযের দলপতি গুমুশটিগিন এর পেছনে ছিল। তাই প্রথমেই তিনি আযায অধিকার করলেন এবং আলেপ্পো আক্রমণ করলেন। বালক সুলতান বাধ্য হয়ে যে সব রাজ্য সালাহ্ উদ্দীন এ পর্যন্ত জয় করেছেন তার সুলতান বলে সালাহ্ উদ্দীনকে মেনে নিলেন।

সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হবার পরই একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটল। একটি সুসজ্জিত পাল্কি সালাহ্ উদ্দীনের তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়াল। একটু পরই সেখান থেকে ছোট্ট এক কিশোরী সালাহ্ উদ্দীনের তাঁবুর ভেতরে গেল। এ কিশোরী আর কেউ নয় সুলতান সালিহ্র বোন, মুসলিম বীর নূরুদ্দিনের মেয়ে। সালাহ্ উদ্দীন তাকে খুব সম্মান দেখিয়ে যত্ন-আপ্যায়ন করে জিজ্ঞেস করলেন, তার যদি কোন ইচ্ছে থাকে তা বলতে।

রাজকুমারী ভেজা চোখে বললো যে, আযাযের দুর্গপ্রাসাদ আমি চাই। ওখানেই তো আমরা আগে ছিলাম।

সালাহ্ উদ্দীনের চোখও ভিজে এল। কারণ একদিন জংগী এবং নূরুদ্দিনই তাঁর বংশের সৌভাগ্যের পরশমণি এনেছিলেন।

সালাহ্ উদ্দীন বললেন, তাই হবে।

শুধু তাই নয়, সালাহ্ উদ্দীন নিজে রাজকুমারীকে আযাযের দুর্গপ্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

এরপর প্রায় ছ'বছর জংগীর বংশধরদের সাথে সালাহ্ উদ্দীনের কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি। এ সময়ে জেরুজালেমের রাজার সাথেও তার নামেমাত্র এক শান্তি স্থাপন হয়। নামেমাত্র এ জন্য যে, খৃস্টানরা কখনই সন্ধিপত্রের চুক্তি পালন করত না।

যাহোক মোটামুটি শান্তি ফিরে এলে সালাহ্ উদ্দীন ঠিক করলেন আততায়ীদের বুড়ো দলপতিকে এবারে তিনি শায়েস্তা করবেন। এর আগে আযাযের দলপতি গুমুশতিগিন আততায়ীদের নেতা শেখ সিনানকে বহু টাকা দিয়েছিলেন সালাহ্ উদ্দীনকে গুপ্তঘাতকের হাতে মারবার জন্য। সালাহ্ উদ্দীন আততায়ীর হাত থেকে প্রাণও বাঁচিয়েছেন কবার, শেখ সিনানের গুপ্তঘাতকের দলকে ভয় করত না এমন সুলতান বা দলপতি মুসলিম জাহানে ছিল না। যাকে ইচ্ছা তাকে তারা হত্যা করতো। হত্যাকারীকে কেউ ধরতে পারত না। দু'বার

আততায়ীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছেন বটে, কিন্তু সালাহ্ উদ্দীন একেবারে শান্তিও পাচ্ছিলেন না সিনানের দলের কথা ভেবে। তাই এবারে একটু স্থির হয়ে বসেই তিনি সিনানের দুর্গাঞ্চলে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সেই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে সালাহ্ উদ্দীন সৈন্যবাহিনী আর ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগুতে গিয়ে হিমশিম খেলেন।

যাহোক শেষ পর্যন্ত সিনানের দুর্গের কাছে তারা এসে তাঁবু গাড়লেন। সালাহ্ উদ্দীন বিশেষ করে নিজের তাঁবুর চারধারে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন। রাতে ঘন ঘন পাহারা বদলাবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর সিনানকে খবর পাঠালেন বশ্যতা স্বীকার করার দাবি জানিয়ে।

সিনান সেদিন কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু রাতে সালাহ্ উদ্দীন ঘুমুতে পারলেন না গুপ্তঘাতকের ভয়ে। পরদিন সকালে তিনি হুকুম দিলেন রাতে তার তাঁবুর চারধারে পুরু করে বালু আর চকের গুঁড়া ছড়িয়ে রাখতে, পরের রাতেও কড়া পাহারার ব্যবস্থা রাখলেন সালাহ্ উদ্দীন। কিন্তু আশ্চার্য–পরদিন সকালে দেখা গেল, বালু এবং চকের গুঁড়ার উপরে মানুষের পায়ের ছাপ। অথচ মজা এই, সব কটি ছাপই যেন সালাহ্ উদ্দীনের তাঁবু থেকে কেউ বেরিয়ে গেছে এমন বোঝায়। পাহারাদার সেনারা বললো, তার কেউ কিছু দেখেনি।

সালাহ্ উদ্দীন ভিতরে ভিতরে খুব চিন্তিত হলেন। সিনানকে আবার খবর পাঠান হলো। কিন্তু সেই রাতেই এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটল।

প্রতি রাতের মতই বহুক্ষণ জেগে থেকে অস্থির পায়চারী করে কেবলই বোধ হয় সালাহ্ উদ্দীনের একটু তন্দ্রার মত আসছিল। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন তিনি। হঠাৎ খস্খস্ আওয়াজ শুনে চোখ খুললেন। দেখেন ভয়ংকর এক মানুষের ছায়া কৃপাণ হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। অদম্য সাহসী সালাহ্ উদ্দীনও আর থাকতে পারলেন না। প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। সেপাই পাহারাদার সবাই দৌড়ে এল। কিন্তু কী অবাক, কেউ নেই। শুধু মনে হলো একটি উজ্জ্বল গোলকখণ্ড সালাহ্ উদ্দীনের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

সালাহ উদ্দীন এবারে এত ভয় পেলেন যে, সিনানের সঙ্গে সন্ধি করলেন যে, কেউ কারো বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না।

তারপর তাঁর সেনারা তাঁবু না গুটাতেই তিনি তাড়াতাড়ি সে ভয়ংকর স্থান ছেড়ে দামেশকে ফিরে ইয়েমেন বিজয়ী ভাই তুরান শাহ্র হাতে সিরিয়ার ভার দিয়ে দীর্ঘ দু'বছর পরে কায়রোয় ফিরে এলেন। রাস্তার পাশে অধীর আগ্রহে বিপুল জনতা দিগ্বিজয়ী সিপাহ্সালারকে খোশ্-আমদেদ জানাল।

১১৭৭ সালে কায়রোয় ফিরে সালাহ্ উদ্দীন মিসরের উন্নতিতে নতুন করে মন দিলেন। কায়রো যাতে শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে সেজন্য এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করলেন। শিক্ষার প্রসারের জন্যে করলেন বহু স্কুল-কলেজ আর পাঠাগার।

সালাহ্ উদ্দীন এ সময়ে যুদ্ধ না চাইলে কী হবে, জেরুজালেমের খৃস্টানদের মাথায় পোকা কামড়াতে লাগলো। তারা আবার সন্ধি লংঘন করে মুসলমানদের উত্ত্যক্ত করা শুরু করল। আলেপ্পোর ইলারিন দুর্গ তারা অবরোধ করল। এখানে ওখানে মুসলমান রাজ্যে হামলা লুটতরাজ করতে লাগল। সালাহ্ উদ্দীন আর ঠিক থাকতে পারলেন না। বিরাট বাহিনী নিয়ে খৃস্টানদের সাজা দেবার জন্যে অগ্রসর হলেন। আসকালান বিনা বাধায় তাঁদের হাতে চলে এল। মুসলিম সেনারা ভাবলো খৃস্টানরা ভয় পেয়ে গেছে। তারা আর মুসলমানদের আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। তারা হৈ-হুল্লোড় আনন্দে ডুবে গেল নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা ভুলে। সালাহ্ উদ্দীন বহু চেষ্টা করেও সেনাবাহিনীকে একত্র করতে পারলেন না; ফলে যা হয় তাই হলো। অতর্কিত খৃস্টানদের আক্রমণে মুসলিম বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। এত বড় পরাজয় সালাহ্ উদ্দীনের আর কোন দিন হয়নি।

সালাহ উদ্দীন এ পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারলেন না। তিন মাস পরই তিনি আবার খৃস্টানদের হাত থেকে ইমেসা দখল করলেন। কিন্তু শীত এসে যাওয়ায় সালাহ্ উদ্দীনকে তাঁর অভিযান আপাতত স্থগিত রাখতে হলো।

কিছুদিন না যেতেই খৃস্টানরা আবার মুসলমানদের সাথে বিরোধিতা শুরু করলো। বানিয়া তখন দামেশকের শস্যভাণ্ডার। বানিয়া-দামেশক রাস্তার মধ্য সীমান্তে খৃস্টানরা সন্ধিচুক্তি ভেঙ্গে দুর্গ তৈরি করে মুসলমানদের যাতায়াতের বাধা সৃষ্টি করতে লাগলো। সালাহ্ উদ্দীন তখন ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখশিয়ারের অধীনে একদল সৈন্য পাঠালেন। ফররুখশিয়ারের সাথে যুদ্ধে খৃস্টান রাজা বলডুইন কোনমতে বাঁচলেন বটে, তবে তাঁর বিবেচনাহীন কাজের শাস্তি দেয়ার জন্যে সালাহ্ উদ্দীন নিজে এসে খৃস্টানদের সাধের দুর্গ একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে সালাহ্ উদ্দীনের যুদ্ধজাহাজগুলোও খৃস্টান বন্দর সফেদ অবরোধ করল। বলডুইন বাধ্য হয়ে তখন এক অপমানজনক শর্তে সন্ধি করলেন।

এর মধ্যে এক অম্লমধুর ঘটনা ঘটলো। সালাহ্ উদ্দীনের সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে কায়ফা বলে একটি ছোট রাজ্য ছিল। তার রাজা ছিলেন আর এক নূরুদ্দিন। সালাহ্ উদ্দীনের সাথে আলেপ্পোর চুক্তি মারফত তাঁর মিত্রতা ছিল।

তিনি করেছিলেন কোনিয়া রাজ্যের সেলজুক সুলতান কিলিজ আরসালানের মেয়ে। কিলিজ আরসালানের সাথে সালাহ্ উদ্দীনের আবার তেমন সদ্ভাব ছিল না। নূরুদ্দিন যে রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি খুব অপরূপ সুন্দরী যেমন ছিলেন, তেমনি খুব ভাল ছিলেন। কিন্তু তা হলে কী হবে, নূরুদ্দিন স্ত্রীর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতেন। রাজকন্যা তখন দুঃখে তাঁর আব্বা কোনিয়ার সুলতান কিলিজের কাছে চিঠি লিখলেন। কিলিজ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে কায়ফা আক্রমণ করলেন। মিত্রতার শর্ত অনুযায়ী নূরুদ্দিন সালাহ্ উদ্দীনের কাছে সাহায্য চাইলে সালাহ্ উদ্দীন নূরুদ্দিনের পক্ষ নিলেন। কোনিয়ার সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের সাথে লড়াই করতে সাহস পেলেন না। তিনি সালাহ্ উদ্দীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। সালাহ্ উদ্দীন তখন নূরুদ্দিনকে ভর্ৎসনা করলে নূরুদ্দিন তার স্ত্রী কোনিয়ার সুলতানের মেয়ের সাথে ভাল ব্যবহার করার কথা দিলেন।

এমনি করে সালাহ্ উদ্দীন আরও এক নতুন মিত্র লাভ করলেন। এখন সালাহ্ উদ্দীনের রাজত্ব বিস্তৃত হলো এশিয়া মাইনর পর্যন্ত। নীল থেকে ফোরাত পর্যন্ত তিনিই তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম সুলতান। তাই তিনি যখন মধ্যপ্রাচ্যের সকল রাজার সভা আহ্বান করে প্রস্তাব করলেন যে, এবার থেকে আর যুদ্ধ নয়, তখন সকলেই আগামী দু'বছর পর্যন্ত কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিল। এ ১১৮০ সালের কথা।

এরপর সালাহ্ উদ্দীন ফররুখশিয়ারকে সিরিয়ার শাসনভার দিয়ে মিসরে আবার ফিরে এলেন। কিন্তু এর মধ্যে আলেপ্পোর সুলতান নূরুদ্দিনের বংশধর সালিহ ইনতিকাল করলেন। ইনতিকালের আগে সালিহ তার চাচাত ভাই মোসলের সুলতান ইজজেদদিনকে আলেপ্পোর শাসনভার নিতে আহ্বান করলেন। ১১৮২ সাল পর্যন্ত সালাহ্ উদ্দীন চুপ করে রইলেন। সে শান্তি চুক্তির মেয়াদ শেষ হলো। ১১৮২ সালের মে মাসে সালাহ্ উদ্দীন আলেপ্পো অভিযানে মিসর ত্যাগ করলেন। যাবার সময় মহাসমারোহে মিসরের মানুষেরা ইসলামের বীর সিপাহীকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন। উৎসবে হঠাৎ কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো... এই শেষবার দেখে নাও...

কায়রো ত্যাগের সময় মনটা তাঁর তাই খুব ভারাক্রান্ত হয়ে রইলো। তাঁর মনে হলো এই শেষবারের মত কায়রো থেকে তিনি বিদায় নিচ্ছেন...

আলেপ্পোর জনসাধারণ বিপুল উৎসাহে সালাহ্ উদ্দীনকে খোশ-আমদেদ জানাল। দু'মাস আলেপ্পোয় থেকে সালাহ্ উদ্দীন দামেশকে গেলেন। তাঁর অবশিষ্ট জীবনের প্রধান কর্মস্থল হলো এই দামেশক। এ কয় বছরে অনেক পরিবর্তন

এসেছে। দামেশকের শাসনকর্তা বীর ফররুখশিয়ার আর বেঁচে নেই। এদিকে প্যালেস্টাইনের খৃস্টান ফ্রাঙ্করা ক্রমেই বেশি সাহসী হয়ে উঠছিল। তাঁরা প্রায়ই মুসলিম অঞ্চলে লুটতরাজ করত, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিত। শস্য বাগান সব ধ্বংস করে দিয়ে যেত। তাদের সাহস এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, এমন কি তারা পবিত্রভূমি আরব জয় করে মক্কা-মদীনাকে ধ্বংস করে ফেলার মতলব ভাজছিল। খৃস্টানরা এ বদ মতলব হাসিলের জন্য চ্যাটিলিওনের রেজিনাল্ডের নেতৃত্বে অভিযান শুরু করল। প্রথমেই তিনি তার যুদ্ধজাহাজগুলো আস্তে আস্তে আসকালন বন্দর থেকে আকাবা উপসাগরে পাঠাতে শুরু করলেন। লোহিত সাগরের আফ্রিকান তীরে আয়ধাব বন্দর এবং এইলা বন্দর তার রণতরী গিয়ে অবরোধ করল। তখন সালাহ্ উদ্দীন তার মিসরের যুদ্ধজাহাজগুলো পাঠালেন নৌসেনাপতি লুলুর অধীনে। খৃস্টানদের একের পর এক তাড়িয়ে নিলেন বীর সেনাপতি লুলু। হাওরা বলে ছোট্ট একটি বন্দরে খৃস্টানরা চুপি চুপি জমায়েত হয়েছিল, সেখান থেকে পবিত্র মক্কা-মদীনা আক্রমণ করবে বলে। যেই তারা লুলুর যুদ্ধজাহাজগুলো দেখতে পেল অমনি তারা তীরে নেমে পালাতে শুরু করল। মক্কা-মদীনার অপমানের কথা শুনে মুসলিম সৈন্যদের শরীরে তখন আগুন জ্বলছিল। মাটিতে নেমেই নৌসেনারা ঘোড়ায় চড়ে শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করল। সমস্ত খৃস্টান সেনাকে পরাজিত করে টুকরো টুকরো করে কেটে তাদের পাপের শাস্তি দেয়া হলো। আর কিছু বাছাই করা খৃস্টানকে পাঠান হলো মক্কা শরীফে, যাকে অপমান করতে তারা চেয়েছিল। সেখানে মিনার ময়দানে গরু-ছাগলের মত তাদের জবেহ্ করা হলো।

সমস্ত মুসলিম জাহান খৃস্টানদের চরম আস্পর্ধার কথা শুনে রাগে কাঁপতে লাগল। সালাহ্ উদ্দীন তাঁর সৈন্যদের ছুটি দিয়েছিলেন। সবাইকে ছুটি থেকে আবার ডেকে পাঠান হলো। খৃস্টানরাও বুঝল এবার তারা অবিবেচকের কাজ করে মুসলমানদের দারুণভাবে রাগিয়ে দিয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন রাজরাজড়ার কাছ থেকে বহু সৈন্য এসে প্যালেস্টাইনে জড় হতে লাগল।

সালাহ্ উদ্দীন জর্দান অতিক্রম করে ঘোউর বিমান ধ্বংস করে জেজরিল উপত্যকা পর্যন্ত এগিয়ে গিলবোয়ার কাছে তাঁবু গাড়লেন। জেরুজালেমের রাজা বলডুইন তখন অসুস্থ। লুসিগনানের গই বিরাট খৃস্টান বাহিনী নিয়ে সালাহ্ উদ্দীনকে বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সালাহ্ উদ্দীন প্রথমদিকে খৃস্টানদের বেকায়দায় ফেললেও বর্ষা এসে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সালাহ্ উদ্দীন বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে রাজা বলডুইন মৃত্যুবরণ করলেন। খৃস্টানদের

রাজা হলেন এক বালক শিশু। খৃস্টানরা বুঝলো, এখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের লাভ হবে না। বরং সন্ধি করাই ভাল। পরে সুযোগ-সুবিধা এলে মুসলমানদের সাথে আবার বোঝা যাবে। চার বছরের জন্যে যুদ্ধ নয় চুক্তি করা হলো।

এই সময়ে সালাহ্ উদ্দীন তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জনহিতকর কাজে মন দিলেন। দামেশক নগরীর বহুবিধ উন্নতি তিনি করলেন। শহরের রক্ষাব্যবস্থা দৃঢ় করে তোলা হলো। অনেক সুন্দর সুন্দর দালান-কোঠা তৈরি হলো। স্কুল-কলেজ গড়ে উঠল। এমনিতেই দামেশক অতি সুন্দর নগরী; গ্রীকরা যাকে বলত সবচেয়ে সুন্দর, আরবরা বলত পৃথিবীর বাগান, পৃথিবীর মনে, সালাহ্ উদ্দীনের হাতে পড়ে তার জাঁকজমক ঐশ্বর্য আরও বেড়ে চলল।

১১৮৫ সালে সালাহ্ উদ্দীন দেখলেন মসুলে জংগীর বংশধর তখনও রাজত্ব করছে। যতদিন না জংগীর বংশধরা নিশ্চিহ্ন হয় ততদিন পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই। তিনি মোসিল আক্রমণ করলেন। সালাহ্ উদ্দীনের বিরাট শক্তির কাছে মোসিল রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ সময় সালাহ্ উদ্দীন ভীষণ পীড়িত হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেও তার প্রাণের আশা ছেড়ে দেন। ফলে মোসিলের ইজজেদদিনের সাথে তাঁর সন্ধি স্থাপিত হলো। রণক্লান্ত সালাহ্ উদ্দীন দামেশকে ফিরে এলেন।

চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছিল। বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি এখন সালাহ্ উদ্দীন। তাইগ্রীস এবং ফোরাতের তীরে তাঁর অভিযান এখন সফল হয়েছে। মুসলিম জাহানের সকলেই এখন তাঁর বন্ধুত্বের প্রয়াসী। যে মহাপরিকল্পনা এতদিন সালাহ্ উদ্দীনের প্রতিটি কাজকে পরিচালিত করে এসেছে, এখন সালাহ্ উদ্দীন বুঝলেন তাঁর সময় এসেছে। সিরিয়া, মিসর, মেসোপটেমিয়া থেকে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ শুরু হলো। জংগীর বংশধররা মসুল, সিঞ্জার, জেজিরা, ইরবিল হারান থেকে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে লাগল। তাইগ্রীসের অপর পার কুর্দ থেকেও সৈন্য আসতে লাগল। এতদিন ইচ্ছা সত্ত্বেও সালাহ্ উদ্দীন জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য অভিযান করতে সাহসী হননি। কিন্তু এবারে সমস্ত মুসলিম জাহান তাঁর পেছনে দাঁড়াল। সমস্তু মুসলিমজাহানে জিহাদের কথা ঘোষণা করা হলো।

প্যালেস্টাইনের কারাক অঞ্চলের খৃস্টান অধিপতি ছিলেন চ্যাটিলিওনের রেজিনাল্ড। সন্ধি শর্ত ভাঙতে খৃস্টানদের জুড়ি সে যুগে কেউ ছিল না। আর এই রেজিনাল্ড আবার তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা। তিনি বারবার হজ্জযাত্রীদের

আক্রমণ করেছেন, নিরীহ ব্যবসায়ীদের সবকিছু লুটেছেন। ১১৮৬ সালেও যখন সন্ধি শর্ত বহাল ছিল তখনও তিনি তাই করলেন।

তিনি সন্ধির শর্ত আগেও ভেঙেছেন। কিন্তু এবারে যে যাত্রীদের তিনি লুটতরাজ করলেন তাঁদের সাথে ছিলেন স্বয়ং সুলতানের বোন। যাত্রীরা যখন অসহায়ের মত অনুনয় বিনয় করছিল তখন রেজিনাল্ড যাত্রীদের এক মোল্লাকে বিদ্রূপ করে বললো, 'কই, তোমাদের মোহাম্মদ কই? তাকে আসতে বল না তোমাদের সাহায্য করতে।'

সালাহ্ উদ্দীনের কানে এ কথা পৌঁছলে তিনি রাগে আগুন হয়ে উঠলেন। তখণি তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলেন যে, নিজের হাতে রেজিনাল্ডের গলা কেটে তবেই তার শাস্তি। দিকে দিকে দূত গেল জিহাদের আহ্বান জানিয়ে। খৃস্টানের দর্প এবং আস্পর্ধা একেবারে চূর্ণ করবার জন্য এবার সালাহ্ উদ্দীন প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলেন। খৃস্টানরাও তখন আর বসে রইলো না। ইউরোপ থেকে দলে দলে সৈন্য সেনাপতি আসা শুরু করল।

সালাহ্ উদ্দীন বার হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য এবং অগণিত জিহাদ সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। খৃস্টানরাও বারশত বীর 'নাইট, আঠার হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল। সালাহ্ উদ্দীন নিজের সৈন্যদের বামভাগ, ডানভাগ, মধ্যভাগ, তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। ডানভাগ এবং বামভাগের ভার থাকল বীর সেনাপতি তাকিউদ্দিন এবং কুকবেরির ওপর। আর মধ্যভাগ থাকল তাঁর নিজের হাতে। ১১৮৭ সালের ২৬ জুন, শুক্রবার। গালিলি হ্রদের দক্ষিণ পাশে উখুয়ানা নামে এক জায়গায় মুসলমান বাহিনী প্রথম রাতে তাদের ছাউনি গাড়ল। এদিকে গুপ্তচররা সালাহ্ উদ্দীনের কাছে বিভিন্ন খবর আনতে লাগল। তারা খবর আনল খৃস্টান সৈন্যরা সফুরিয়া নামে এক জায়গায় এসে পড়েছে। মুসলমানদের সাথে জিহাদে লড়তে তারাও ভয় পাচ্ছে না।

সালাহ্ উদ্দীন সব শুনে সেনাপতিদের আহ্বান করে জরুরি আলোচনা করলেন। ঠিক করা হলো যে, মূল সেনাবাহিনী জর্দান অতিক্রম করে সিনবেরা নামক জায়গায় অপেক্ষা করবে। এদিকে সালাহ্ উদ্দীন তার সেনাদের নিয়ে কাফার সেবতের পাহাড়ের কাছে চলে যাবেন। সেখান থেকে তিবেরিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে মাত্র ছ'মাইল দূরে। ফ্রাঙ্ক খৃস্টানদের জন্য একদিকে যেমন তারা অপেক্ষা করতে লাগল অন্যদিকে মুসলিম বাহিনী তিবেরিয়া শহরে আগুন লাগিয়ে দিল। কিন্তু কাউন্ট রেমাণ্ডের স্ত্রী স্বামীর দুর্গ মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে লাগলেন। খৃস্টানরা এ খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগল। সালাহ্ উদ্দীন

এ খবর পেয়ে দুর্গ অবরোধের জন্য সামান্য কিছু সৈন্য রেখে মূলবাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে খৃস্টান বাহিনীর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সালাহ্ উদ্দীন এমনভাবে তার সৈন্য সমাবেশ করলেন যে, সমস্ত জলাশয়, প্রস্রবণা এসব তার এলাকার মধ্যে থাকলো। খৃস্টান বাহিনী যদি মুসলমানদের আক্রমণ করে তাহলে তাদের জলহীন প্রান্তর অতিক্রম করে আক্রমণ করতে হবে।

খৃস্টানা তাই করল। তারাই প্রথম আক্রমণ শুরু করে এগুতে লাগল। আক্রমণ করার বিপদ খৃস্টান সেনাপতিদের অন্তত একজন বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি হলেন কাউন্ট রেমণ্ড। কিন্তু কাউন্ট রেমণ্ডের সাথে সালাহ্ উদ্দীনের বন্ধুত্ব ছিল বলে খৃস্টান রাজা বা কেউ তার কথায় কান দিল না। রেমণ্ড হতাশ হয়ে শুধু বললেন, আমরা যদি ওভাবে আক্রমণ করি তাহলে মারা পড়ব।

খৃস্টানরা তিবেরিয়ার দিকে তবু অগ্রসর হতে লাগল কিন্তু তখন তখনই মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের উত্ত্যক্ত করতে শুরু করল। মরুভূমির তপ্ত রোদে তখন পৃথিবী আগুনের মত জ্বলছে। এদিকে কোথাও ছায়া নেই। কোথাও পানি নেই। সমস্ত খৃস্টান বাহিনীর মধ্যে একটু পরই নিদারুণ পানির অভাব দেখা দিল। তিবেরিয়া তখনও বহু দূরে। খৃস্টান বাহিনী বাধ্য হয়ে রাতের জন্য ছাউনি গাড়ল। কিন্তু এর মধ্যেই ক্লান্ত পিপাসার্ত সেনাবাহিনীর মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার সকল ইচ্ছা লোপ পেয়েছে। সারা রাত শুধু খৃস্টান তাঁবুতে এক ফোঁটা পানির জন্য কাতরানি শুরু হলো। মানুষ, ঘোড়া সব পিপাসায় ছটফট করতে লাগল। আশেপাশেই রাতের গভীরে শোনা যাচ্ছিল জাগ্রত মুসলিম সেনাদের কথাবার্তা। আর সজোরে ঘোষণা– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। খৃস্টানদের কষ্টের আর সীমা রইল না–যখন মুসলিম সেনারা ধূসর প্রান্তরে ঝোপ-ঝাড়ে আগুন লাগিয়ে দিল।

পরদিন সকাল হলো। ৪ঠা জুলাই। খৃস্টান অশ্বারোহী সেনারা খুব সকালেই তৈরি হয়ে নিল, কিন্তু পদাতিক বাহিনী পিপাসায় এত কাতর হয়ে পড়েছিল যে, তারা একটুও নড়তে চাইল না। অন্যদিকে মুসলিম বাহিনীর সকল সৈন্য সারারাত বিশ্রামের পর নতুন উদ্যমে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সারারাত সালাহ্ উদ্দীন সেনাবাহিনীর তদারক করেছেন। কাকে কোথায় থাকতে হবে ঠিক করে দিয়েছেন। প্রত্যেক অশ্বারোহীর তূণ তীরে ভর্তি করা হলো। সত্তরটি উট অসংখ্য তীর নিয়ে প্রস্তুত রইলো। আর তারও পেছনে থাকলো আরও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। খৃস্টানদের অবস্থা বুঝতে পেরে মুসলমানদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত দুই বিরোধী বাহিনী হিটটিন থেকে কয় মাইল পশ্চিমে লুবিয়া গ্রামের কাছে পরস্পরের সম্মুখীন হলো। খৃস্টান বাহিনী এর মধ্যে কয়বার জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য মধ্য আকাশে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান বাহিনী অপেক্ষা করে রইলো। তারপর মধ্যাহ্নের আগুনঝরা রোদে পিপাসার্ত খৃস্টান বাহিনীর উপর মুসলিম বাহিনী দুর্দম বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসলমান অশ্বারোহীদের তীরে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। একদিকে তপ্ত বালু, কড়া রোদ, শুষ্ক ঠোঁট—অন্যদিকে আগুনের ধোঁয়া আর ঝাঁক ঝাঁক তীর খৃস্টান বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। অশ্বারোহী খৃস্টান বাহিনীর সহস্র অনুরোধেও পদাতিক সেনার দল আর যুদ্ধ করতে এগুলো না। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে খৃস্টান বাহিনী একেবারে বিধ্বস্ত হতে লাগল। খৃস্টান বাহিনীর বহু সৈন্যই অস্ত্র ছেড়ে মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পিপাসায় জিহ্বা বের করে হাঁপাতে লাগল। রেমণ্ডের সাতজন নাইট সালাহ্ উদ্দীনকে গিয়ে বলল, 'হুযুর, আর দেরি করছেন কেন? ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওদের আর কোন শক্তি নেই।'

শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী জেরুজালেমের রাজার তাঁবু ঘিরে ফেলল। তখন খৃস্টানদের সবচেয়ে সেরা নাইটগণ রাজাকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করতে লাগল। কিন্তু মুসলিম বাহিনী তখন একটা গ্লোব যেন তার মেরুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তেমনই রাজার তাঁবুর চারধারে ঘুরতে লাগল। যুদ্ধশেষে দেখা গেল খৃস্টান রাজা নিজে, তার ভাই, চ্যাটিলনের রেজিনাল্ড হানফ্রে অব টরন প্রমুখ বহু নামকরা সম্ভ্রান্ত খৃস্টান বন্দি হয়েছে। আর সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র খৃস্টানদের মৃতদেহে ভরাট হয়ে আছে।

সালাহ উদ্দীন যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর তাঁবু গাড়লেন। তাঁর নিজের তাঁবুতেই খৃস্টান রাজা এবং চ্যাটিলনের রেজিনাল্ডকে নিয়ে আসা হলো। সালাহ্ উদ্দীন খৃস্টান রাজাকে তৃষ্ণার্ত দেখে তিনি নিজে বরফ দেয়া পানি পান করতে দিলেন। তারপর সালাহ্ উদ্দীন দণ্ডায়মান রেজিনাল্ডের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রেজিনাল্ডের তখন সব কথা মনে পড়ল। কিন্তু ভয়ে একটু কাঁপবারও সুযোগ তিনি পেলেন না। সালাহ্ উদ্দীন বলেন, 'দু'বার তোকে মারব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। একবার যখন তুই পবিত্র কাবাকে অপমান করতে উদ্যত হয়েছিস আর দ্বিতীয়বার যখন আমার বোনের পর্যটক বাহিনীকে তুই লুটতরাজ থেকে রেহাই দিসনি। আল্লাহকে লাখো শোকর আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলুম।" এক তীক্ষ্ণ আঘাতে সালাহ্ উদ্দীন রেজিনাল্ডের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন।

রাজা ভাবলেন, এবার বুঝি তার পালা। তিনি ভয়ে কাঁপা শুরু করলেন। কিন্তু সালাহ্ উদ্দীন তাঁকে অভয় দিলেন। বললেন, রাজা হয়ে আমি রাজাকে হত্যা করি না। মাত্র কয়জন অনুচরসহ পরাস্ত অপমানিত রাজাকে সালাহ্ উদ্দীন দামেশকে পাঠালেন। আর দুইশ খৃস্টান নাইটের প্রাণদণ্ড দেয়া হলো।

এরপর মুসলিম বাহিনী অপ্রতিহত গতিতে প্যালেস্টাইন অধিকার করল। হিটটিনের যুদ্ধে জয়লাভের পর একে এক তিবেরিয়া আকরে আসকালন প্রভৃতি দখল করলেন। শেষ পর্যন্ত পবিত্র ভূমি জেরুজালেম নগরী অবরোধ করলেন। এই সময় প্রতি ক্ষেত্রে সালাহ্ উদ্দীন যে মহানুভবতা এবং উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তার সীমা নেই।

খৃস্টান রাজার একজন সম্ভ্রান্ত নাইট ছিলেন ইবলেনের বালিয়ান। তিনি হিটটিনের যুদ্ধে পালাতে পেরেছিলেন। তিনি সালাহ্ উদ্দীনের কাছে অনুমতি চাইলেন যে, তাকে যেন জেরুজালেমে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। তিনি শুধু তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়েই আবার জেরুজালেম ত্যাগ করবেন। সালাহ্ উদ্দীন তাতে রাযী হলেন। শুধুমাত্র একটি শর্ত থাকল যে, বালিয়ান জেরুজালেমে গিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারবেন না। বালিয়ান যখন জেরুজালেমে পৌছলেন, তখন কিন্তু ব্যাপার ঘটল অন্যরকম। জেরুজালেমের ধর্মযাজক তাকে বোঝাল যে, মুসলমানদের সাথে খৃস্টানরা যদি কোন চুক্তি করে তা ভাঙতে কোন পাপ নেই। তবু বালিয়ান কথা ভাঙতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু যখন জেরুজালেমের সব খৃস্টান তার পেছনে কাতার বাঁধল তখন তিনি নেতৃত্ব নিয়ে মুসলমানদের আক্রমণকে রুখতে লাগলেন।

কিন্তু কদিনেই বুঝলেন মুসলিম সেনাদের আক্রমণ রোধ করা সম্ভব নয়। তখন খৃস্টানরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। আগেকার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলেও সালাহ্ উদ্দীন বালিয়ানকে কোন শাস্তি তো দিলেনই না বরং বালিয়ানের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিরাপদে পৌছে দেবার জন্য অশ্বারোহী পঞ্চাশজন সৈন্য দিলেন। ইচ্ছা করলে খৃস্টানরা জেরুজালেমে থাকতে পারবে। তবে প্রত্যেক খৃস্টানের মুক্তিপণ ঠিক করা হলো দশটি স্বর্ণমুদ্রা। এ সময়ে সালাহ্ উদ্দীন এবং তাঁর বাহিনী শত্রু সেনাদের প্রতি যে ব্যবহার করেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাই।

বহু গরীব খৃস্টান মুক্তিপণ দিতে পারছিল না। তখন বীর সেনাপতি আদিল সুলতান সালাহ্ উদ্দীনকে সালাম করে দাঁড়ালেন। সুলতান তার দিকে উৎসুক হয়ে তাকালেন।

আদিল বললেন, সুলতানের কাছে আমার একটি আরজ আছে। সুলতানের ভাই হিসেবে নয়, জিহাদে ইসলামের জন্য লড়েছি। সেই দাবিতে।

সুলতান বললেন, বেশ তো কী আরজ তোমার। আদিল জবাব দিলেন, আমার এক হাজার গোলাম চাই। সালাহ্ উদ্দীন নিজেকে দমন করলেন। কারণ কথার খেলাফ কখনো তিনি করেন না। আদিল এক হাজার খৃস্টান বন্দি পেলেন। আর পেয়েই সালাহ্ উদ্দীনের মুখ গৌরবে দীপ্ত হয়ে উঠল। যখন দেখলেন আদিল সেই এক হাজার খৃস্টানকেই তখন মুক্ত করে দিলেন।

এই সময় খৃস্টান ধর্মযাজকের ব্যবহারে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণও লজ্জা পেয়েছেন। ধর্মযাজক খৃস্টান উপাসনালয়ের সমস্ত সম্পদ একই নিয়ে দেশ ত্যাগ করল। নিজের মুক্তিপণ সেও দিল ঠিক দশটি স্বর্ণমুদ্রা। সংগে নিয়ে চললো অজস্র সোনাদানা, যেগুলো তার উচিত ছিল অগণিত খৃস্টানের মুক্তিপণে খরচ করা। সালাহ্ উদ্দীন সবই দেখলেন, বুঝলেন। কিন্তু যাজককে তিনি বাধা তো দিলেনই না, বরং সালাহ্ উদ্দীনের মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে সে এবং বালিয়ান যখন এক হাজার খৃস্টানের বিনাপণে মুক্তি চাইলো, তাও তিনি মঞ্জুর করলেন। জেরুজালেমে ঘোষণা করা হলো যে, কোন খৃস্টানের শরীরে বা সম্পত্তিতে কোন মুসলমান হাতে দেবে না। সালাহ্ উদ্দীন বুড়ো অথর্ব খৃস্টানদের বিনা পণে মুক্তি দিলেন। অসংখ্য খৃস্টান নারী-বৃদ্ধা-কুমারী তার কাছে এল কাঁদতে কাঁদতে কৃতজ্ঞতা জানাতে। সালাহ্ উদ্দীন তাদের স্বামী, ভাই যারা মুসলমানদের হাতে যুদ্ধে বন্দি হয়েছিল তাদের সবাইকে মুক্তি দিলেন।

এ মহানুভবতা যে কত বড় তা বোঝা যাবে প্রথম ক্রুসেডের কথা মনে করলে। তখন খৃস্টানরাই জয়ী আর মুসলমানরা বিজিত। বুড়ো-যুবা-শিশু জেরুজালেমের কোন মুসলমানই সেদিন (১০৯৯ সাল) খৃস্টান তরবারির কাছ থেকে রেহাই পায়নি। মুসলমানদের রক্তে জেরুজালেম সেদিন লালে লাল হয়েছিল। সেদিন আর এদিন...

জেরুজালেমের পতনের খবর যখন ইউরোপে গেল, তখন সমস্ত ইউরোপে প্রথমে হতাশার ভাব প্রকাশ পেল। কিন্তু তার পরই ইউরোপের সকল খৃস্টান রাজাই নিজেদের কলহ-বিবাদ আপাতত ভুলে জেরুজালেম বিধর্মী মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য বদ্ধপরিকর হলো। জার্মানীর সম্রাট, ইংলণ্ডের রাজা এবং ফ্রান্সের রাজা সকলেই খৃস্ট ধর্মের মান রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করলেন। পশ্চিম ইউরোপের তিনজন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজার 'ক্রুসেডে' যোগদান থেকেই শুরু হলো খৃস্টান ইতিহাসের তৃতীয় ক্রুসেড।

জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক সর্বপ্রথম এশিয়ার দিকে স্থলপথে রওয়ানা হলেন। কিন্তু একটি নদী অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি পানিতে ডুবে মারা যান এবং তার সাথেই জার্মান বাহিনীর অভিযানও সেখানেই শেষ হয়। তারা অধিকাংশই দেশে ফিরে যায়। এরপর ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড তার বিরাট বাহিনী নিয়ে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য যাত্রা করলেন। এই রিচার্ডই ইতিহাসে সিংহ হৃদয় রিচার্ড বলে পরিচিত। যাত্রাপথে রিচার্ড সাইপ্রাস জয় করেন। এই সাইপ্রাসই পরে মূল ভূখণ্ড থেকে বিতারিত খৃস্টান যোদ্ধাদের প্রধান আশ্রয়স্থল হয়েছিল।

ইতিমধ্যে জেরুজালেমের রাজা গইকে সালাহ্ উদ্দীন মুক্তি দিয়েছেন এই শর্তে যে, তিনি আর কোনদিন সালাহ্ উদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না। কিন্তু সালাহ উদ্দীনের বারবার মহানুভবতা প্রদর্শনের প্রতিদানে খৃস্টানরা কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাই রাজা গই এবং আরও বহু খৃস্টান সেনাপতি এবং সৈন্য যাদের তিনি মুক্তি দিয়েছেন তারা সকলে আবার টায়ারে গিয়ে একত্রিত হতে লাগল। টায়ার বন্দরকে তারা পুরু দেয়াল, পরিখা প্রভৃতি দ্বারা খুবই সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য করে তুলল। আবার ইউরোপ থেকে দলে দলে খৃস্টান সেনা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জমায়েত হতে লাগল। সালাহ্ উদ্দীন তা টায়ারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং পরিখা অতিক্রম করতে পারল না। মুসলিম নৌ-সেনাও নৌ-অবরোধ করতে গিয়ে সুবিধা করতে পারল না। কিছুদিন অবরোধের পরই মুসলিম বাহিনীতে ক্লান্তি দেখা দিল। দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে করে তারা সত্যই গৃহকাতর হয়ে পড়েছিল। সালাহ্ উদ্দীন বাধ্য হয়ে অবরোধ তুলবার হুকুম দিলেন। আর তার ফলেই ক্রুসেডের ইতিহাসে মুসলমানরা সবচেয়ে বড় ভুল করল। কারণ এ থেকে টায়ারেই বাধাহীন খৃস্টানরা শক্তি সঞ্চয় করে তাদের তৃতীয় ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ঐতিহাসিক লেনপুল সেজন্যে বলেছেন যে, সালাহ্ উদ্দীনের মহানুভবতাই প্রকৃতপক্ষে খৃস্টানদের বারবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের সুযোগ দিয়েছে।

রাজা গই শুধু শক্তি সঞ্চয় করেই ক্ষান্ত থাকলেন না। হিত্তিনের যুদ্ধের কথা একদম ভুলে গিয়ে আকরে বা আক্কা আক্রমণ করলেন। কিন্তু মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে খৃস্টান বাহিনী নিদারুণ পরাজয় বরণ করে সালাহ উদ্দীন খৃস্টানদের একেবারেই ধ্বংস করতে যদি তখনই অগ্রসর হতেন, তাহলে ভূমধ্যসাগরের ওপার থেকে খৃস্টানদের শুধু দীর্ঘশ্বাসই ফেলতে হতো। কিন্তু রণক্লান্ত সেনাপতি ও সৈন্যরা তখন বিশ্রামের জন্য অধীর। খৃস্টানরা যখন

মুসলমানদের আক্রমণের জন্য কঠোরভাবে তৈরি হতে লাগল মুসলমান বাহিনী তখন বিশ্রাম ও আয়েশের জন্য ব্যাকুল...

রাজা গইয়ের বাহিনী আকরে দখল করতে গিয়ে একবার বিধ্বস্ত হলেও খৃস্টানরা আবার নতুন উদ্যমে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগল। তারা বুঝলো তাদের পুরান রাজ্য ফিরিয়ে পেতে হলে প্রথমে আকরে বা আক্কা তাদের প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ তার বাহিনী এবং প্রচুর নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে পড়েছেন। খৃস্টান বাহিনী আকরে অবরোধ করে তার পরিখা এবং প্রাচীর ভেদ করবার চেষ্টা করতে লাগল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ডও তার দলবল নিয়ে এসে খৃস্টান বাহিনীর শক্তি বাড়ালেন। আকরের তুর্কী সৈন্যরা বীরবিক্রমে আকরে রক্ষা করে চলতে লাগল মাসের পর মাস। রিচার্ড ও ফিলিপ দুর্গ প্রাকার এবং পরিখা অতিক্রম করার জন্য বহু নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি এনেছিলেন। কিন্তু তবুও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আকরে আত্মরক্ষা করতে লাগল। বাইরে থেকে সালাহ্ উদ্দীন তার সৈন্য দল নিয়ে খৃস্টানদের উত্ত্যক্ত করতে লাগলেন। তবে এভাবে খৃস্টান বাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। তাই পরিখাবৃত খৃস্টান বাহিনীকেও সালাহ্ উদ্দীন পর্যুদস্ত করতে পারলেন না। এদিকে মুসলিম রণতরীগুলোও সমুদ্র পথে খৃস্টানদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করতে গিয়ে ধ্বংস হলো।

আকরে দুর্গ প্রাকারে ফাটল দেখা দিল। আকরের তুর্কী সেনাপতি এবং আমীররা ভয় পেয়ে গেল। কেউ কেউ শহর থেকে পালাল। আর এদিকে সালাহ্ উদ্দীনও প্রচুর সৈন্য বাইরে থেকে আনতে লাগলেন। কিন্তু কিছুই হলো না। দুর্গ প্রকার যখন ভেঙে পড়ল শেষ পর্যন্ত আকরের তুর্কী আমীররা সালাহ্ উদ্দীনকে না জানিয়ে খৃস্টানদের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

সালাহ্ উদ্দীন অবশ্য বুঝেছিলেন যে, আকরে আর বেশিদিন রক্ষা করা যাবে না। তার সেনাবাহিনীও যুদ্ধ করতে চাইছিল না। এমন কি ইসলামের জন্যও। তবু এই সন্ধির কথা যখন শুনলেন তখন তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন। তার ইচ্ছা ছিল জেরুজালেমের ভূতপূর্ব রাজা গইকে ভাল করে শায়েস্তা করবেন। কিন্তু বারংবার ব্যর্থতায় এবার সে আশা তিনি ছাড়লেন। খৃস্টানদের সাথে সন্ধির জন্য তিনি তৈরি হলেন।

আকরে যে সব শর্তে সমর্থন করেছিল তার একটি ছিল মুসলিম বাহিনীকে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণ দিতে হবে। এক মাসের মধ্যে যখন মুক্তিপণ পৌছল না তখন রিচার্ড সাতাশ শো' বন্দিকে হত্যা করেন। অথচ তার মাত্র কয় বছর

আগেই জেরুজালেমে মুসলিম সুলতান কী উদারতারই না পরিচয় দিয়েছিলেন। খৃস্টান ঐতিহাসিকরাও তাই ঠিকই বলেছেন যে, খৃস্টান-মুসলমানদের এই সংগ্রামে সভ্যতা, মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা, সত্যিকারের বীরত্ব এবং ভদ্রতা ও ভব্যতা শুধুমাত্র মুসলমানদেরই একচেটিয়া ছিল।

এরপরই রিচার্ড উপকূল ধরে জেরুজালেমের পথে আসকালন হয়ে বাহিনী পরিচালনা করলেন। খৃস্টানদের তিন লক্ষ বাহিনীর সৈন্যদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। সালাহ উদ্দীনও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু আরসুফের যুদ্ধে ভীষণ বীরত্ব প্রদর্শন করেও মুসলিম বাহিনী পরাস্ত হলো। এই যুদ্ধই প্যালেস্টাইনে রিচার্ডের সবচেয়ে বড় কীর্তি। সালাহ উদ্দীন তবু দমলেন না। তিনি খৃস্টান বাহিনীকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করলেন। খৃস্টানরা মুসলমানদের সাথে বারবার সামনাসামনি যুদ্ধ করা সমীচীন মনে করল না। তারা আর যুদ্ধ না করে যাফফা বন্দরে আশ্রয় নিল। সালাহ্ উদ্দীন তখন তার বাহিনী নিয়ে রামলায় প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন...

খৃস্টানরা যাফ্ফায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। যাফ্ফার স্নিগ্ধ বাতাসে কিছুদিন আরাম নেবার পরই ক্রুসেডাররা যেন জেরুজালেমের কথা ভুলে গেল। আসল কথা, সালাহ্ উদ্দীনের মুসলিম সেনাদের মত খৃস্টান সৈন্যরাও অনবরত যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই সন্ধির কথাবার্তা যেমন চলতে লাগল, তেমনি ধীরে-সুস্থে যুদ্ধের আয়োজনও চলতে লাগল। মাঝে মাঝে মুসলিম-খৃস্টান বাহিনীতে ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধও যে না হলো তা নয়।

রিচার্ড চিরদিন অ্যাডভেঞ্চার আর রোমাঞ্চকর ঘটনা পছন্দ করেন। তিনি মাঝে গুটিতিনেক মাত্র সৈন্য নিয়ে সীমান্ত অঞ্চলে বেড়াতে বের হতেন। একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় সালাহ উদ্দীনের পাহারাদার সৈন্যরা তাঁকে প্রায় বন্দিই করে ফেলেছিল। কিন্তু তার সহচর উইরিয়ামের উপস্থিত বুদ্ধিই তাকে বাঁচাল। তিনি আরবীতে মুসলিম সৈন্যদের বললেন যে, তিনিই স্বয়ং রিচার্ড। মুসলিম রক্ষীরা তখন তাকেই ইংলণ্ডের রাজা বলে ভেবে বন্দি করে নিয়ে গেল।

সে যাই হোক, খৃস্টান বাহিনীর তরফ থেকে প্রকৃত যুদ্ধ করার কোন আগ্রহই প্রকাশ পেল না। যদিও যাফ্ফায় যুদ্ধের আয়োজন তারা করেই চলতে লাগল। এর একটা কারণ, তখন সন্ধির কথাবার্তা চলছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ, যদিও সম্প্রতি সালাহ্ উদ্দীন আসরুফের যুদ্ধে কিংবা আকরে অবরোধের সময় সফল হতে পারেননি তবুও তার শক্তি মোটেই কমেনি; বরং এ ঘটনাগুলোতে

সালাহ্ উদ্দীন নিজের বাহিনী আরও শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তার নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে সালাহ্ উদ্দীন আসকালনের মত সুন্দর শহর পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে ফেললেন। যাতে করে খৃস্টান বাহিনী যুদ্ধের সময় আসকালনের দুর্গকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে। এ সব ঘটনায় খৃস্টানরা বুঝলো জেরুজালেমের প্রশ্নে মুসলমানরা একেবারে সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

আস্‌রুফের যুদ্ধে কদিন পরই যুদ্ধ বিরতির জন্য রাজা রিচার্ড সালাহ্ উদ্দীনের কাছে দূত পাঠালেন। সালাহ্ উদ্দীন তখন আসকালন নিয়ে ব্যস্ত। এ সব ব্যাপারে তার ভাই আদিলকে সব ক্ষমতা দেয়া ছিল। সুলতান নিজেও শান্তির জন্য ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে আদিল সালাহ্ উদ্দীনের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখতেন। তিনি খুব ধীরে-সুস্থে এগুতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নতুন এক ঘটনার ফলে মুসলমানদের এই কূটনীতির লড়াইয়ে অনেক সুবিধা হলো। টায়ারের অধিপতি কনরাডের সঙ্গে রিচার্ড বা গইয়ের সদ্ভাব ছিল না। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, তিনি সালাহ্ উদ্দীনের মিত্র হতে চান এবং ক্রুসেড বাহিনী ত্যাগ করতে এবং আকরে উদ্ধারে মুসলমানদের সাহায্য করতেও রাজি আছেন যদি সিডন এবং বায়রুত তাঁকে দেয়া হয়। একই দিনে রিচার্ডের দূতও সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এল। আদিল এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি রাজা রিচার্ডের বিরুদ্ধে কনরাডকে লেলিয়ে দিয়ে খেলা দেখতে লাগলেন। রিচার্ড তা' টের পেয়ে আদিলকে 'আমার সত্যিকারের বন্ধু এবং ভাই' বলে সম্বোধন করে আর যুদ্ধ না করার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি লিখলেন, দুই বিরোধী বাহিনীই ক্লান্ত। ধন-সম্পত্তি শহর-নগর আর অজস্র মানুষ ধ্বংস করে কী লাভ। একমাত্র প্রশ্ন হলো পবিত্র নগরী জেরুজালেম, পবিত্র ক্রুশ এবং প্যালেস্টাইন ভূমি। খৃস্টানদের শরীরে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে জেরুজালেম উদ্ধারের চেষ্টা তারা করবেই। আর প্যালেস্টাইনের সবটুকু খৃস্টানরা চায় না, তারা শুধু জর্দান নদী পর্যন্ত অংশটুকু চায়। পবিত্র ক্রুশ মুসলমানদের চোখে কাঠের টুকরো মাত্র, কিন্তু খৃস্টানদের কাছে তার দামের সীমা নেই। এ তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা হলেই তো শান্তি হতে পারে।

চতুর রিচার্ডের চিঠিতে সালাহ্ উদ্দীন হাসলেন। তিনি জানালেন, জেরুজালেম খৃস্টানদের কাছে যেমন পবিত্র, তেমনিই পবিত্র মুসলমানদের কাছে। কারণ এখানেই মহানবীর মহাযাত্রার দৃশ্যস্থল, আর এখানেই শেষ দিনে সব মুসলিম একত্রিত হবে। জেরুজালেমের প্রশ্নে তাই কোন আপস নেই। আর

প্যালেস্টাইন চিরদিনই মুসলমানদের ছিল। খৃস্টানরা শুধু রাজ্য জয় করছিল মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মুসলমানরা লড়বে যাতে খৃস্টানরা জেরুজালেম না নিতে পারে। পবিত্র ক্রুশ দিয়ে মুসলমানদের কোন দরকার নেই। কিন্তু যতদিন না মুসলমানদের যথার্থ কোন ওয়াদা খৃস্টানরা না দেয় ততদিন সেটা মুসলমানদের কাছেই থাকবে।

এরপরই এক মজার ঘটনা ঘটল। রিচার্ড নতুন এক শান্তির প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন। প্রস্তাব অনুযায়ী সুলতানের ভাই আদিল রাজা রিচার্ডের বোন জোয়ানকে বিয়ে করবেন। বিয়ের যৌতুকস্বরূপ খৃস্টানরা নব দম্পতিকে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো (যেমন আকরে, যাফ্ফায় এবং আসকালন) দেবে। আর সুলতান নব-দম্পতিকে দেবেন প্যালেস্টাইনের বাকি অংশ। জেরুজালেমে দুই দম্পতি রাজ কাজ চালাবেন। পবিত্র ক্রুশ খৃস্টানদের ফিরিয়ে দিতে হবে। খৃস্টান যাজকদের জেরুজালেমে থাকার অনুমতি দিতে হবে এবং সকল বন্দি মুক্তি পাবে। এটা হলেই রিচার্ড দেশে ফিরবেন।

আদিলের কাছে এই নতুন প্রস্তাব খুব খারাপ মনে হলো না। যথাসময়ে এই প্রস্তাব সালাহ্ উদ্দীনের কাছে পেশ করা হলো। সালাহ্ উদ্দীন প্রস্তাবের শর্তাদির কথা শুনে তিনবার সজোরে 'না'ম' (হ্যাঁ) বললেন। তারপর আর কিছু বললেন না। পরে প্রকাশ পেল সালাহ্ উদ্দীন রিচার্ডের প্রস্তাবকে নেহাৎ একটা মোটা রসিকতা বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য বীর কেশরী রিচার্ডের পক্ষে অমন প্রস্তাব করা অসম্ভব ছিল না। তিনি তখন সত্যই শান্তির জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া মুসলিম এবং রিচার্ডের বন্ধুত্ব এ সময়ে খুব প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। সন্ধির শর্তাদি আলোচনার সময় রিচার্ড তার নিজের তাঁবুতে আদিলকে নিমন্ত্রণ করে মহা জাঁকজমকের সাথে এক ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন।

রিচার্ডের সাথে সাথে সালাহ্ উদ্দীনের কনরাডের দূতের সঙ্গেও আলোচনা চলছিল। কনরাড রাজা গইয়ের পরিবর্তে জেরুজালেমের রাজা হতে চাচ্ছিলেন। এজন্যই তার সালাহ্ উদ্দীনের সাহায্যের প্রয়োজন। সুলতান কনরাডের দূতকে যথেষ্ট আতিথেয়তা দেখালেন। কিন্তু সঠিক কিছু না বলে চুপ রইলেন। একেই সন্ধ্যায় রিচার্ডের দূতও রিচার্ডের আগের প্রস্তাবই আবার নিয়ে এল। তাঁকেও সালাহ্ উদ্দীন খুব আদর-যত্ন করলেন। তারপর গোপন মন্ত্রীসভা আহ্বান করে তার উপদেষ্টাদের সামনে দুই সন্ধির প্রস্তাবেই মেলে ধরলেন। তার আমীররা বললেন, সন্ধি যদি করতেই হয় তবে তা রিচার্ডের মত রাজার সংগে করাই ভাল। কারণ জেরুজালেমের ফ্রাঙ্ক খৃস্টানরা সন্ধির শর্ত কতদূর মেনে চলে সে

তাদের জানা আছে। কাজেই মন্ত্রীসভা রিচার্ডের প্রস্তাবেই গৃহীত হলো। জোয়ানের আপত্তিকে তারা বেশি আমল দিলেন না। কিন্তু রিচার্ড তার শেষের চিঠিতে আদিলকে লিখলেন যে, তার বোনকে মুসলমানের সাথে বিয়ে দেবার কথা শুনে খৃষ্টানরা তার ওপর রেগে গেছে। তবে এ ব্যাপারে তিনি খৃস্টান ধর্মজগতের গুরু পোপের অনুমতি নেবার চেষ্টা করবেন। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে রিচার্ডের অন্য কোন নিকট-আত্মীয়ার সাথে আদিলের বিয়ে চলতে পারে। এ প্রস্তাব মুসলমানরা প্রত্যাখ্যান করলেও সন্ধির প্রশ্নে আলোচনা চলতে থাকে। কিন্তু সঠিক কোন শর্তে আবদ্ধ হবার আগেই শীত এসে গেল এবং বর্ষা শুরু হলো। তখন সালাহ্ উদ্দীন তার সৈন্যদের নিয়ে জেরুজালেমে সরে এলেন। তারপর তার দূরবর্তী প্রদেশের সেনাসামন্তদের বাড়ি যাবার হুকুম দিলেন। এ খবর যথাসময়ে রিচার্ডের কানে গেল। তিনি ভাবলেন, মুসলিম সেনাদের অনেকেই যখন এখন ছুটিতে তখন এই সুযোগে জেরুজালেম দখলের চেষ্টা করা যেতে পারে। সালাহ্ উদ্দীন এই খবর জানতে পেরে মৃদু হাসলেন। রিচার্ড এ দেশের শীত আর বর্ষা কাকে বলে জানেন না। সালাহ্ উদ্দীন জানতেন শীতের সময় যখন বর্ষা নামে তখন এ অঞ্চলে রাস্তাঘাট একদম কাদায় ভর্তি হয়ে যায়। সেই কাদার মধ্য দিয়ে সৈন্য পরিচালনা করা রিচার্ডের জন্য নেহায়েত বোকমি হবে। রিচার্ড সেই বোকামিই করলেন। তিনি শীত, বর্ষা এবং কাদা উপেক্ষা করে রামলা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। কিন্তু এই সময় বর্ষা-কাদায় অনভ্যস্ত খৃস্টান বাহিনীকে সালাহ্ উদ্দীনের সৈন্যদল বারবার হামলা চালাতে লাগল। তবু খৃস্টান বাহিনী আরও সাত-আট মাইল এগিয়ে প্রায় জেরুজালেমের কাছে এসে পড়লো বেয়ত নুবা নামে এক জায়াগায়। এখানে সালাহ্ উদ্দীনের সেনাবাহিনীর কাছে রিচার্ড নিদারুণ পরাজয় বরণ করলেন।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ড থেকে খবর এলো যে, রাজার অনুপস্থিতিতে সেখানে অরাজকতা শুরু হয়েছে। এমন কি রিচার্ডের সিংহাসন নিয়েও ষড়যন্ত্র চলছে। তখন রিচার্ডকে বাধ্য হয়ে ঘোষণা করতে হলো যে, তিনি শিগ্রই দেশে ফিরবেন। শেষ পর্যন্ত সন্ধির সুমীমাংসার জন্য রিচার্ড "আমার ভাই" আদিলকে আমন্ত্রণ জানালেন। আদিল সালাহ্ উদ্দীনের সমস্ত নির্দেশ নিয়ে রিচার্ডের সাথে মিলিত হলেন। সন্ধি অনুযায়ী জেরুজালেমে খৃস্টানদেরও অধিকার থাকল। শেষ পর্যন্ত যদিও সন্ধিপত্রে চূড়ান্ত সম্মতি দেয়া হয়নি, তবুও এ সময়ে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব এবং বন্ধুত্ব সত্যই রোমাঞ্চকর। এই সময়ে রিচার্ড আদিলের ছেলেকে 'নাইট' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

এত বন্ধুত্বের পরও রিচার্ড হঠাৎ সালাহ্ উদ্দীনের রাজ্যে বিদ্রোহের খবর শুনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার অস্ত্রধারণ করলেন। দারুমের দুর্গ আক্রমণ করে নিরীহ মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করা হলো। তারপরই খৃস্টানরা আবার জেরুজালেমের পথে বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো। বৈরুতে নুবার কাছে এসে তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

মুসলিমরাও বসেছিল না। শীত কেটে যাবার পর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্যরা আবার ফিরতে লাগল। সালাহ্ উদ্দীন বুঝলেন এবার তার চরম পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হবে। সালাহ্ উদ্দীন নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন। জেরুজালেমের রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তুলতে লাগলেন। জেরুজালেমের চারপাশে যত পানির ব্যবস্থা ছিল তা সব শুকিয়ে ফেলা হলো যাতে শত্রুরা অবরোধ করতে এসে এক ফোঁটা পানিও না পায়। সালাহ্ উদ্দীনের উদ্বিগ্নতা দেখে তাঁর সেনাপতিরা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। শুক্রবারে সমস্ত মুসলমান এক সাথে নামাযে সমবেত হলো। সালাহ্ উদ্দীন আল্লাহর কাছে আকুল প্রার্থনায় কেঁদে ফেললেন। যে কোন মুহূর্তে শত্রুপক্ষ এখন জেরুজালেমে হানা দিতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে খৃস্টানদের ইংরেজ এবং ফরাসী সেনাপতিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। ইংরেজরা আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিল না। বিশেষত যার ধারেকাছে এক ফোঁটা পানি নেই। সেখানে আক্রমণ করা অসম্ভব, তারা বলল। শেষ পর্যন্ত খৃস্টান জেরুজালেমে আক্রমণ না করে পশ্চাদপসরণ করল। কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর দরবারে সালাহ্ উদ্দীন লুটিয়ে পড়লেন। অশ্রুতে মেঝে ভিজে উঠল।

খৃস্টান-মুসলমান উভয়পক্ষই রণক্লান্ত। তাই আবার সন্ধির কথা চলতে লাগল। রিচার্ড তাঁর বোনের ছেলে হেনরীকে সুলতানের দরবারে পাঠালেন শুভেচ্ছার প্রতীক হিসাবে। সালাহ্ উদ্দীনও হেনরীকে নিজের 'ছেলের মত' দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্যালেস্টাইনের উপকূল খৃস্টানদের থাকবে, পাহাড়গুলো মুসলমানদের হাতে থাকবে এবং মাঝখানের জায়গা সমানভাবে দু'পক্ষই পাবে–সালাহ্ উদ্দীন বললেন। আসকালনের রক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। কারণ এর মধ্যে রিচার্ড আবার আসকালনের দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেছিলেন। খৃস্টান পক্ষ থেকে একের পর এক দূত আসতে লাগল। কিন্তু সালাহ্ উদ্দীন অনড়। খৃস্টানরা আসকালনে ঘাঁটি স্থাপন করে পরবর্তীকালে যাতে আক্রমণের প্রস্তুতি না নিতে পারে সেজন্যই সালাহ্ উদ্দীন আসকালনের প্রশ্নে মনোভাব পরিবর্তন করলেন না। কিন্তু খৃস্টানরাও আসকালন ছাড়তে রাজি হলো না। পরে সন্ধির আলোচনা ভেঙে গেল।

রিচার্ড দেশে ফিরে যাবার আয়োজন শুরু করলেন। তাঁর দেশে যে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, তাতে তার পক্ষে আর আদৌ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যাবার সময় রিচার্ড বায়রুত দখল করতে চাইলেন। সালাহ্ উদ্দীন এ খবর শুনেই একদিনের মধ্যে জেরুজালেম ত্যাগ করে যাফ্ফায় অবরোধ এবং অধিকার করলেন। রিচার্ড এ খবর শুনে তার যুদ্ধজাহাজে করে যাফ্ফায় এসে পৌছলেন। সালাহ্ উদ্দীনের সৈন্যদলের বিশৃঙ্খলতার সুযোগে রিচার্ড যাফ্ফায় অধিকার করে মুসলমানদের আবার বিতাড়িত করলেন। মাত্র দু'দিনের মধ্যে যাফ্ফায় দু'বার হাত বদল হলো।

আবার সন্ধি আলোচনা শুরু হলো। কিন্তু এবারও আসকালনের প্রশ্নে আলোচনা ভেঙে গেল। নতুন যুদ্ধের দামামা না বাজতেই এবার রিচার্ড ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য খৃস্টান রাজাও রিচার্ডের ওপরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই রিচার্ড এবারে যে কোনভাবেই হোক সালাহ্ উদ্দীনের সাথে সন্ধি চুক্তি করে দেশে ফিরবার জন্য ব্যাকুল হলেন।

রিচার্ডের অসুস্থতার কথা শুনে সালাহ্ উদ্দীন তাকে প্রচুর ঠাণ্ডা ফল-মূল এবং বরফ পাঠালেন। এ সময়ে রিচার্ড আদিলকে জানালেন যে, বহু যুদ্ধ হয়েছে আর নয় এবারে আপনার ভাই সুলতানকে বুঝিয়ে শান্তি স্থাপন করুন। শেষ পর্যন্ত ১১৯২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তৃতীয় ক্রুসেডের অবসান হলো।

আকরে থেকে যাফ্ফায় পর্যন্ত যে সমস্ত উপকূলবর্তী শহর রিচার্ড জয় করেছেন তা রিচার্ডেরেই থাকল। আসকালন ধ্বংস করা হলো। মুসলিম এবং খৃস্টান দু'জাতিই এ-ওর দেশে বিনাবাধায় যাওয়া-আসা করতে পারবে। খৃস্টান পুণ্যার্থীরা জেরুজালেমে আসতে পারবে। রিচার্ডের দীর্ঘদিনের প্রবাসেরও এবার সমাপ্তি ঘটলো।

যাবার সময় রিচার্ড সালাহ্ উদ্দীনকে জানালেন যে, সন্ধি মেয়াদের তিন বছর শেষ হলেই তিনি আবার জেরুজালেম উদ্ধার করতে ফিরে আসছেন। সালাহ্ উদ্দীন যেন প্রস্তুত থাকেন। সালাহ্ উদ্দীন উত্তর দিলেন, যদি জেরুজালেম তাঁকে হারাতেই হয় তবে সেটা রিচার্ডের মত বীরের কাছেই তিনি হারাতে চান। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর এই-ই শেষ বিদায়।

শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের সংগ্রামের শেষ হলো। হিটটিনের যুদ্ধের আগে প্যালেস্টাইনের এক ইঞ্চি অংশেও মুসলমানদের অধিকার ছিল না। আর আজ উপকূলবর্তী সামান্য অংশ ছাড়া সমস্ত প্যালেস্টাইন মুসলমানদের। পোপের আহ্বানে সমস্ত ইউরোপ সাড়া দিয়েছিল। তাদের বিপুল শক্তি, বিশাল সাম্রাজ্য,

অজস্র সম্পদ, অগণিত জনবলকে বছরের পর বছর সালাহ্ উদ্দীন প্রতিহত করেছেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানে এক সম্রাট অপমৃত্যু বরণ করেছেন, রাজারা প্রত্যাবর্তন করেছেন, অসংখ্য সম্ভ্রান্ত বীর পবিত্র ভূমিতেই দেহ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু জেরুজালেম তবুও সালাহ্ উদ্দীনেরই রয়ে গেল। নামেমাত্র এক খৃস্টান রাজা তেল ফুরিয়ে যাওয়া প্রদীপের মত ধুকতে লাগল। এ সংগ্রামে সালাহ্ উদ্দীন নিজের শক্তির উপরেই আশ্বাস রেখেছেন। বাইরের কোন শক্তি তাকে সাহায্য করেনি। নেতৃত্বের প্রশ্নেও সালাহ উদ্দীনকে কেউ প্রভাবিত করেনি। মন্ত্রী পরিষদ তিনি আহ্বান করেছেন সত্য, কৃতী ভাইদের সাহায্য তিনি পেয়েছেন, বাহাউদ্দীনের মত বিচক্ষণ কর্মসচিবও তাঁর ছিল সত্য, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর নিজের মতই ছিল শেষ রায় এবং সে ক্ষেত্রে তিনি খুব কমই ভুল করেছেন। এত বড় কৃতিত্বের কোন সীমা নেই। তাঁর একমাত্র দুর্বলতা, যদি তা দুর্বলতা হয়, তাঁর মনের উদারতা, মহানুভবতা।

যুদ্ধ অবসানের পরই সালাহ্ উদ্দীনের রণক্লান্ত সৈন্য বাহিনীকে বিশ্রামের জন্য ছুটি দিলেন। তারপর খৃস্টান তীর্থযাত্রীরা যাতে নিরাপদে জেরুজালেমে তীর্থদর্শনে আসতে পারে তার সুব্যবস্থা করলেন। রিচার্ড চলে যাবার পর সালাহ্ উদ্দীন তাঁর সীমান্তের ঘাঁটিগুলো পরিদর্শন করে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করলেন।

এতদিন পর বোধ হয় বীর গাজী একটু বিশ্রামের অবকাশ পেলেন। তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত তার ছোট ছেলেদের নিয়ে প্রাসাদের সামনের উদ্যানে পায়চারী করতে। দামেশকের আশেপাশে ভাই আদিল এবং বড় ছেলেদের সাথে মাঝে মাঝে শিকারেও বের হতেন। একবার হজ্জে যাবার ইচ্ছেও তিনি প্রকাশ করলেন আর প্রকাশ করলেন মিসরে যেতে, যেখান থেকে সৌভাগ্যের আলো প্রথম তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু গৃহকোণের শান্তি ছেড়ে তিনি কোথাও বের হলেন না।

১১৯৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কর্মসচিব বাহাউদ্দীনকে সাথে করে হজ্জ থেকে ফিরে আসা যাত্রীদের অভ্যর্থনা করার জন্য তিনি বের হলেন। আর সে রাতেই তার শরীরে জ্বর এল। পরের দিন ভোজসভায় তাঁর আসনে তাঁর ছেলেকে দেখে অনেকেরই চোখ ভিজে এল্। তাদের বুকটা যেন এক অমংগলের কল্পনায় কেঁপে উঠলো। প্রতিদিনই সুলতানের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। মাথার যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। নবম দিনে তিন ভুল বকা শুরু করলেন। আর কিছুই মুখে দিতে পারছিলেন না। প্রত্যেক রাতেই বাহাউদ্দীন সুলতানকে দেখতে যান আর চিকিৎসকের কাছে জিজ্ঞেস করেন–কেমন অবস্থা সুলতানের। তাদের বেরিয়ে আসতে হয় অশ্রু প্লাবিত মুখ নিয়ে। কিন্তু বের হবার আগেই আবার তা মুছে ফেলতে হয়। কারণ বাইরে অপেক্ষা করছে শঙ্কাকুল অগণিত মানুষ। তারা সবাই অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে বাহাউদ্দীন কি বলেন। দশম দিনে সুলতানের

অবস্থা কিছুটা ভাল মনে হলো। কিন্তু দ্বাদশ দিনেই রাতে বাহাউদ্দীনকে প্রাসাদে ডেকে পাঠান হলো। সুলতানের তখন ওপার থেকে ডাক এসেছে। ৫৫ বছর বয়সে ১১৯৩ সালের ৪ মার্চ বুধবার গাজী সালাহ্ উদ্দীন অমরতার পানে যাত্রা করলেন।

একই দিকে দামেশকের প্রাসাদ বাগানে তাঁকে সমাহিত করা হলো। যে তরবারি দিয়ে বীর গাজী জিহাদে লড়েছিলেন সেটাও তার পাশ দিয়ে দেয়া হলো। সমগ্র মুসলিম জাহানে নিজের বলে এক কপর্দকও ছিল না। তাঁর কবরের জন্য টাকা ধার নিতে হয়েছিল। কোন জাঁকজমকই হলো না তাঁকে সমাহিত করার জন্যে। সামান্য একটি চাদরে তাঁর কবর ঢেকে রাখা হলো। কোন কবিকে তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করার অনুমতিও দেয়া হলো না। পরম শান্তিতে, পরম নিভৃতে, পরাম বিশ্বাসে ইসলামের মহাবীর গাজী সালাহ্ উদ্দীন আরব্ধ কাজ শেষ করে মহাতৃপ্তিতে চিরদিনের মত ঘুমালেন।

সমস্ত দামেশকবাসী তখন শোকে অভিভূত। স্তব্ধ ছায়ার মত সকলে দাঁড়িয়ে রইল। মৃতদেহ যখন তাঁদের শেষবারের মত দেখান হলো তখন সকলে উচ্চঃস্বরে কাঁদছে।

এর দু'বছর পরে সালাহ্ উদ্দীনের এক ছেলে পরম মমতায় পিতৃদেহের অবশেষ উমাইয়া মসজিদের কাছে নিয়ে এসে নতুন করে সমাহিত করেন। সে স্থান তাই আজও সকলের পরম মমতার পরম আদরের পরম গৌরবের।

আইয়ুবীর মহানুভবতা

ইউরোপের খৃস্ট জগত যখন মসিহ (আঃ)-এর কবরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মিথ্যা অজুহাতে হিংস্রের মত মুসলিম বিশ্বের ওপর চড়াও হয় এবং ফিলিস্তীনের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে মুসলিম উম্মাহর জীবন দুর্বিষহ করে তোলে, তখন আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে পর্যায়ক্রমে মিল্লাতে মুসলিমার সর্বকারের গর্বের ধন গাজি সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহঃ) ইসলামী ঝাণ্ডা হাতে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন ফলে ঈমানের বলে বলিয়ান ও মিল্লাতের দরদে উদ্দীপ্ত ও নেতৃদ্বয়ের ওপর আল্লাহ তালার রহমতের স্রোতধারা নেমে আসে। তাঁরা একের পর এক যুদ্ধে জয়ী হতে থাকেন। অবশেষে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর থেকে খৃস্টানদের ৯০ বছরব্যাপী আধিপত্যের অবসান ঘটাতে সমর্থ হন।

ইতিহাস এই যুদ্ধকে ক্রুসেড যুদ্ধ নামে অভিহিত করে থাকে। কেননা যুদ্ধংদেহী খৃস্টান পাদরীরা সেদিন ক্রুস হাতে ইউরোপের প্রতিটি জনপদে

পরিভ্রমণ করে সেখানকার অধিবাসীদের কথিত পবিত্র ধর্ম যুদ্ধে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে সমগ্র খৃস্টজগৎ ক্রুস নিয়ে দলে দলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

ফ্রান্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা শান্ত সুনিবিড় পল্লীতে বসবাসকারী একটি ছোট্ট পরিবারও সেদিন ক্রসেডের উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হয়ে এ পথে পা বাড়িয়েছিল। স্বামী ও লুইস স্ত্রী হেলেনা ও একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুতেই এ পরিবারটি সীমাবদ্ধ। লুইস ও হেলেনা তারা ছিলেন সম্পূর্ণ যৌবনাদীপ্ত, একে অপরকে প্রাণ উজাড় করে ভালবাসতেন। বিরহ বিচ্ছেদ যে এক মর্মন্তুদ বস্তু তা তাদের কল্পনায়ও আসেনি কোন দিন। এ দম্পতি ঠিক ঐ সময়ে পৌঁছান, যখন ফিলিস্তিনের আঁকা শহরে ক্রুসেডরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। শহরটির পতন ঘটানোর জন্যে মুসলিম মুজাহিদদের চেষ্টার কমতি ছিল না। কিন্তু স্থলভাগ দীর্ঘদিন ঘেরাও করে রাখার পরও যখন শহরটির পতন ঘটানো সম্ভব হচ্ছিল না তখন সালাউদ্দীন আইয়ুবী অস্থির হয়ে উঠেন। কেননা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন অবরোধের প্রথম দিন থেকে নৌবহরের সাহায্যে প্রতিদিন তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোজ রোজ অসংখ্য ক্রুসেডার বিপুল রণসম্ভার নিয়ে শত্রুর সাথে যোগ দিচ্ছে। আইয়ুবীর উপদেষ্টা কাজি ইবনে সাদ্দাদ বলেন, আমরা সুলতানের অবস্থা দেখলে কেঁদে ফেলতাম। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম তিনি প্রত্যহ ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর দরবারে বিজয় ও নুসরতের জন্যে কান্নাকাটি করছেন একদিন আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, সুলতান আপনি মোটেও ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আপনার ফরিয়াদ শুনছেন। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আপনি বিজয় লাভে সমর্থ হবেন। আল্লাহর অপূর্ব মহিমা! সত্যিই দিন কয়েক পরে বিজয়ের দরজা খুলে যায় এবং মুসলিম মর্দেমুজাহিদদের আক্রমণে তাল সামলাতে না পেরে ক্রুসেডাররা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

হেলেনের স্বামী লুইসও এ চূড়ান্ত লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। হেলেন স্বামীকে ধর্মযুদ্ধে পাঠিয়ে অধীর আগ্রহে তার প্রত্যাবর্তনের পথ পানে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন দুইদিন করে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হবারও পরও যখন লুইসের ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা গেল না তখন অজানা আশংকায় হেলেনের কচি হৃদয় হু হু করে উঠল। এরপর যতই সময় যেতে লাগলো তার অস্থিরতা ও কান্না ততই বেগবান হতে লাগলো। পার্শ্ববর্তী তাঁবুর মহিলারা ছুটে এলেন। তারা সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক সান্ত্বনাচ্ছলে বলতে লাগলেন, কাদিসনে হেলেন, লুইস কামিয়াব হয়ে গেছে। তুই ধৈর্য ধর। তার রেখে যাওয়া এই আমানতটিকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে আরেক লুইস হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা কর।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। স্বামী বিরহে তার শূন্য হৃদয় খা খা করতে লাগলো। মহিলারা তাকে যতই প্রবোধ দিতে লাগলেন তার স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে উঠতে লাগলো সেই নিভৃত পল্লী জীবন স্বামীর সাথে অতিবাহিত মুহূর্তগুলোর টুকরো টুকরো ছবি। চোখ দুটো হয়ে গেল তির তির গতিতে প্রবহমান পাহাড়ী ঝর্ণার মত। এভাবে সন্ধ্যা গড়িয়ে যখন রাত আসলো হেলেনের অস্থিরতা আরো বেড়ে গেলো। বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগলো হেলেন। আর মনের কোণে বার বাহ হাতড়ে খুঁজতে লাগলো স্বামী লুইসের স্মৃতি। শেষ রাতের দিকে ক্লান্তিতে তার চোখ বুঁজে আসে। ছোট্ট শিশুটি মায়ের স্তন মুখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বেশ বেলা হয়ে গেল। চোখ খুলে দেখলো বুকের মানিকটি নেই। আর্তনাদ করে উঠলো হেলেন। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। সে পাগলিনীর মত দৌড়ে গেলে পার্শ্ববর্তী তাঁবুগুলোর দিকে। একটি একটি করে সবগুলো তাঁবু খুঁজেও যখন বাচ্চাটির সন্ধান পেল না তখন হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো সে। অতঃপর বুক চাপড়াতে চাপড়াতে দৌড় দিল নেতাদের শিবিরে।

সব শুনে নেতারা পরামর্শ দিলেন, তুমি আমাদের প্রতিপক্ষ সুলতান সাল্লাহউদ্দীনের কাছে যাও। তিনি খুব ভদ্র-নম্র ও উদার প্রকৃতির লোক। তোমার এ ফরিয়াদ শুনলে তিনি অবশ্যই একটা ব্যবস্থা করে দিবেন। নেতাদের সূক্ষ্মসামরিক চাল বুঝে উঠার মত মানসিকতা ছিল না হেলেনের, সে উদ্ভ্রান্তের মত দৌড়াতে লাগলো মুসলিম শিবিরের দিকে। কিন্তু কাছে আসতেই বাধাপ্রাপ্ত হলো মুজাহিদদের দ্বারা। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল কাঁদছো কেন? আর এখানেই বা এসেছ কেন? সে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে, "আমার স্বামী নিহত হয়েছেন, শিশু পুত্রটিকে কে জানি চুরি করে নিয়ে গেছে, আমি তাকে পাবার উদ্দেশ্যে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। এ কথা বলে হায় পুত্র! হায় পুত্র বলে আর্তনাদ করতে লাগলো। হৃদয়বিদারক এ দৃশ্য এবং তার মানসিক অবস্থা দেখে জনৈক দয়ার্দ্রচিত্ত মুজাহিদ তাকে পাঠিয়ে দিলেন সুলতানের তাঁবুর দিকে। হেলেন তার স্বামী! হায় পুত্র! বলে দৌড়াতে লাগলো। সুলতানের তাঁবুতে এ সময় কাজি ইবনে শাদ্দাদও উপবিষ্ট ছিলেন। মেয়েলি কণ্ঠের এ কান্না শুনে তিনি বেরিয়ে এলেন। কাছে ডেকে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। হেলেন রুদ্ধশ্বাসে, সবকিছু খুলে বললেন। কাজি বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর। সুলতান এখন খুবই ঝামেলায় আছেন। হেলেনের অন্তর চৌচির হয়ে যাচ্ছে। বললো আমি পারব না। আমি অপেক্ষা করতে পারব না। অপেক্ষা করলে যে আমার বাচ্চাটির ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কাজি সাহেব তখন পাশের দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,

তাহলে ওর সাথে যেতে থাকো। হেলেন সুলতানের কাছে যাচ্ছে মনে করে চুপচাপ লোকটিকে অনুসরণ করতে লাগলো। কিন্তু খানিক পর নিজেকে কয়েদীদের শিবিরে আবিষ্কার করলে পুনরায় হায় স্বামী! হায় পুত্র! বলে আকাশ ফাটা চিৎকার করতে লাগলো। এ তাঁবুরই অপর পাশে এক কয়েদি মাথানত করে বসা ছিল। চিৎকারের শব্দ তার কানে পৌঁছা মাত্রই সচকিত হয়ে উঠল। কান্নার সূর তার অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। সুতরাং সে মাথা উঠিয়ে কান্নারত নারীটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। এদিকে সুলতান গার্জি সালাহউদ্দীন এ মহিলার হারিয়ে যাওয়া শিশুটির সন্ধানে সৈন্য নিয়োগ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শিশুটিকে উদ্ধার করা হলো। এবং ওর স্বামীর বন্দিত্বের বিষয়টিও সুলতান অবহিত হলেন। অল্পক্ষণ পর সালাহউদ্দীন, মহিলাটিকে তলব করলেন যখন ওকে নিয়ে যাওয়া হল। অমনি সেই যুবক কয়েদিটি, আমি ওকে দেখতে চাই, ওর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই বলে চিৎকার জুড়ে দিল। এ অবস্থা দেখে প্রহরী ও কয়েদি সকলেই হতবাক। তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন, একি? আজ কদিন ধরে কয়েদি হয়ে আসা অবধি তো এ যুবক এমন আচরণ করেনি। ভদ্র নম্র ও গম্ভীর প্রকৃতির লোকটির তো এ যাবৎ উচ্চকণ্ঠে কোন কথাও বলেনি। আজ হঠাৎ করে ওর হলোটা কি? লোকেরা কাছে এসে তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কিন্তু চিৎকার ছাড়া তার কোনই জবাব পাওয়া গেল না। তার এ অস্বাভাবিক আচরণের কথা সালাহউদ্দীনের অজানা রইল না। তিনি তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। সুলতানের ওখানে পৌঁছামাত্রই তার চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। কারণ এ কয়দিনে সে মুসলিম সিপাহীদের আচরণ, সুলতানের মর্যাদা, উন্নত চরিত্র, নম্রতা ও উদারতা দেখে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে এসেও তার সন্ধানী দৃষ্টি সেই মহিলাটিকেই খুঁজে ফিরছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল মহিলাটি একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে তাঁবুর এক পাশে বসে আছে। আনন্দে তাঁর মন নেচে উঠল। শুকরিয়া দৃষ্টিতে সে মহাপ্রাণ সালাউদ্দীনের নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। এক পর্যায়ে সে সুলতানের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ডুকরাতে লাগলো। আবেগে সুলতানের অবস্থাও অন্য রকম হয়ে গেল। তিনি মায়া জড়িত কণ্ঠে সান্ত্বনা দানপূর্বক বললেন, যুবক আর নয়, এবার মাথা তুলো। অপরিমিত আনন্দে সে পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভুলে মন্থর গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো মহিলাটির দিকে। মাছুম শিশুটি ক'দিন পর তার পিতাকে দেখতে পেয়ে আব্বা বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। হেলেন বোবার ন্যায় চেয়ে আছে। অচিন্তনীয় এ মধুর মিলন তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে

দিয়েছে। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না হেলেনের। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর অস্ফুট স্বরে বললো লুইস, তুমি বেঁচে আছ? সুলতান তাদেরকে মন খুলে ব্যথা বদলের সুযোগ দেন। খানিক পর তাদের উভয়কে পাশে বসিয়ে বললেন ঃ আমাদের ধর্ম আমাদেরকে যা শিখায় তোমাদের সাথে আমরা তাই করছি। হেলেন শুধালো, সত্যিই কি আপনাদের ধর্ম এমনটি শিক্ষা দেয়? ... ...

হ্যাঁ, ইসলাম সবার জন্য এক বিরাট রহমত। ... ...

তাহলে আমার ন্যায় এক অসহায় মহিলার জন্যেও কি এ রহমতের অধিকারী হওয়ার সুযোগ রয়েছে? আমিও কি পারব ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে? ... ...

খুশীতে সুলতানের চেহারা ঝলমল করে উঠল। তিনি বললেন– হ্যাঁ, এ সুযোগ সবার জন্যে অবারিত। রহমতের এ দ্বার সবার জন্যে সর্বক্ষণ উন্মুক্ত। তাহলে বলুন, মুসলমান হতে হলে আমাকে কি করতে হবে? সুলতান বললেন; বল আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হেলেন কলেমা পড়ে নিলো। অতঃপর স্বামীর দিকে চেয়ে দেখলো তার কণ্ঠ থেকেও উচ্চারিত হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

এরপর স্বামী স্ত্রী শিশুটিকে আদর করতে করতে সুলতানের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসলেন। লুইস তখন হেলেনের কাঁধে হাত রেখে বললেন আচ্ছা হেলেন বলতো দেখি আমরা কি পুনরায় ফিরে যাব আমাদের ভালবাসার সাক্ষী, সুখের বাগান, সৌরভ প্রবাহিত ফুলের ঝাড়, ফল ভরা বৃক্ষ ও ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছের ছায়া ঘেরা পাখি ডাকা সেই শ্যামল শান্ত পল্লীর ঠিকানায়? না লুইস, আমরা আর কোনদিন ওখানে ফিরে যাব না। যদিও একদিন সেখানে আমাদের জীবন তৃপ্তিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু আজ তা বিশুষ্ক ও ম্লান হয়ে এখানে এসে নতুন প্রাণ সজীব হয়ে উঠেছে। এখানে এ ভূখণ্ডেই আমাদের মসিহ (আঃ) জন্ম নিয়েছিলেন। এখানে এসে আমরা মসিহকে হারাইনি উপরন্তু তাঁর সাথে রহমতের নবীকেও পেয়ে গেছি।

কিছুক্ষণ পর মুসলিম ফৌজ বিজয় অভিযানে বের হলে নও মুসলিম লুইস ইসলামের পতাকা হাতে সকলের সাথে সাথে দৌড়াচ্ছিলেন। দূর থেকে প্রাণবন্ত এ যুবকটিকে তখন এক তাজাদম বাহাদুর বলে মনে হচ্ছিল।

উপমহাদেশ, স্বর্ণযুগ ও একটি ঐতিহাসিক বিজয়

সাইয়েদ আহমাদ শহীদের জিহাদ আন্দোলন ঃ স্মৃতিতে বালাকোট

আমাদের এই বিশাল মাতৃভূমি তথা উপমহাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস কত যে মর্মান্তিক তা বলে শেষ করা যাবে না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে এদেশ চলে যাওয়ার পর তা উদ্ধার করার জন্য কত যে চেষ্টা চলেছে, কত দেশ-প্রেমিক যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তারও কোন হিসাব নেই। তেমনি কোন হিসাব নেই স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ঘটে যাওয়া যুদ্ধগুলোর। এসব যুদ্ধের মধ্যে বালাকোটের যুদ্ধ অন্যতম। এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনপুষ্ট শিখ সৈন্যবাহিনী এবং ক্ষুদ্র একটি মুসলিম বাহিনীর মধ্যে। ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ৬ মে শুক্রবারের এ স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হন মুসলমানদের আমীর শতাব্দীর মুজাদ্দেদ সাইয়েদ আহমাদ (রাহঃ), সেনাপতি মাওলানা ইসমাইল (রাহঃ) এবং তিনশতের কাছাকাছি মজাহিদ। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে আমাদের এ বাংলাদেশ অঞ্চলের অনেক লোকেরও অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এদের মধ্যে আটজনের নাম ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম। উপমহাদেশের স্বাধীনতা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে অর্জন করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে এর মধ্যে বালাকোটের ঘটনা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, বেদনাদায়ক এবং মর্মান্তিক। বালাকোটের সেই যুদ্ধে যদি মুসলিম বাহিনীর বিজয় অর্জন হত তাহলে আজকে উপমহাদেশের চিত্রই হয়ত ভিন্ন রকম হতো।

বালাকোটের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় হলেও তা থেকে স্বাধীনতা অর্জনের যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল তা অন্য কোন উৎস থেকে হয়নি। মূলত বালাকোটের সঞ্চারিত প্রেরণার বলেই এক সময় এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বালাকোট আজ আমাদের কাছে অপরিচিত। বালাকোটের ইতিহাস আমরা হারাতে বসেছি। আজকের প্রজন্মের লোকেরা বালাকোট কি, ঘুণাক্ষরেও জানে না। কিন্তু কেন তারা জানে না এর কি কোন সঠিক জবাব নেই? স্বাধীনতার জন্য এতবড় আত্মদানের ট্রাজেডী সম্পর্কে তারা

কেন অনবহিত? অবশ্যই এর জবাব আছে। আসল ইতহিাস ধামাচাপা দিয়ে মিথ্যা ইতিহাস বিনির্মাণে যারা পটু এরাই এজন্য দায়ী। উপমহাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যারা লিপিবদ্ধ করেছে এদের অধিকাংশই হল বিধর্মী অথবা বিধর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত। ফলে ইতিহাসের সর্বস্তরের পুস্তক থেকে শুরু করে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে পর্যন্ত তারা আসল ইতিহাসকে বিকৃত করে পরিবেশন করেছে। অথবা মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সবগুলো ঘটনাকেই বাদ দিয়ে ইতিহাসের পুস্তক রচনা করেছে। কিন্তু যা বাস্তব এবং সত্য তা কোনদিনই মাটিচাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখা যায় না। কোন একদিন হলেও মানুষ তা জানে এবং উদ্ধার করে। তেমনিভাবে বালাকোটের ইতিহাসকেও আজকে ভাল করে জানা এবং উপলব্ধি করার সময় এসেছে, উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে বালাকোটের অবদান কত বিশাল তা বিস্তারিত বর্ণনা করলে বিশালাকারের একটি পুস্তক রচনার দরকার। বালাকোট যুদ্ধের প্রাণপুরুষ সৈয়দ আহমাদ বেরলভী (রাহঃ)-ই ছিলেন এই আন্দোলনের মূল ব্যক্তি। তিনি ১২০১ হিজরী মুতাবেক ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর তারিখে ভাতের উত্তর প্রদেশের জেলা রায়বেরলীর এক ঐতিহ্যবাহী সাধক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রপিতামহ শাহ আলমুল্লা (রাহঃ)-এর দায়েরাতে পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি লাখনৌ চলে যান। এ সময় তার বয়স ছিল সতের। লাখনৌতে তিনি এক আমিরের সৈন্যবাহিনীর অন্তভুক্ত হয়ে যুদ্ধবিদ্যা অর্জন করেন।

যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথেই তিনি দিল্লী চলে যান এবং শাহ আবদুল আজীজ দেহলবী (রাহঃ) পরিচালিত মাদ্রাসায়ে রহিমিয়ায় ভর্তি হয়ে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু করেন। মেশকাত পর্যন্ত লেখাপড়া সমাপ্ত করে শাহ আবদুল আজীজ (রাহঃ)-এর নিকট বাইআত হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে তাঁর নিকট থেকে খেলাফত লাভ করেন।

সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী (রাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন তার নিদর্শন সাইয়েদ সাহেবের মাঝে বাল্যকাল থেকেই ফুটে উঠছিল। লেখাপড়ার চেয়ে জেহাদী মনোভাব এবং মানুষের হিত সাধন মানসিকতাই তার মধ্যে বেশি লক্ষ্য করা যেত। মূলত আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বারা যে কাজ নেবেন সে কাজের উপযুক্ত করেই তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে অতি অল্প সময়েই তিনি তার অভীষ্টে পৌছার পাথেয়গুলো সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়ে যান। পাথেয় সংগ্রহের পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি লক্ষ্যপথ স্থির করে নেন এবং মূল কাজ আঞ্জাম দেয়ার সাধনায় লেগে যান।

সাইয়েদ সাহেব (রাহঃ) আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত থাকাকালীন তাঁর উপরে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহরাশি এমনভাবে বর্ষণ হতে শুরু করেছিল যা ছিল সমসাময়িককালে অত্যন্ত বিস্ময়কর।

একবার রমযানের ২১ তারিখে তিনি স্বীয় পীর শাহ আব্দুল আজীজ (রাহঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন ঃ এবার শবে কদর কত তারিখে হতে পারে বলে আপনার ধারণা? শাহ সাহেব বললেন ঃ রাত্রি জাগরণের সাধান অব্যাহত রাখো। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে তাহলে তোমার প্রার্থনার হাত বরকতের মনিমুক্তায় পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে। অন্যথায় শুধু রাত জেগে থাকলেই কোন কিছু অর্জন হয়ে যায় না। দেখনা, পাহারাদাররা জেগে থেকে সারাটি রাত কাটিয়ে দেয় কিন্তু তাদের কিছুই অর্জন হয় না।

সাইয়েদ সাহেব (রাহঃ) স্বীয় মুর্শিদের নিকট একথা শোনার পর সাধনার জন্য আকবরী মসজিদে চলে যান এবং শবে কদরের সন্ধানে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। ঘটনাচক্রে ২৭ রমযানের রাতে ইশার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কে যেন তাকে হাত ধরে জাগিয়ে দেন। নিদ্রাভঙ্গ হওয়া রপর দেখলেন তাঁর ডানে রাসূল (সাঃ) এবং বামে আবূ বকর (রাঃ) বসা আছেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আহমাদ! শীঘ্র ওঠ এবং গোসল করে নাও। সাইয়েদ সাহেব তাড়াহুড়া করে উঠলেন এবং পাশের হাওজের ঠাণ্ডা পানি দিয়েই গোসল করে দ্রুত আবার রাসূল (সাঃ)-এর কাছে ফিরে এলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন, আজ কদরের রাত, আল্লাহর যিকির এবং মুনাজাতে লিপ্ত হয়ে যাও। একথা বলে তাঁরা উভয়েই চলে গেলেন।

সাইয়েদ সাহেব (রাহঃ) তাঁর এই বিশেষ রাতটির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এ রাতটিতে অনেক অত্যাশ্চর্য বিষয় প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এক পর্যায়ে বৃক্ষলতাসহ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে সেজদারত অবস্থায় দেখতে পাই। স্থুল দৃষ্টিতে অবশ্য সবকিছু আপন অবস্থাতেই দাঁড়ান ছিল বলে মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন ঃ এ মুহূর্তটিতেই আল্লাহর ধ্যানে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার সৌভাগ্য আমার অর্জন হয়েছিল।

সকাল বেলা আমি শাহ সাহেব (রাহঃ)-এর দরবারে হাজির হলাম এবং রাতের অবস্থা বর্ণনা করার ইচ্ছা করলাম, তিনি আমাকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন। আমি কিছু বলার পূর্বেই তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া। আজ রাত তুমি তোমার ইপ্সিত স্থানে পৌছে গিয়েছ। এ ঘটনার পর

থেকেই সাইয়েদ সাহেবের উক্ত মর্যাদা এবং আধ্যাত্মিক জগতের পরিপূর্ণতার নানা আলামাত প্রকাশ পেতে শুরু করে।

আধ্যাত্মিক সাধনায় পরিপূর্ণতা অর্জন করার পর তিনি মাতৃভূমি রায়বেরেলিতে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে নাসিরাবাদ নামক স্থানে জোহরা নামক এক পূণ্যবতীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে এক কন্যা সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় সাইয়েদা সায়েরা।

সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী (রাহঃ) বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করার পর আবার দিল্লী চলে আসেন। স্বীয় গুরু হযরত শাহ আবদুল আজীজ (রাহঃ)-এর পরামর্শক্রমে তৎকালীন সময়ের মুসলমানদের একমাত্র সেনাশক্তি টোঙ্কের নবাব আমীর খানের সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী নেন। এখান তিনি ৬/৭ বছর চাকুরী করেন। তাঁর এ দীর্ঘ সৈনিক জীবনকালে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এ সময়কালেই তিনি জয়পুর এবং মধুরাজপুরের যুদ্ধ ও দুর্গ অবরোধে যথেষ্ট অবদান রাখেন। নবাব আমীর খানের সেনাবাহিনীতে সাইয়েদ সাহেবের যোগদান করার আসল উদ্দেশ্যটি ছিল, উপমহাদেশের সর্বশেষ এবং একমাত্র ভরসা এ মুসলিম সৈন্যশক্তিটিকে সঠিক পথে দাঁড় করিয়ে রেখে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাইয়েদ সাহেবের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কুচক্রী ইংরেজ ওদের দেশীয় দোসরদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের মুখে মুসলমানদের এ শক্তিকেন্দ্রটিও বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। পরিস্থিতির শিকার হয়ে নবাব আমীর খান ইংরেজদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হন। সাইয়েদ সাহেব ইংরেজদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে নবাব আমীর খানকে শুরু থেকে বাধা দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু অবশেষে সন্ধি হওয়ার পর তিনি আর এখানে থাকা সমীচীন মনে করেন নি। তিনি দিল্লীতে শাহ আবদুল আজীজ (রাহঃ)-এর নিকট চলে গেলেন।

সাইয়েদ সাহেব দিল্লী যাওয়ার পর এখান থেকে মূল সংগ্রাম শুরু করেন। তৎকালীন সময়ের উপমহাদেশের মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেন। যথা, (ক) তাবলীগ, (খ) সংস্কার ও (গ) জিহাদ। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মুসলমানদের সমাজ জীবনে অনুপ্রবিষ্ট যাবতীয় কুসংস্কারের সংশোধন এবং অস্তিত্ব রক্ষার্থে আপোসহীন লড়াই।

সাইয়েদ সাহেব সর্ব প্রথম দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন। এ কাজটি তিনি শুরু করেন বাইআত এবং আত্মশুদ্ধির অঙ্গীকারের মাধ্যমে। তৎকালীন সময়ের সেরা দু'জন আলেম মাওলানা ইসমাইল শহীদ ও মাওলানা

আবদুল হাই বুরহানভী সাহেব সর্বপ্রথম তার হাতে বাইয়াত হন। এছাড়াও আরও আলেম, মুহাদ্দেস এবং ফিকাহবিদগণ তাঁর হাতে বাইআত হন। সাইয়েদ সাহেব এঁদের সবাইকে সাথে নিয়ে দেশব্যাপী এক তাবলীগী সফর শুরু হয়। তাঁর এই বিরাট কাফেলায় সত্তর জনেরও বেশী আলেম এবং বুযুর্গ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে গাজীয়াবাদ থেকে সফর শুরু করেন। কাফেলা তাবলীগী কাজের মধ্য দিয়ে মীরাট, মরধনা, ফুলাত, মুযাফফর নগর, সাহারানপুর রোহারী আম্বাটা, গঙ্গোহ, শিকারপুর, লোহরী, থানা ভবন, দেওবন্দ, কান্দালা ভ্রমণ করে পুনায় দিল্লী ফিরে আসে। সাইয়েদ এই সফর সর্বত্রই দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের এক নব জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর পদচারণার ফলে। তিনি যেখানেই যেতেন লোকেরা দলে দল এসে তাঁর হাতে বাইআত হতো। তার কথা শোনার জন্য ভীড় জমাত। তিনি সাহারানপুর পৌঁছার পর সে এলাকর সেরা বুযুর্গ, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাঃ) এর দাদা পীর হাজী আবদুর রহীম সাহেব তাঁর সকল ভক্তসহ সাইয়েদ সাহেবের হাতে বাইআত হন। এ দীর্ঘ সফরের মূল্যায়ন করে তাঁর উত্তর পুরুষ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী লিখেন, যে সমস্ত জনপদে সাইয়েদ সাহেবের তাবলীগী কাফেলা ভ্রমন করে সে সব অঞ্চল থেকে শির্ক বিদাত এবং শরীয়তবিরোধী যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম উৎখাত হয়ে যায়। সর্ব শ্রেণীর ওলামা মাশায়েখ তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। সকলে হৃষ্টচিত্তে তাঁর তাবলীগী কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। সাইয়েদ সাহেব এর পরে আরও অনেকগুলো সফল করেন এগুলো প্রত্যেকটিতেই তিনি আশাতীত সফলতা অর্জন করেন।

সাইয়েদ সাহেবের দ্বিতীয় কর্মসূচী ছিল সংস্কার। মুসলিম সমাজের অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কারগুলোর অপসারণের প্রয়োজনীয়তা শুরু থেকেই তিনি তীব্রভাবে অনুভব করতেন। তিনি এ কথাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, লোকজনকে শুধুমাত্র সত্য-নায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করেই দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনা এবং অটল রাখা সম্ভবপর হবে না। সত্য প্রচারের পাশাপাশি অন্যায়গুলো প্রতিহত করার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। অধর্মীয় আচার-আচরণগুলোও মুসলিম সমাজ থেকে বিদূরিত করতে হবে। এসব বিবেচনা করে তিনি বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্যবাহী এ আচারটিকে কুসংস্কার বানিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পুনরায় তা চালু করার আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনটি বেগবান এবং জীবিত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিয়ে করেন। তিনি পরিবারের সবাইকে একত্র

করে বলেন, আমি শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ)-এর মৃত এ সুন্নতটিকে পুনরায় জীবিত করার জন্য এবং বর্বর যুগের প্রথাকে ধুলিস্যাত করার জণ্য এ বিবাহ করতে যাচ্ছি। তাঁর এ বিয়ের ফলে সত্যিই সেসব অঞ্চল থেকে উক্ত কুপ্রথাটি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাইয়েদ সাহেব দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাবলীগ এবং সংস্কারের কাজ করতে থাকেন। পাশাপাশি জিহাদের পক্ষে জনমত গঠন করার জন্যেও সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। তাবলীগ এবং সংস্কারের কাজ পুর্ণতার পর্যায়ে লেগে এবার তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি থেকে হিজরত করার মনস্থ করেন। সাইয়েদ সাহেব যখন তাঁর আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত তখন উপমহাদেশের রাজনৈতিকভাবেও তিনটি শক্তিতে বিভক্ত এবং ভৌগলিকভাবেও এ অঞ্চল উপরোক্ত শক্তি তিনটির কৃতৃত্বাধীন। গোটা উপমহাদেশের কেন্দ্রস্থল সিংহভাগ অঞ্চল ছিল ইংরেজ বেনিয়াদের অধীনে। পাঞ্জাবসহ তার আশপাশের কিছু কিছু অংশ ছিল ইংরেজদের সমর্থনপুষ্ট শিখদের অধীনে। বাকী পেশাওয়ারসহ সীমান্ত প্রদেশের কিছু এলাকা স্বাধীন এবং আঞ্চলিক পাঠান গোত্রপতিদের অধীনে ছিল। সাইয়েদ সাহেব (রাহঃ) সর্বদিক বিবেচনা করে সীমান্ত প্রদেশের দিকে হিজরত করার মনস্থ করলেন এবং স্বাধীন এলাকায় থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তৎকালীন সময়ে ইংরেজদের অধীন এলাকায় থেকে এমন কোন সুবিধা ছিল না যে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ করে সফল হওয়ার আশা করা যেতে পারে। তাই তিনি স্বাধীন এলাকা সীমান্ত প্রদেশের দিকে হিজরত করার ঘোষণা দিয়ে দিলেন। মাওলানা ইসমাইল শহীদ, মাওলানা আবদুল হাই সাহেব এবং আরও কিছু শীর্ষ নেতা এই ঘোষণা দেশের সর্বত্র প্রচার করার উদ্দেশ্যে সফরে বের হন। ফলে এদের প্রচার এবং প্রচেষ্টায় কয়েক হাজার মুজাহিদ তৈরি হয়ে সাইয়েদ সাহেবের কাছে এসে সমবেত হন। সাইয়েদ সাহেব এদের মধ্যে দুই হাজার সৈন্য বাছাই করে হিজরতের প্রস্তুতি নেন।

হিজরতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ইসমাইল শহীদ (রাহঃ) জিহাদের ঘোষণা করে লিখেন ঃ বিদেশী খৃস্টান শক্তি এদেশীয় মুসরিকদের সাথে যোগসাজশ করে সিন্ধু নদীর তীর থেকে শুরু করে সমুদ্র তীর পর্যন্ত সমগ্র ভুখণ্ড দখল করে বসে আছে। এটি এত বিশাল একটি রাজ্য যে কেউ যদি পায়ে হেঁটে দেশটি অতিক্রম করতে চায় তাহলে দীর্ঘ ছমাসের মধ্যে তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। এরা আল্লাহর দ্বীন বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে নানা ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে। নানা কৌশলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহের জীবন বপন করার ঘৃণ্য তৎপরতায়

লিপ্ত রয়েছে। এরা এই বিশাল ভূ-খণ্ডে যুলুম-নির্যাতনের প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। তখনকার দিনে পাঞ্জাব এলাকায় ইংরেজদের তুলনায় তাদের দোসর শিখদের মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন ছিল আরও ভয়াবহ। সাইয়েদ সাহেব (রাহঃ) সেদিন এদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নিজের প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন। শুধু কি তাই? শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

সীমান্ত প্রদেশের দিকে হিজরতের উদ্দেশে সাইয়েদ সাহেব কাফেলাসহ ৬ জুমাদাসসানীয়া ১২৪১ হিজরী মুতাবেক ১৭ জানুয়ারী ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মাতৃভূমি রায়ে বেরেলী থেকে রওয়ানা হয়ে যান। সাঈ নদীর তীরে দেশীয় সাথীদেরকে বিদায় জানিয়ে চির অচেনার পথে পাড়ি জমান। যাত্রাপথে গোয়ালিয়র, টোঙ্ক, আজমীর, যারওয়ার, যোধপুর, সোহালী, মৌরাহা, খোসাবেলুচ, পাড়িয়া এবং কুঠিয়ারের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে সিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ করেন। সিন্ধু প্রদেশের মরুময় ভূমিতে কিছুদিন অবস্থান করে আবার যাত্রা শুরু করেন। পরে ওমরকোট, কোয়েটা, কান্দাহার হয়ে সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করেন।

মুজাহিদ বাহিনী সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করার পর শিখদের সাথে প্রথম সংঘর্ষট অনুষ্ঠিত হয় লন্ডা নদীর কিছু দূরে অবস্থিত আকুড়াখটক নামক স্থানে। সরদার বুধ সিংয়ের অধীনে শিখ বাহিনী ছিল সংখ্যায় বিশাল এবং অত্যন্ত সুশৃংখল। কিন্তু মুজাহেদদের ক্ষুদ্রবাহিনীর সামনে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এক পর্যায়ে শিখ বাহিনীকে আকুড়া অঞ্চল ছেড়ে চয়ে যেতে হয়। আকুড়ার যুদ্ধ ছিল মুজাহিদ বাহিনীর জন্য এক বিরাট সাফল্যের সওগাত। প্রথম যুদ্ধেই বিজয় লাভ করার কারণে মুজাহিদরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। এ যুদ্ধের পরই সাইয়েদ সাহেব পেশোয়ারকে রাজধানী নির্বাচন করে এক পরিপূর্ণ ইসলামী হুকুমতের ভিত্তি স্থাপ করতে সমর্থ হন। আকুড়ার যুদ্ধের পর মুজাহিদদের জিহাদ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। কিছুদিন পর সংঘটিত হয় শায়দুর যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও মুজাহিদ বাহিনীর বিজয় লাভ হয়। অতঃপর একে একে আরও সংঘঠিত হয়। ডোমগোলা, শিনকিয়ারী, উতসার্জাই, দানতুরা, তরবিনা, উশরা, ফুলাড়া, মারদান এবং মায়ারের যুদ্ধ। এর প্রত্যেকটি যুদ্ধেই মুজাহিদ বাহিনীর অকল্পনীয় সাফল্য অর্জিত হয়। যুদ্ধে সফলতা অর্জনের ফলে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের শক্তি এবং সীমানা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ রাজ্যের সীমানা খায়বর গিরিপথ থেকে সিন্ধু নদের উৎসমুখ, উত্তরে কাশ্মীর সীমান্ত থেকে দক্ষিণে সিন্ধুর সীমানা পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এ রাজ্যের সর্বত্রই ছিল শরীয়ত ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা। সাইয়েদ সাহেরের এই

হুকুমত লাহোরের শিখরাজশক্তিও মেনে নিতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাদের ইংরেজ উপদেষ্টারা রাজাকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। অবশেষে ইংরেজরাই পাঠানদের সহায়তায় সাইয়েদ সাহেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মুজাহিদ বাহিনীর শক্তি দুর্বল করে দেয়। পাঠানদেরকে তাদের জাতীয়তাবাদী মন্ত্রের দীক্ষা দিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়। স্থানীয় পাঠানরা ইংরেজদের চক্করে এসে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একরাতে অসংখ্য মুজাহিদকে নির্মমভাবে হত্যা করে। কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করা হয়। কাউকে নামাযরত অবস্থাতেই শহীদ করা হয়।

সাইয়েদ সাহেব এ নির্মম ঘটনার পর মানসিকভাবে খুবই আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং এ বদনসীব অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার মনস্থ করেন। অবশিষ্ট মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তিনি কাশ্মীরের পথে রওয়ানা হয়ে যান। এ সময়েই পথে সংঘঠিত হয় ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধ। বালাকোটের যুদ্ধটিও মূলত সংঘটিত হয়েছে স্থানীয় গাদ্দার এবং শিখদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই।

বালাকোটে ঃ সাইয়েদ সাহেব মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে কাশ্মীরের পথে সাচুন নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট হাবীবুল্লাহ খানের পক্ষ থেকে এ মর্মে পত্র পৌঁছালো যে শেরসিং তার বাহিনী নিয়ে বালাকোটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই আপনিও বাহিনী নিয়ে তরিত হাজির হন। সাইয়েদ সাহেবের বাহিনী বালাকোটেই অবস্থানরত ছিল। অপরদিকে শেরসিংয়ের বাহিনী কোনার নদীর পূর্ব তীরে সমবেত ছিল। তারা এত কাছে ছিল যে, বালাকোট থেকে তাদের অবস্থান ভালভাবেই দৃষ্টিগোচর হতো। গিরিপথ বেয়ে আক্রমণ করার জন্য তারা নদীর উপর একটি পুলও নির্মাণ করল। শের সিং সুবিধার জন্য তার সৈন্য বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে একদলকে পুলের সাহায্যে নদীর পশ্চিম তীরে পার করে দিল আর অপর দলকে রেখে দিল পূর্ব তীরে।

সাইয়েদ সাহেব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে ২০/৩০ জন মুজাহিদকে সাধারণ অস্ত্রসহ দু'টি তোপ দিয়ে ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে বসিয়ে দিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুনশী লাল মুহাম্মদের নেতৃত্বে একশত মুজাহিদ মোতায়েন করে দিলেন। তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরেকটি শক্তিশালী দল নিয়োজিত করলেন। মুনশী লাল মুহাম্মদ যে দিকে মোতায়েন ছিলেন সেদিকটায় শিখ বাহিনী প্রথম আক্রমণ করে। শত্রু বাহিনী সংখ্যায় বেশী হওয়ার কারণে মুজাহিদরা তাদেরকে প্রতিহত করতে পারেনি। ফলে টিলা শত্রু বাহিনীর দখলে চলে যায়। মাটিকোট টিলা শিখ বাহিনীর হাতে চলে যাওয়ায় মুজাহিদদের একটা অসুবিধা হয়ে যায়। এবার

মুজাহিদ বাহিনীর যারা পাহাড়ের উপরে ছিলেন সবাই নিচে নেমে আসেন এবং খোলা ময়দানে যুদ্ধ শুরু হয়। মুজাহিদ বাহিনী ছিলে সংখ্যায় অতি অল্প-পক্ষান্তরে শত্রু বাহিনী ছিল তাদের বিশগুণ। ৬ মে ১৮৩১ শুক্রবার সকালের নামায সকলেই সাইয়েদ সাহেবের ইমামতিতে আদায় করেন।

নামায শেষে সাইয়েদ সাহেব পাশের কক্ষে চলে যান। যিকির এবং ওজীফায় মগ্ন থাকেন ইশরাক পর্যন্ত। অতঃপর যুদ্ধের পোষাক পরিধান করে বেরিয়ে এসে মসজিদের বারান্দায় বসে যান। সাইয়েদ সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আমার পতাকাবাহী অগ্রসর হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা কেউ আগে বাড়বে না। সবাই নিজ নিজ স্থানে বসে গুলি চালাতে থাক। ইতিমধ্যে তিনি আবার কক্ষে চলে গিয়ে দুয়ার বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে বললেন ঃ আমাকে কে ডাকল? সাথীরা বলল ঃ কেউ না। তিনি আবার চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে সবাইকে নিয়ে সোজা রণাঙ্গনে চলে গেলেন এবং তাকবীর বলে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাইয়েদ সাহেব মুজাহিদদেরকে নিয়ে এমন শক্তিশালী আক্রমণ করলেন যে শিখ বাহিনী রণাঙ্গন পরিত্যাগ করে পাহাড়ে উঠে যেতে বাধ্য হলো। তিনি মাটিকোট পর্যন্ত তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যান। শিখ বাহিনী দ্বিতীয় দফা আবার শক্ত আক্রমণ করে। মুজাহিদদের উপর বৃষ্টির ন্যায় গুলি বর্ষণ করতে শুরু করে। মুজাহিদরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু হাজার সংখ্যার মুজাহিদ বাহিনীর পক্ষে বিশ হাজারের বিশাল বাহিনীর মুকাবেলা করা সম্ভবপর হয়নি। ফলে মুজাহিদরা অধিক হারে শহীদ হতে লাগলেন। ইতিমধ্যে একটি গুলি এসে সাইয়েদ সাহেবের উরুতে আঘাত হানে।

তিনি আহত অবস্থায়ই যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। সাইয়েদ সাহেব মূলত শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনরত অবস্থায় কোথায় যে শাহাদাত বরণ করেন তা তাঁর সাথীরা ঠাহর করতে পারেননি। ফলে তাঁর অনুপস্থিতির সংবাদ রণাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়লে মুজাহিদরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যান। একে একে অন্যান্য সাথীরাও শহীদ হন এবং এভাবেই সম্মুখ সমরের সমাপ্তি ঘটে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৬ মে সাইয়েদ সাহেবের শাহাদত এবং বালাকোটের ময়দানে মুজাহিদদের আপাতঃ পরাজয় হলেও তাঁদের এ আত্মদান উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজীর খুঁজে বের করা মুশকিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে সাইয়েদ সাহেব এবং বালাকোটের মুজাহিদদের রক্তের সমুদ্রে সাঁতার কেটে পরবর্তী সময়ে এ দেশে আবার স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়।

বীর মুজাহিদ মীর নিসার আলী উরফে তিতুমীর

নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লার শহীদ

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীন বাংলার সূর্য অস্তমিত হবার পর ইংরেজ বণিকেরা দেশটাকে দখল করে মুসমানদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল সেই অত্যাচার এবং নির্যাতন এদেশের মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মুসলমানদের প্রতি প্রতিহিংসা এবং অর্থ ও স্বার্থের লোভে হিন্দু সম্প্রদায় তখন ইংরেজদের তোষামোদি করে তাদের আসন পাকা করে নেয়। ইংরেজ এবং হিন্দুদের যৌথ রোষালনে পড়ে মুসলমানদের লুপ্ত চেতনা উজ্জীবিত হয়। ১৭৬৪ সালে মীর কাসেমের পরাজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 'দেওয়ানী' লাভ করে তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মুসলমানরা চুপচাপ বসে না থেকে ইংরেজ ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এটাই স্বাধীকার আন্দোলেন প্রথম বিদ্রোহ যা 'ফকীর বিদ্রোহ' নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে।

স্বাধীকার আন্দোলনের ফকীর বিদ্রোহের টগবগে অবস্থায় ১৭৮২ সাল মোতাবেক বাংলা ১১৮৮ সনের ১৪ মাঘ সুবেহ সাদিকের সময় চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত অন্তঃপাতি চাঁদপুর গ্রামে আলহাজ হাফেজ সৈয়দ নিসার আলী মীর ওরফে মহাবীর তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাসান আলী এবং মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন।

অমুসলিমদের লেখা ইতিহাসে তিতুমীরকে সাধারণ ঘরের চাষী হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত অর্থে সৈয়দ নিসার আলী বা তিতুমীর কোন সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন হযতর আলী (রাঃ) এর বংশধর। ইংরেজী ১৩২৪ সালের দিকে তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে সৈয়দ শাহাদাত আলী, সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী ও তাঁদের সহদোরা আবেদা রওশন বিবি এদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য চলে আসেন। সৈয়দ শাহাদাত আলীর একমাত্র পুত্র দরবেশ ও বিশিষ্ট আলেম হযরত সৈয়দ শাহ হাশমত আলী রাজীর অন্যতম পুত্র দরবেশ ও বিশিষ্ট আলেম সৈয়দ আব্দুল্লাহকে দিল্লীর তখ্তনশীল বাদশাহ

জাফরপুরের প্রধান বিচার আদালতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। সৈয়দ আব্দুল্লাহর ন্যায়নিষ্ঠতা ও ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ তাঁকে 'মীর ইনসাফ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সেই থেকে সৈয়দ শাহাদত আলীর বংশধরেরা শাহী আমলে বাদশাহ কর্তৃক দেয়া শ্রেষ্ঠ উপাদী 'মীর' এবং বংশগত উপাধি 'সৈয়দ' উভয় উপাধি ব্যবহার করতেন। এই বংশের ধারবাহিকতায় হযরত সৈয়দ হাশমত আলী রাজীর ত্রিংশ অধঃস্তন পুরুষ হিসেবে হযরত সৈয়দ শাহ নিসার আলী মীর ওরফে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন।

তিতুমীর যে পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের তখন বড়ই দুর্দিন। ইংরেজদের কাছে স্বাধীনতা হালিয়ে মুসলমানেরা সিংহ জাতি হয়েও ভেড়াশাবকের ন্যায় জীবন যাপন করছিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে হিন্দু জমিদার ও উচ্চবর্ণ হিন্দুরা ইংরেজদের দোসর হয়ে মুসলমানদের ধর্ম, আকিদা, অর্থনীতি ও সামাজিকতার ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। তখন মুসলমানেরা প্রকৃত ধর্মের আলো থেকে অজ্ঞতার কারণে অনেক সরে গিয়েছিল। নানাবিধ পৌত্তলিক কুসংস্কারে ভরপুর ছিল সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের জীবন যাপন। হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার নিপীড়নে ইসলামী নাম বাদ দিয়ে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের নামের সাথে নাম মিশিয়ে রাখতো। প্রকৃতপক্ষে চাষী শ্রেণীর মুসলমানো না হিন্দু না মুসলমান-এর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল।

বাংলার এই মুসলিম দুর্যোগের কঠিন সময় তিতুমীরের পিতা মীর হাসান আলী নবী (সাঃ) বংশের শোণিতের ধারার মাঝে মুসলমানদের ইসলামী জেন্দেগীর সন্ধান দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন। বংশের রেওয়াজ অনুযায়ী তিতুমীরের বয়স যখন সাড়ে চার বছর তখন তাঁর পিতা মীর হাসান আলী পুত্রের হাতে তখতী দিয়ে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। মীর হাসান আলী পুত্রের আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা ও অংক শিক্ষাদানের জন্য শ্রেষ্ঠ উস্তাদ মুন্‌শী লাল মিঞা ও রামকমল ভট্টাচার্যকে নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে বিহার শরীফ থেকে চাঁদপুর গ্রামে আলেম ও হাফেজ নিয়ামতউল্লাহর আগমন ঘটে। হাফেজ নিয়ামতউল্লাহকে পেয়ে চাঁদপুর ও হায়দারপুর গ্রামবাসী দুই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে এলাকার ছাত্রদের শিক্ষার আলো জ্বেলে দেন।

হাফিজ নিয়ামতউল্লাহর সাহচর্য থেকে মেধাবী ছাত্র তিতুমীর বিভিন্ন কিতাবের ওপর বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফ হেফ্‌জ করেন। তিনি আরবী, ফার্সী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় তেজদীপ্ত বক্তৃতা করতে

পারতেন। এসব ভাষার ওপর তাঁর এমন অধিকার হয়েছিল যে, যখন যে ভাষায় কথা বলতেন তখন তাকে সেই ভাষাভাষী লোক বলে মনে হত।

বিহার শরীফের উস্তাদ হাফেজ নিয়ামতউল্লাহ ইসলামী জ্ঞান সাধনার এক বিরল সাধক ছিলেন। শিক্ষার সাথে সাথে ছাত্রদেরকে শরীর চর্চা, ডন, কুস্তি, বিভিন্ন শারীরিক কসরত শিখাতেন। উস্তাদজীর অনুগত ছাত্র তিতুমীর ছেলেবেলা থেকে অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। একদিকে মেধাবী অলন্যদিকে শক্তিধর ছাত্র পেয়ে উস্তাদ নিয়ামতউল্লাহ তিতুমীরকে মনের মত করে গড়ে তুলেছিলেন।

অমুসলমানদের লেখা ইতিহাসে তিতুমীরকে নিকৃষ্ট শ্রেণী বা হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য চাষী, নিম্ন বংশের, ডাকাত, লুটেরা বলা হলেও তাতে প্রকৃত সত্য চাপ পড়েনি। নবী (সাঃ) এর বংশাধারার মর্যাদায় এবং সেই ঐতিহ্যে তিনি বাদুড়িয়া থানা খালপুর গ্রামের বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ সুফী মুহম্মদ আসমতউল্লাহ সিদ্দিকীর পৌত্রী এবং হযরত শাহ সুফী মুহম্মদ রহিমউল্লা সিদ্দিকীর কন্যা মায়মুনা খাতুন সিদ্দিকাকে বিবাহ করেন। তখনকার সময় সিদ্দিকা পরিবারের প্রথা অনুযায়ী এই বিবাহের দেনমোহর ধার্য করা এক হাজার সাতশত টাকা এবং পাঁচ আশরাফী। তিতুমীরের বিবাহের চৌদ্দদিন পর তাঁর ছোট দাদা সৈয়দ উমর দারাজ রাজি একশত পাঁচ বছর বয়সে এবং তাঁর আব্বা সৈয়দ হাসান আলী ছয় মাস পর পঞ্চাশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন।

পিতা মীর হাসান আলীর ইন্তেকালের এক বছর পর তিতুমীর উস্তাদ নিয়ামত উল্লাহর সাথে কলকাতায় যান। কলকাতায় গিয়ে উস্তাদজীর উৎসাহ এবং দোয়ার বরকতে তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। তখনকার সময়ের নামজাদা পাহলোওয়ানদের পরাজিত করে তিতুমীর বিখ্যাত কুস্তিগীর হিসাবে পরিচিত লাভ করেন। এক কুস্তি প্রতিযোগিতার আসরে শাহী খান্দানের লোকও মির্জাপুর জমিদার মির্জা গোলাম আম্বিয়ার সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁর দাওয়াতে তিতুমীর ও তাঁর উস্তাদ মীর্জা মঞ্জিলে গিয়েছিলেন। সেখানে মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার পীর মুর্শিদ বাকেরগঞ্জ নিবাসী শেখ আফতাবউদ্দীন বা শাহ কামালের সাথে পরিচয় ঘটে। তিতুমীর শাহ সাহেবের সাথে দুই তিন দিন অতিবাহিত করার পর বিভিন্ন উপদেশবাণী শ্রবণ করে মুগ্ধ হন এবং তাঁর বায়াত গ্রহণের অনুমতি ভিক্ষা করেন।

আধ্যাত্মিক মুর্শিদ শাহ কামাল তিতুমীরের প্রতি খেয়াল করে বলেছিলেন, আল্লাহ জন্য উপযুক্ত মুর্শিদ ঠিক করে রেখেছেন। তোমাকে মুরদী করবার অধিকার আমার নেই। তিনি তিতুমীরকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে বলেছিলেন,

বাবা নিসার আলী, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি শাহাদাতের গৌরব তোমার নসীবে আছে।

সৈয়দ নিসার আলী মুর্শিদ শাহ কামালের কথা শুনে আরও উতলা হয়ে উঠলেন। এতদিন যাবৎ তাঁর ভেতর শরীয়তের যে শিক্ষাদীক্ষা ছিল তা যেন মারেফতি শিক্ষ গ্রহণের তৃষ্ণাতে আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সৈয়দ নিসার আলী তাঁর যোগ্যতম মুর্শিদের খোঁজে বাংলা থেকে বিহার, উড়িষ্যা, দিল্লী, আগ্রা, আজমীর ঘুরে বেড়ালেন, কিন্তু তাঁকে মুরীদ করার কোন যোগ্য মুর্শিদ পাওয়া গেল না। তিনি হতাশ হয়ে কলকাতায় ফিলে এলেন। কলকাতায় ফিরে এসে জানতে পেলেন তালিব টোলায় একজন দরবেশ এসেছেন। তিনি জাগ্রত পীর। তাঁর নাম হযরত জাকী শাহ। সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর জাকী শাহের দরবারে কয়েকদিন যাতায়াতের পর তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণের আবেদন জানালে জাকী শাহ বলেছিলেন, তুমি যতদিন বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ ও হজ্জ পালন না করবে ততদিন মুর্শিদের দর্শন পাবে না।

হযরত জাকী শাহের কথা শুনে সৈয়দ নিসার আলীর পিপাসা আরো তীব্র হল। পবিত্র হজ্জের যাবার জন্য তাঁর শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেসন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি কলকাতা থেকে স্বগ্রাম চাঁদপুরে ফিরে আসেন এবং পিতা, মাতামহ, স্ত্রী ও ছোট ভাই পিঠামীর এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরকে তাঁর হজ্জে যাবার কথা ব্যক্ত করলেন। তাদের কাছ থেকে হজ্জে যাবার পূর্ণ সম্মতি পেয়ে ১৮২২ সালে উনচল্লিশ বছর বয়সের সময় পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় যান। মক্কাতে উপমহাদেশের সাধক পুরুষ, ইসলামী চেতনার অগ্নিপুরুষ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী-এর সাথে সৈয়দ নিসার আলীর সাক্ষাৎ হয়। হযরত সৈয়দ আহমদ তাঁর মুরীদদের সাতশত নারী-পুরুষের এক বিরাট কাফেলা নিয়ে পবিত্র হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলেন। এই অবস্থাতে সৈয়দ নিসার আলীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। শাহ সৈয়দ আহমদ রাজি সৈয়দ নিসার আলীকে মুরীদ হিসাবে দীক্ষা দিলেন। হজ্জ শেষে বিরাট কাফেলাসহ তাঁরা মদীনায় পৌছেছিলেন এবং পাক রওজা শরীফে বসেই তিতুমীর স্বীয় মুর্শিদের কাছ থেকে খেলাফতি সনদ ও শাজরা লাভ করেছিলেন। তিতুমীর তাঁর মুর্শিদের সাথে ইরান, ইরাক, মিসর, আফগানিস্তানের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও বোজর্গানদের মাজার জেয়ারত শেষে দেশে ফিরে আসেন।

সৈয়দ নিসার আলী হজ্জ শেষে এক নতুন জীবন নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। সে জীবন ছিল তার মুর্শিদ হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর দেওয়া জিহাদে

উজ্জীবিত জীবন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে কিছুদিন পর হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে জিহাদের আহ্বান জানিয়ে অবশেষে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় শামসুন নিসা খানমের বাগানবাড়ীতে তিন দিন ধরে মুজাহিদদের এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভাতে সৈয়দ নিসার আলী জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বাংলার মুসলমানদের ঈমান খুবই দুর্বল। অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের চেয়ে তারা ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষায় অনগ্রসর। এই সব মুসলমানেরা অজ্ঞতাবশতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এদের দিল থেকে হিন্দুয়ানী ভাব দূর করে ঈমানের আলো জ্বালাতে না পারলে বাংলার জিহাদ ঘোষণা করা বিপজ্জনক হবে। আমি এই শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করছি। শুধু তাই নয় আমি মনে করি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা যারা উচ্চবর্ণ হিন্দু ও জমিদার দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে তারাও আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে ইংরেজ নীলকর ও দেশী নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। সৈয়দ নিসার আলী জ্বালাময়ী বক্তৃতাকে সমর্থন জানিয়ে উক্ত সভায় উপস্থিত জৈনপুরের হযরত মাওলানা কেরামত আলী বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে দারউল হরব সাব্যস্ত করবার ঘোষণাকে আমি অগ্রাহ্য করছি না। দার উল হরবে জুমা নামায নাজায়েজ; কিন্তু জুমা নামায নামায়েজ করলে মসজিদগুলো বিরান হয়ে যাবে। বাংলার অনেক মসজিদ শুধুমাত্র জুমাবারের জুমার নামায পড়াবার জন্য অধিকাংশ মুসল্লি পাওয়া পায় কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে পড়া লোকের সংখ্যা খুব কম। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলা অঞ্চলের মুসমানদের ওপর শয়তানের প্রভাব বেশি। তাই এখানে জুমার নামায বন্ধ রেখে সরাসরি জিহাদ ঘোষণা কিছুদিন স্থগিত রাখা হোক। বাংলা মুলুকে মুসলমানদের ঈমান পাকাপোক্ত করবার জন্য প্রথম জিহাদ ঘোষণা হোক।

তখন এই প্রস্তাব সকলে গ্রহণ করেছিলেন। সে কারণে হযরত সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলে সেখানে শিখরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালাতো সেসব অঞ্চলে সরাসরি জিহাদের আহ্বান জানিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

কলকাতার পরামর্শ সভা শেষ হলে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতবর্ষে সংগ্রামের ডাক নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে সরাসরি জিহাদ শুরু হয়। সৈয়দ নিসার আলীও চাঁদপুরে ফিরে এসে কয়েকদিন বিশ্রাম শেষে সমগ্র বাংলা ঘরে ঘরে ঈমানের দাওয়াত নিয়ে ঝিমিয়ে পড়া মুসলমানদের উজ্জীবিত করতে থাকেন।

সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীরের জ্বালাময়ী বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস, পীরপূজা, কবর পূজা বন্ধ করা, নবীজী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ ও অনুসরণ ও তাঁর নির্দেশ পালন করা, জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত হিন্দু কৃষক শ্রেণীকে একতাবদ্ধ করা, নীলকরদের অত্যাচার দমন এবং বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা।

সৈয়দ নিসার আলীর মুর্শিদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী জিহাদ বলতে বোঝাতেন– "জিহাদের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন বা খ্যাতি লাভ করা নয়, বিভিন্ন অংশ জয় করা বা স্বীয় স্বার্থ পরিতৃপ্ত করা অথবা নিজের জন্য একটা রাজ্য স্থাপন করাও জিহাদের উদ্দেশ্য নয়, জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে তা বিনষ্ট করা।

স্বীয় মুর্শিদের জিহাদী চেহতনায় উজ্জবীত হয়ে তিতুমীর বাংলার মুসলমানদের মন থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে প্রকৃত ইসলামী জিন্দেগীর আহ্বান জানাতে থাকেন। তাঁর এই আবহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মুসলমান বায়াত গ্রহণ করে মুরীদ হতে থাকে। এক সময় সরফরাজপুরের বাসিন্দাদের আমন্ত্রণে তিতুমীর সরফরাজপুর চলে যান এবং সেখানে বর্গী দস্যুদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত শাহী মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন। এখানে এসে তিতুমীর মুসলিম চেতনার উজ্জীবন ও হিন্দু মুসলিম কৃষক শ্রেণীকে একতাবদ্ধ করতে থাকেন। তিতুমীরে এই কাজকে ইংরেজ মদদপুষ্ট হিন্দু জমিদারগণ মেনে নিতে পারছিল না। সুদীর্ঘকাল যাবত মুসলমানদের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত হয়েছে কিন্তু অন্য ধর্মের ওপর মুসলমানদের কোন দিদ্বেষ বা জুলুম ছিল না। তিতুমীরের ধর্মপ্রচার দেখে পুড়ান জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় এবং গোবরডাঙ্গার জমিদার কালি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তারা ইসলামী আকিদার আঘাত হেনে আইন জারী করলেন– ১. দাড়ি রাখলে আড়াই টাকা, গোঁফ ছাঁটলে সিকা খাজনা ২. কাঁচা মসজিদ বানালে পাঁচশত টাকা এবং পাকা মসজিদ বানালে এক হাজার টাকা জরিমানা বা সেলামী দিতে হবে, ৩. ইসলামী নাম রাখলে পঞ্চাশ টাকা, ৪. গরু জবাই করলে ডান হাত কেটে ফেলা হবে এবং ৫. তিতুমীরের কারো বাড়িতে আশ্রয় নিলে তাকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হবে। তিতুমীর এই ফরমানের প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন। সেই দূত আমিনুল্লাহকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

এই ফরমান জারি করে ক্ষান্ত হল না। পুড়ান জমিদার ফরফরাজপুরে মসজিদে জুমার নামায পড়া অবস্থাতে তার লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে আগুন ধরিয়ে

দেয়। কয়েকজন মুসল্লী শহীদ হয়। ফরফরাজপুর থেকে তিতুমীর পার্শ্ববর্তী নারিকেল বাড়িয়া চলে যান। সেখানে গিয়েও মুসলিম বিদ্বেষী জমিদার ও নীলকরদের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। নারিকেল বাড়িয়াতেও জমিদাররা আক্রমণ করে।

১৮৩১ সালের জুলাই-আগস্ট মাস থেকে এই আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই সময় চাঁদপুর থেকে তিতুমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ গওহর আলী, ভাগ্নেয় গোলাম মাসুমসহ অন্যান্য স্থান থেকে পাঁচ শতাধিক লাঠিয়াল বাহিনী নারিকেল বাড়িয়ায় সমবেত হয়। বীর গোলাম মাসুমের পরামর্শে মসজিদ ও হুজরার খোলা চত্বর বাঁশ দ্বারা ঘিরে দুর্গ তৈরি করা হয়। বর্গীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সেখানে জুমার নামাযসহ পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়। ইতিহাসে এই দুর্গ বাঁশের কেল্লা নামে খ্যাত হয়েছে।

১৮৩১ সালের ৬ নভেম্বর জমিদারদের সাথে যুদ্ধ হয়। কয়েকদিন পর সোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়-এর সাথে তিতুমীর বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং দেবনাথ রায় নিহত হয়। পরবর্তীতে ১৪ নভেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকারের বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার কিছুসংখ্যক সৈন্যসহ নারিকেল বাড়িয়া আগমন করলে তিতুমীরের বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়। সাহেব পালিয়ে জীবন বাঁচান।

এর পরপরই ইছামতি নদীর তীরে জমিদার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়। উভয়পক্ষের হতাহতের সংখ্যা অধিক ছিল। জমিদার কৃষ্ণদেবরায় এই যুদ্ধে মারা যান।

১৪ নভেম্বরের বিপর্যয়ের পর ইংরেজ বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একদল সেনাবাহিনী তিতুমীরকে শায়েস্তা করবার জন্য প্রেরণ করা হয়। ১৯ নভেম্বর শনিবার সকালে ইংরেজ সৈন্য বাঁশের কেল্লা ঘিরে ফেলে। তিতুমীর ভীত না হয়ে পূর্বে মারা ইংরেজ সৈন্যদের লাশ কেল্লার চারপাশে ঝুলিয়ে রাখে।

কর্নেল স্টুয়ার্ট আত্মসমর্পণের কথা জানালে তিতুমীর বাহিনী অস্বীকার করে। ফলে কর্নেল গুলি চালাবার হুকুম দেয়। কামানের গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। তিতুমীরসহ পঞ্চাশজন শাহাদাত বরণ করেন এবং ৩৩৩ জন বন্দি হয়। ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর শনিবার মোতাবেক ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল দ্বিপ্রহরের পূর্বে বাংলার আর এক স্বাধীন সূর্যের অস্ত গেল। সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর তাঁর এলাকায় নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ ঘোষণা

করেছিলেন। তিনি স্বাধীনতার পতাকা হিসেবে অর্ধচন্দ্র আঁকা পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তিতুমীর চেয়েছিলেন বাংলার মুসলমানদের ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করে প্রকৃত ইসলামী জিন্দেগী পালনে উৎসাহিত করতে। চেয়েছিলেন ধর্ম থেকে কুসংস্কার দূর করে কোরআন হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে। আর চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলিম কৃষক শ্রেণীকে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে হেফাজত করতে। তাঁর সর্বশেষ চাওয়া ছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা।

একদিকে সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীরের মুর্শিদ সাইয়েদ আহমদ ১৯৩১ সালে জিহাদ করতে করতে ৬ মে শুক্রবার স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে বালাকোটে শাহাদত বরণ করেন আর অন্যদিকে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য তিতুমীর বাংলার জিহাদ করতে করতে একই বছর ১৯ নভেম্বর শাহাদাতবরণ করেন।

এই অকৃতজ্ঞ জাতি আজ স্বাধীনতার পতাকা আকাশে ওড়ায় ঠিকই; কিন্তু ঐ পতাকার মধ্যে শহীদ তিতুমীরের রক্তে স্নাত সেই সূর্যটার আলো চেতনায় প্রতিফলিত হয় না। অমুসলমান লেখকদের লেখা ঘৃণিত ইতিহাসকে এরা পরম শ্রদ্ধাভরে পূজা করে বুদ্ধিজীবী নামধারণ করেছে অথচ ভারতবর্ষে মুসলামনদের গৌরবময় চেপে রাখা ইতিহাসকে স্মরণ করে না। এ ইতিহাসকে স্মরণ করলে কৃতজ্ঞতাভরে শহীদ তিতুমীরকেও স্মরণ করতে হয়।

আজ বাংলাদেশের ঈমানহারা মুসলমানদের চেতনায় শহীদ তিতুমীরের চেতনার প্রতিফলন হলে আমাদের স্বাধীনতা স্বার্থক হবে; স্বার্থক হবে শহীদ তিতুমীরের স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ।

হযরত উমাইর ইবনে ওয়াহাব রা.

জীবনে সংঘটিত বিস্ময়কর বিপ্লব

তুমুল লড়াই চলছিল বদর প্রান্তরে। একদিকে সত্যের পতাকাবাহী দুর্জয় মুসলিম সেনাবাহিনী, অপর দিকে মক্কার মূর্তিপূজারী অভিশপ্ত নরকীটের দল। একে অপরকে তরবারির আঘাতে ঘায়েল ও পরাজিত করার চলছিলো প্রাণান্তকর চেষ্টা। সাহাবারা ছিলেন সংখ্যায় অতি নগণ্য। অপরদিকে সংখ্যায় প্রচুর কাফের বাহিনী, আবার খ্যাতনামা বীর বাহাদুরদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ফলে দম্ভ, অহংকার এবং মুসলমানদের পরাজিত করার নিশ্চিত আশার চাপা আনন্দে আত্মহারা ছিলো তারা। কিন্তু ভাগ্য তাদের সে আশা পূরণ হতে দেয়নি। রহমতের বারিধারা নেমে আসলো মুসলমানদের দিকে। জয় হলো সত্যের, চির সুন্দরের। অসংখ্য কাফেরকে হত্যা করলেন মুসলমানরা। বন্দিও হলো বিপুল পরিমাণে। কাফেরদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধ করছিলেন উমাইর। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে যিনি হযরত উমাইর (রাঃ) পরিণত যুদ্ধশেষে পরাজয়ের গ্লানি বহন করে তিনি যুদ্ধময়দান থেকে ফিরে আসতে পারলেও তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র মুসলমানদের হাতে বন্দি হলেন। পুত্রের জন্য তিনি খুবই ভীত ছিলেন এই ভেবে যে, মুসলমানরা তাকে নিদারুণ কষ্ট দেবে। আর শাস্তি দিবে সীমাহীন। কারণ, তিনি যে রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবাদের অসহনীয় কষ্ট দিয়েছেন এর প্রতিশোধ তো নেবেই মুসলমানরা তার পুত্রের মাধ্যমে। এসব চিন্তা করে তিনি নিদারুণ অন্তর্জ্বালায় ভুগছিলেন। একদিন সকালে তিনি কাবা প্রাঙ্গণে হাজির হলেন। উদ্দেশ্য, পবিত্র কাবা ঘর তওয়াফ করে পুন্য হাসিল করা। সেখানে যেয়ে দেখেন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া হাতীমের ধার ঘেঁষে বসে আছেন। তিনি তার নিকট এসে তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে তার নিকট বসে গল্প করার আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন ঃ আসুন আমরা দুজনে বসে গল্প করি, ভালই লাগবে। নিমন্ত্রণ পেয়ে হযরত উমাইর (রাঃ) সাফওয়ানের একেবারে সামনে যেয়ে বসলেন। শুরু হলো

তাদের মধ্যে বদর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা। কোরাইশ নেতাদের মর্মান্তিক পরাজয় আর বন্দিদের করুণদশা চিন্তা করে তার উভয়েই নিদারুণ মর্মজ্বালা অনুভব করছিলেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ফুসফুস নিংড়ানো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ঃ খোদার কসম, এ পৃথিবীতে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। পৃথিবীর স্বাদ আমার মিটে গেছে। উমাইয়া (রাঃ) বললেন ঃ সত্যিই, আপনি ঠিক বলেছেন। অতঃপর কিছু সময় নীরব থেকে আবার বললেন ঃ কাবার প্রভুর শপথ! যদি আমার দায়ে ঋণ না থাকত এবং আমার পরিবারের ভরণ-পোষণের কথা ভাবতে না হতো তাহলে আমি এ মুহূর্তে মদীনায় ছুটে গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করতাম। দ্বিতীয়ত মদীনায় যাওয়ার একটি সুন্দর সুযোগও হাতে ছিলো আমার। কারণ আমার ছেলে সেখানে বন্দি রয়েছে। তাকে মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন করে আনার ব্যাপারটিকে ইস্যু করে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করা যেতো অনায়াসে। ধূর্ত সাফওয়ান উমাইর (রাঃ)-এর এ কথাটাকে যেন অদৃষ্টগুলো পাওয়া বস্তু মনে করলো। সে ভাবতে লাগলো– না, এ মহাসুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেয়া যায় না। সে উমাইরের দিকে অধিক গুরুত্ব দিলো। বললো ঃ হে উমাইর! আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। আপনার সমস্ত ঋণ আমি পরিশোধ করব এবং আপনার পরিবার পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব আমার। সকল খরচ আমি বহন করব নির্দ্বিধায়। হযরত উমাইর (রাঃ) তার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে বললেন ঃ আপনি ব্যাপারটা খুব গোপন রাখবেন। কারো কাছে যাতে প্রকাশ পেয়ে না যায়। সাফওয়ান বললোঃ আপনিও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে চলবেন। এসব কথা কয়টি বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিশোধের অগ্নি তাঁর হৃদয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন আর বললেন ঃ আমি আমার ইচ্ছা যে করেই হোক বাস্তবায়ন করবো। শুরু হলো এবার প্রস্তুতি। ঘরে এসে স্ত্রীকে বললেনঃ তরবারিটি খুব করে ধার দাও এবং বিষ মিশিয়ে কোষাবদ্ধ করে আমার কাছে দাও। নির্দেশ কার্যকর করা হলো। এবার তিনি তরবারি কণ্ঠে ঝুলিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। হাঁটু চেপে উল্কা গতিতে ধুলা উড়িয়ে চললেন মদীনার দিকে। মনে ভীষণ আনন্দ। ভাবছেন, পথরোধ করে কে আমার। আর কে-ই বা টের পাবে আমার হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা মনোবৃত্তির কথা। ভাবতে ভাবতে তিনি মদীনায় এসে উপস্থিত হলেন। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে সোজা মসজিদে নববীর দিকে চলতে লাগলেন।

এদিকে হযরত ওমর ও আরো কয়েকজন সাহাবী মসজিদের দরজার নিকট বসে পরস্পর যুদ্ধের কথা আলোচনা করছিলেন। আলোচনা করছিলেন কাফেররা কিভাবে নিহত ও বন্দি হলো, আর আল্লাহ তায়ালার অপার করুণা ও রহমতে কিভাবে সাহায্য নেমে এসেছিলো অসহায় মুসলমানদের প্রতি। হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন। বললেন ঃ আরে খোদার দুশমন উমাইরকে দেখছি আসছে। খোদার কসম! নিশ্চয়ই সে কোনো অসদুদ্দেশ্যে নিয়ে এখানে আসছে। সে তো ওই দুষ্ট লোকটি, যে মক্কার মানুষকে আমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দিত এবং আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করতো। তিনি সাথীদের বললেন ঃ তোমরা শিগগিরই উঠে রাসূল (সাঃ)কে ঘিরে দাঁড়িয়ে যাও, যাতে এই লোকটি আমাদের ধোকা দিয়ে না বসে। এ কথা বলে তিনি দ্রুত রাসূল (সাঃ)-এর নিকট চলে গেলেন। আরজ করলেনঃ হে রাসূল (সাঃ)! ঐ দুষ্ট লোকটি গলায় তরবারি ঝুলিয়ে আপনার দিকে ধেয়ে আসছে। আমার মনে হয় তার উদ্দেশ্য ভালো নয়। নিশ্চয়ই কোন অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সে এখানে আগমন করছে। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ হে ওমর! তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত কৌশলে তাঁকে আয়ত্তে নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলেন। রাসূল (সাঃ) উমাইর-এর এই আটকাবস্থা দেখে বললেন ঃ ওহে ওমর তাকে ছেড়ে দাও। ওমর (রাঃ) তাঁর নির্দেশ পালন করলেন। এবার তিনি ওমর (রাঃ)কে একটু দূরে সরে যেতে বললেন। আর উমাইরকে সম্ভাষণের স্বরে বললেনঃ একটু কাছে এসো। উমাইর রাসূল (সাঃ)-এর খুব কাছে এলেন এবং প্রাচীন আরবের সামাজিক প্রথানুযায়ী তাঁকে সুপ্রভাত জানালেন। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ উমাইর! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিষ্টাচার প্রদর্শনের অত্যন্ত সুন্দর নিয়ম শিখিয়েছেন, যা তোমাদের নিয়মের চেয়ে অনেক ভালো ও মার্জিত এবং এর দ্বারা তিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে আমরা 'আসসালামু আলাইকুম' বলি। আর জানো, এটাই জান্নাতবাসীদের সালাম। উমাইর বললেন ঃ হ্যাঁ, আপনার এবং আমাদের সালামের খুব একটা পার্থক্য না থাকলেও আপনার ধর্মটি একেবারে নতুন। এবার রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ উমাইর! বলবে কি, কি উদ্দেশ্যে হঠাৎ এখানে আগমন হলো। তিনি বললেনঃ আমার কয়েদীদের ছাড়িয়ে নেবার জন্য আপনার নিকট সুপারিশ করতে এসেছি। দয়া করে আপনি তাদেরকে মুক্তি দিয়ে আমার ওপর অনুগ্রহ করুন না। একটি বাস্তব সত্যকে তিনি মিথ্যার আবরণে এমনভাবে সাজালেন মনে হয় যেন

তাঁর চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ নেই। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে তোমার কণ্ঠে এ তরবারি ঝুলছে কেন? তিনি বললেন ঃ আসলে আল্লাহ তায়ালা এ তরবারি অকেজো করে দিয়েছেন। আর আপনি বদরের দিন থেকে কি আমাদের জন্য কোনো কিছু অবশিষ্ট রেখেছেন? রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ উমাইর! সত্যি করে বলো, কেন এসেছো। তিনি আবারো বললেন ঃ আমার আসার কারণ তো আপনার নিকট পূর্বেই ব্যক্ত করে দিলাম। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, উমাইর, তুমি এবং সাফওয়ান কাবা প্রাঙ্গনে হাতীমের নিকট বসে বদরের প্রান্তরে নিহত তোমাদের নেতাদের কথা কি আলোচনা করছিলে না? তারপর তুমি বললে, যদি আমি ঋণের দায়ে আবদ্ধ না থাকতাম এবং আমার পরিবারের ব্যাপারে আমাকে ভাবতে না হতো তাহলে এ মুহূর্তে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হত্যা করে আসা কোনো ব্যাপারই ছিল না। একথা বলার পর সাফওয়ান তোমার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে এ শর্তের বিনিময়ে যে, তুমি আমাকে মদীনায় এসে হত্যা করবে। কিন্তু তুমি কি জানো যে তোমার এ সমস্ত দূরভিসন্ধিমূলক চক্রান্তের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে সম্পূর্ণ অবহিত করে দিয়েছেন। এবার উমাইর চমকে উঠলেন! মাথায় যেন বজ্রপাত হয়েছে। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না কি উত্তর করবেন। নিথর নিস্তব্ধ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। তিনি রাসূল (সা)-কে বলতে লাগলেন, হে রাসূল (সাঃ) আপনি যখন আমাদের ওহীর বাণীগুলো শুনাতেন, আমরা তা বিশ্বাস করতাম না, মনে করতাম এগুলো মিথ্যা এবং আপনার নিকট কোন ঐশী বাণী আসে না। কিন্তু সাফওয়ানের কথা তো অন্য কেউ জানে না। অথচ আপনি জেনে গিয়েছেন। খোদার শপথ! এবার আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে সব কিছু জানিয়ে দিয়েছেন। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার নিকট এ জন্য নিয়ে এসেছেন যাতে আমি হেদায়েতপ্রাপ্ত হই। এ কথা কয়টি বলার পর হযরত উমাইর (রাঃ) কালেমা পাঠ করে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণে রাসূল (সাঃ) সীমাহীন আনন্দিত হলেন এবং সাহাবীদেরকে বললেনঃ তোমরা তোমাদের নওমুসলমান ভাইটিকে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শিক্ষা দাও। তাঁকে কোরআনের তালীম দাও। হযরত উমাইর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণে সাহাবীগণও খুব আনন্দিত হলেন। বিশেষ করে হযরত ওমর (রাঃ)

সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হলেন। তিনি বলেনঃ উমাইর যখন রাসূল (সাঃ)-কে হত্যা করার ঘৃণ্য মানসিকতা নিয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসছিলো তখন সে ছিল আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। কিন্তু এখন সে আমার কাছে আমার সন্তানের চেয়েও প্রিয়।

ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করার জন্য কিছুদিন মদীনাতে রয়ে গেলেন এবং ঈমানকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বেছে নিলেন রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র সান্নিধ্য। খুব সুখেই অতিবাহিত হচ্ছিলো তাঁর দিনগুলো। রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র সান্নিধ্যের ছোয়ায় আর সাহাবীদের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশের নির্মল আনন্দ তাঁকে জন্মভূমি মক্কার কথা ভুলিয়েই দিলো। একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেলেন তিনি সাফওয়ানের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির কথা।

অপরদিকে সাফওয়ান উমাইর অপেক্ষায় অস্থির। আবার এই ভেবে মনে মনে আনন্দও অনুভব করছিলো, নিশ্চয়ই উমাইর কোন সুসংবাদ নিয়ে আসছে। মক্কার কোনো জনসমাবেশের নিকট দিয়ে তার যাওয়া হলেই উচ্চকণ্ঠে বলে বেড়াতো, হে কোরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ রয়েছে। অনতিবিলম্বে এমন একটি সংবাদ তোমরা পাবে, যা বদরের প্রান্তরে তোমাদের ব্যর্থতার গ্লানিকে মুছে দিবে এবং তোমাদের মনের সমস্ত দুঃখ বেদনাকে আনন্দে পরিণত করে দিবে। কিন্তু দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছিলো সাফওয়ানের মনের উৎকণ্ঠা ততই বাড়ছিলো। উমাইরের অনাগমন তাকে অস্বাভাবিকভাবে ভাবিয়ে তুললো। মদীনা থেকে আগত প্রতিটি মুসাফিরকে সে জিজ্ঞাসা করতো উমাইরের কথা। জানতে চাইতো তাঁর অবস্থার সংবাদ। কিন্তু কেউ সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেনি। অবশেষে একজন পথিক উমাইরের ইসলাম গ্রহণের কথা তাকে জানালো। খবরটি শুনে যেন সাফওয়ানের মাথায় বজ্রপাত হলো সে নিজকে সামলে নিতে পারছিলো না। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, উমাইর কখনো মুসলমান হতে পারে না। পৃথিবীর সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে নিলেও উমাইরের পক্ষে এটা অসম্ভব। কখনো সঠিক হতে পারে না এ সংবাদ!

এদিকে হযরত উমাইর (রাঃ) জন্মভূমি মক্কায় ফিরে আসার সংকল্প করলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেনঃ হে রাসূল (সাঃ) আমি আমার জীবনের বিরাট একটি অংশ অতিবাহিত করেছি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। ইসলামকে সমূলে বিনাশ করে দেয়াই ছিল তখন আমার

একমাত্র লক্ষ্য। আমার সামনে যারা ইসলাম গ্রহণ করতো তাদেরকে আমি নানাভাবে অত্যাচার করতাম। নির্যাতন করতাম সীমাহীন, দুঃখে কষ্টে তাদেরকে জর্জরিত করে তুলতাম। এবার আমার মনের একান্ত আশা, আপনি আমাকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি কোরাইশ সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে আহ্বান করবো। যদি তারা আমার ডাকে সাড়া দেয় তাহলে এটা নিঃসন্দেহে তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তার আমার আহ্বান প্রত্যাখান করে তাহলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবো। এমন শাস্তি দিবো, যেমনটা তারা আপনার সাহাবীদেরকে দিতো। রাসূল (সাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। হযরত উমাইর (রাঃ) অনুমতি পেয়ে সোজা মক্কায় চলে গেলেন। অন্তরে ছিলো তাঁর এক সাগর আকাঙ্ক্ষা, ভাবছিলেন তিনি, নিশ্চয়ই মক্কার সকলেই আমার আহ্বানে সাড়া দিবে।

হযরত উমাইর (রাঃ) এবার সাফওয়ানের সাক্ষাতে রওয়ানা হলেন। তার সাথে দেখা করে বললেন ঃ হে সাফওয়ান! শুন, নিঃসন্দেহে তুমি একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ নেতা, তুমি কি বলতে পারবে, যে মূর্তিগুলোর তোমরা উপাসনা করো এবং যাদের ওপর তোমাদের পশু-প্রাণী উৎসর্গ করে বলী দাও তারা কি তোমার কোন উপকার করতে পারে। তেমনি পারে কি তোমার কোন ক্ষতি করতে? শুনে রাখ! আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত বা উপাসনার উপযুক্ত নয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত রাসূল।

অতঃপর হযরত উমাইর (রাঃ) তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মক্কাবাসীকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে লাগলেন। নিরলস প্রচেষ্টা চালালেন তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাদেরকে চিরন্তন সত্যের পথে নিয়ে যেতে। হ্যাঁ, তাঁর এ হাড়ভাঙ্গা প্রচেষ্টা একেবারে বিফলে যায়নি। অনেকেই সাড়া দিয়েছিলো তাঁর এ আহ্বানে।

সংগ্রামী মহিলা সাহাবী হযরত খাওলা রা.

যুগে যুগে রণপ্রান্তরে মুসলিম নারীদের আদর্শ

ইসলামের প্রথম যুগে যে সকল মহীয়সী মুজাহিদ নারীর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তন্মধ্যে হযরত খাওলা বিনতে আজুর (রাঃ) নামটি অন্যতম। তিনি ছিলেন আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র আসাদ বিন খোজাইফার নারী। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

খাওলা বিনতে আজুর বিন আউস, বিন খোজায়মাহ বিন রবীআহ বিন মালেক বিন সালাবাহ বিন দুদান বিন আসাদ বিন খোজায়মাহ।

হযরত খাওলা (রাঃ) তাঁর ভাই হযরত জারার বিন আজুর (রাঃ) সাথে হিজরী নবম সন বনি আসাদের কাফেলার সাথে নবীজীর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। হযরত আবু বকরের (রাঃ) খেলাফত আমলে তের হিরজীতে রোম সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধে দুই-সহোদর ভাই-বোন এমন সাহসিকতার পরিচয় দেন, যা পাঠ করতেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। হযরত জারার কখনও বর্মাবৃত দেহে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন আবার কখনো বর্ম ছাড়াই যুদ্ধ করতেন। এ ছিল তাঁর যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থা। তাঁর অকুতোভয় রণকৌশল দেখে রোমানরা তাঁকে জিন বলে আখ্যায়িত করে। তাঁর রণকৌশল এবং সাহসিকতার কারণে আরবে তাঁকে এক হাজার যোদ্ধার সমতুল্য গণ্য করা হত।

মুজাহিদগণ সিরিয়া প্রবেশ করে যখন রাজধানী দামেশকের উপকণ্ঠে উপনীত হয়ে তার চতুর্দিকে ঘেরাও করে। এ সময় সিপাহসালার খালিদ বিন ওয়ালিদ জানতে পারলেন যে, সিরিয়া বাসীদের সাহায্যার্থে রোমানদের একটি দল দামেশকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সময় তিনি হযরত জারারকে নির্দেশ দিলেন যে, রোমান সৈন্যদের পথেই প্রতিরোধ করে। তিনি শত্রুদের নিকটবর্তী হয়ে জানতে পারলেন যে, শত্রু সংখ্যা ১২ হাজার। এতে কোন কোন মুজাহিদ বললেন এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করা ঠিক হবে না। পর্যাপ্ত বাহিনী নিয়ে তাদের মোবাবেলা করা ভাল হবে। হযরত জারার কারো পরামর্শ শুনলেন না বরং আরো বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এখান থেকে এক পাও পিছু হটবো না। কেউ ফিরে যেতে চাইলে তাতে আমার আপত্তি

নেই। তাঁর বক্তব্য শুনে মুজাহিদগণ এক বাক্যে বলেন, "এতো শুধু পরামর্শই ছিল মুলত আমরাও কাফন পরিধান করে যুদ্ধ করতে এসেছি, মুজাহিদগণ নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার বলে সিংহের মতো শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত্রুরা প্রথমে অল্পসংখ্যক মুজাহিদ দেখে মনে করছিল অনায়াসেই মুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করবে। কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়ে তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। হযরত জারার যুদ্ধের মোহে স্বীয় বর্ম খুলে গর্জে উঠে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একের পর এক শত্রুদের ভূলুণ্ঠিত করে অগ্রসর হচ্ছেন। এক সময়ে তিনি শত্রুদের প্রধান সেনাপতি ওয়ার্দানের নিকটবর্তী হয়ে গেলেন। সেনাপতি ওয়ার্দান তার দেহরক্ষী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। হযরত জারার তাকে আক্রমণ করার জন্য যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন ওয়ার্দানের পুত্র হামরুর তীর নিক্ষেপ করে হযরত জারারের একটি বাহু আহত করে দিল। কিন্তু ইসলামের এই মহা বীর ক্ষান্ত হবার লোক নন। নিজকে সংযত করে ঐ তীর পুনরায় পাল্টা দিকে নিক্ষেপ করলেন, হামরু এ তীরের আঘাতে ভূলুণ্ঠিত হলো। যুদ্ধের গতি দেখে রোমান বাহিনী তাদের অবরোধ সংকুচিত করে ফেলে। এদিকে মুসলিম বাহিনী যখন হযরত জারারের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছিলেন এ সময় হঠাৎ তাঁর ঘোড়া হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো এবং রোমান বাহিনী হযরত জারারকে বন্দি করে ফেলে। সাথে সাথে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ স্থগিত করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নিকট দূত প্রেরণ করে হযরত জারারের বন্দিত্ব এবং যুদ্ধের অবস্থার কথা জানালেন।

কালবিলম্ব না করে হযরত খালিদ মাইসারাহ বিন মাসরুকের নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য দামেশকের পূর্ব সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন। অবশিষ্ট মুজাহিদগণকে সাথে তিনি রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন অশ্বপৃষ্ঠে আবৃত মুখমণ্ডলে একজন যোদ্ধা রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পরক্ষণে দেখা গেল অপরিচিত আবৃত মুখমণ্ডল যোদ্ধাটি শুধু শুত্রুর প্রতি আঘাত করে যাচ্ছে। পিছন থেকে তীরের আঘাতে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে কিন্তু সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। হযরত খালিদ (রাঃ) তার পরিচয় চানতে চাইলেন। কিন্তু কেউ তাকে চিনে না বলে জানালো। ততক্ষণে সে একের পর এক শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে রোম সৈনিক দল থেকে বেরিয়ে আসলো। হযরত খালিদ ঘোড়া হাঁকিয়ে তার নিকটে গিয়ে আওয়াজ দিয়ে বললেন, হে বীর সিপাহী! তুমি কে? কি তোমার পরিচয়? সত্যই তুমি মহান এক সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছ। তোমার মত বীর মুজাহিদের মুখমণ্ডল আবৃত রাখা অশোভনীয়। সুতরাং

তোমার মুখোশ উন্মোচন কর, তোমার বীরত্বপূর্ণ চেহারাখানি যেন আমি দেখতে পাই। মুখোশধারী অনেকক্ষণ চুপচাপ রইলেন। হযরত খালিদের বারংবার অনুরোধে বললেন, "হে সিপাহসালার! আমি জারার বিন আজুরের বোন খাওলা বিনতে আজুর। আমার ভাইকে রোমান বাহিনী বন্দি করেছে তাই যতক্ষণ আমি ভাইকে শত্রু শিবির থেকে মুক্ত করে আনতে না পারি ততক্ষণ ক্ষান্ত হবো না।"

হযরত খালিদ খাওলার প্রতিজ্ঞা এবং সাহস দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বললেন, তোমার মত বীর সাহসী কন্যা যে দলে থাকবে সে দল কখনও দুশমনের নিকট পরাজিত হবে না। ধন্যবাদ জানাই তোমাকে, তোমার বীরত্বকে। কন্যা আমার! শান্ত হও তুমি! তোমার ভাই যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তবে নিশ্চয়ই তাকে আমি মুক্ত করে আনব, আর যদি সে শহীদ হয়ে থাকে তবে রোমান বাহিনী থেকে তার প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব। এই বলে হযরত খালিদ সৈন্যদের নিয়ে রোমান বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাথে খাওলাও ছিলেন। খাওলার বেদনা ভরা কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে মুজাহিদগণ আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ সময় ক'জন সৈন্য বন্দি করে হযরত খালিদের সম্মুখে হাজির করা হলো, তিনি জানতে চাইলেন যে, জারার এখন কোথায় কোন অবস্থায় আছে। বন্দিরা জবাব দিলো– তাকে তো বন্দি করে একশ অশ্ববাহিনী দ্বারা বেষ্টিত করে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

হযরত খালিদ কালবিলম্ব না করে রাফে বিন ওমাইরাকে একশত অশ্বারোহী দিয়ে হেমসের দিকে প্রেরণ করলেন। বললেন, যেভাবে হোক জারারকে মুক্ত করে আনতে হবে। সাথে খাওলাও রওয়ানা হলেন, মুসলিম বাহিনী দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর শত্রু বাহিনী দেখলেন, তারা হযরত জারারকে হাত-পা বেঁধে উটের পিঠে নিয়ে চলেছে আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। জারার অসহায় এবং ভারাক্রান্ত মনে কবিতা আবৃত্তি করেছেন যার অর্থ এই– "হে বার্তাবাহক, তুমি আমার বোন এবং আমার দলকে এ সংবাদ জানিয়ে দাও যে, আমি অসহায় বন্দি অবস্থায়। আর আমি অস্ত্রসজ্জিত শত্রু সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত। তাই আমি ফিরে আসতে অক্ষম। হে মোর হৃদয়, তুমি দুঃখবেদনায় নিষ্প্রভ হয়ে যাও। হে মোর আঁখি, তুমি মোর কপোলে অশ্রু বন্যা বইয়ে যাও, যদি আজ আমার সাথীরা এবং আমার বোন খাওলা আমার সাথে থাকত তবে আমার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করেই ক্ষান্ত হতাম।"

খাওলা ভাইয়ের বেদনা ভরা কণ্ঠের আবৃতি শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, ভাইয়া! আমি হাজির! আমি হাজির!! এই বলে বীর

কন্যা খাওলা সিংহের মতো গর্জে ওঠে কাফের দলে আক্রমণ চালালেন সাথে অন্যান্য মুজাহিদগণও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অতি অল্প সময়েই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করে হযরত জারারকে মুক্ত করে খালিদের নিকট নিয়ে আসেন। মুসলিম বাহিনীর বিজয় হলে জারার তার বোনকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু ফেললেন। এতে মুসলমানদের সাহস আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মুসলিম বাহিনী অক্ষত ও নিরাপদে ফিরে আসায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। পরের দিন আবারো যুদ্ধ হল এতে কাফেরদের বহু সৈন্য নিহত হয় ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনী বিপুল যুদ্ধাস্ত্র এবং মালামাল গনীমত হিসেবে অর্জন করে। অতঃপর তারা বিজয়ী বেশে দামেশকের দিকে অগ্রসর হয়।

দামেশক এখনও অধিকৃত হয়নি। হিরাক্লিয়াস বিরাট এক সৈন্য বাহিনী আজনাদীন নামক স্থানে প্রেরণের প্রস্তুতি নিয়েছে– এই খবর বিশেষ সূত্রে খালিদ জানতে পারলেন। এ দিকে হরত আবু ওবায়দার (রাঃ) পরামর্শে হযরত খালিদ এবং অন্যান্য সেনাকর্মকর্তারা সাময়িকভাবে দামেশক অবরোধ তুলে নিলেন এবং আজনাদীনের দিকে অগ্রসর হরেন। সৈন্যদের নিয়ে হযরত খালিদ আগে রওয়ানা দিলেন শিশু এবং মহিলাদর সাথে নিয়ে হযরত আবু ওবাইদা পিছু পিছু আসছিলেন। মুসলিম বাহিনী দামেশক অবরোধ প্রত্যাহার করে চলে যাচ্ছেন দেখে পিটার এবং পোলস নামক দুজন রোমান সেনাপতি মুসলিমদের ওপর হামলা করার প্রস্তুতি নিল। এরা পদাতিক ও অশ্বারোহী ষোল হাজার সৈনিক নিয়ে অতর্কিতে মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা করে। এতে কিছু মুসলিম মহিলা বন্দি হয়, হযরত খাওলাও বন্দি মহিলাদের সাথে ছিলেন।

রোমান বাহিনী যখন বন্দিদের প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করে তখন হযরত খাওলা বন্দি সাথী বোনদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "হে বোনেরা, আমরা সকলেই বীর আরবের কন্যা, সর্বোপরি মহানবীর (সাঃ) সাহাবী। সুতরাং কাফেরদের আনুগত্যের চেয়ে জীবন দিয়ে যুদ্ধ করা আমার জন্য শ্রেয়। উল্লেখ্য যে, বন্দি মহিলাদের অধিকাংশই তুব্বা এবং হিমইয়ার গোত্রের লোক ছিল। এরা তীর নিক্ষেপে পুরুষদের মতো পারদর্শী ছিলেন। মহিলারা খাওলার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে যুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বেলিত হয়ে পড়েন। সকলেই একবাক্যে বলে উঠেন, "আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তবে আমরা যে নিরস্ত্র তাতে উপায় কি? সশস্ত্র শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে তো অস্ত্রের প্রয়োজন।"

হযরত খাওলা (রাঃ) আবারও বললেন ঃ "বোনেরা আমার! অস্ত্রের পরিবর্তে আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাতে যা আছে তা নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। এসো আমরা সকলেই তাঁবুর খুঁটি উপড়ে নিয়ে তা দিয়ে শত্রুর উপর

আঘাত হানি। আল্লাহর অনুগ্রহে হয়তো আমরা মুক্ত হবো আর না হয় শাহাদতবরণ করবো। দুটাতেই আমাদের কল্যাণ। খাওলার প্রস্তাবে সকলই ঐকমত্য হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে হাতে নিলেন, খাওলা নিজেই সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। অতঃপর সকলেই একই কণ্ঠে কবিতার কোরাস গেয়ে শত্রুদের উপর আঘাত করলেন। বললেন, তুব্বা এবং হিমইয়ার গোত্রের কন্যা মোরা, কাফেরদের হত্যা করা আমাদের জন্য সওয়াবের কাজ। সুতরাং যুদ্ধে আমরা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হই। মনে রেখ আজ নিপাত তোমাদের অনিবার্য। রোমান বাহিনী মহিলাদের চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে ফেলে কিন্তু অকুতোভয় বীর মহিলারা শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ মারাত্মক আকার ধারণ করল। এদিকে হযরত খালিদ এবং হযরত জারার মহিলা বন্দিদের কথা জানতে পারলেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করে সৈনিকের একটি দল সেদিকে প্রেরণ করে দিলেন।

ক্ষিপ্ত গতি মুসলিম বাহিনী পেছন থেকে রোম বাহিনীর ওপর হামলা করে। মুসলিম বাহিনীর আল্লাহু আকবরের ধ্বনি আকাশ প্রকম্পিত এবং তীর বল্লম ও তলোয়ারের ঝলকানিতে কাফেরদল অস্ত্রসহ সবকিছু ফেলে পালিয়ে যায়। হযরত জারার (রাঃ) অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়ে রোম সেনাধ্যক্ষ পিটারকে তীরের আঘাতে তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

মহিলারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অলৌকিক সাহায্যের জন্য শোকর আদায় করেন। হযরত জারার তাঁর বোন খাওলার (রাঃ) সাক্ষাত পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হলেন।

মুসলিম বাহিনীর সাথে রোমীয়দের একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় সব ক'টি যুদ্ধেই ইসলামের এই অগ্নিকন্যা খাওলা (রাঃ) অংশগ্রহণ করেন। হযরত খাওলা, হিন্দা বিনতে উতবা এবং অন্যান্য মহিলারা যুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করতেন। রোমীয়রা মুসলমানদের সাথে সবক'টি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিরিয়া ত্যাগ করে। শত্রুবাহিনীর অনেক সিপাহী যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ হারায় অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়।

হযরত জারার এবং তাঁর বোন খাওলা (রাঃ) কখন মৃত্যু বরণ করেন তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে দামেশকের পূর্ব তোরণের বহিঃপার্শ্বে দু'টি কবর রয়েছে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। এর একটিতে হযরত জারার (রাঃ) অন্যটিকে ইসলামের অগ্নিকন্যা এবং কাফির মুশরিকদের আতঙ্ক হযরত খাওলা বিনতে আজুরকে (রাঃ) সমাধিস্থ করা হয়। কবর দু'টি দামেশকের বাবুল মাশরিকে অবস্থিত।

আবু জাহল তনয় মুজাহিদ ইকরিমা রা.-এর জীবনে অকল্পনীয় এক বিপ্লব

রাসূল (সাঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির পর মক্কার কোরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন হযরত ইকরিমা ইবনে আবু জাহল (রাঃ) মাত্র তিন বছরের ছোট শিশু। অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে বড় হলেন, যৌবনের দিনগুলো তাকে পরিণত করল পূর্ণ যুবকে। পাশাপাশি নানা গুণের প্রকাশও পেতে শুরু হল তার মাঝে। অল্প সময়েই তিনি সবার মাঝে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

সমগ্র মক্কার কোরাইশদের মাঝে ইকরিমা এবং তার পরিবার বংশ মর্যাদা এবং বিত্ত বৈভবে সবার চেয়ে আলাদা ছিলেন। রাসূল (সাঃ) মক্কার সমস্ত কোরাইশসহ হযরত ইকরিমা (রাঃ) এবং তার পরিবারকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। রাসূল (সাঃ) এর দাওয়াতে সাড়া দিলেন অনেকেই। কিন্তু শুধু পারলেন না তিনি। তাঁর সামনে বাধ সাধলো তাঁর পিতা, কিছুতেই সে ইসলাম গ্রহণ করতে দেবে না সর্বগুণের অধিকারী পুত্র ইকরিমাকে। আপনিকি জানেন, তাঁর পিতা কে? তাঁরপিতাই হল মক্কার সবচাইতে বড় অত্যাচারী নিপীড়ক আবু জাহল। কোরাইশদের শীর্ষস্থানীয় একজন নেতা। মুসলমানদেরকে সর্বাধিক কষ্টদানকারী ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে তার দেয়া কষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চাইলেন। পরীক্ষা হল, মুসলমানরা উত্তীর্ণ হলেন পূর্ণ সফলতা সহকারে। তার চক্রান্তের মাধ্যমে মোমেনদের বিশ্বাস যাচাই করতে চাইলেন। যাচাই হল। দেখলেন যে না, তাদের বিশ্বাসের জুড়ি হয় না। নিজের প্রভুর উপর তাদের বিশ্বাস পর্বতের মতই দৃঢ়। হযরত ইকরিমা ইবনে আবু জাহল শুরুতে তাঁর পিতার পথ ধরেই চললেন। চরম শত্রুতা শুরু করলেন রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে নানাভাবে নিপীড়ন করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর নিপীড়নের মাত্রা দেখে পিতা আবু জাহল মনে মনে খুবই আনন্দিত হল আর বলত, মুসলমানদেরকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য এবার আমার পুত্রই যথেষ্ট।

হিজরতের পর মুসলমান এবং মক্কার পৌত্তলিকদের মাঝে সর্বপ্রথম যে সম্মুখ যুদ্ধটি হয় সেটি বদরের যুদ্ধ নামে পরিচিতি। মুশরিক পক্ষে এ যুদ্ধের

প্রধান সেনাপতি ছিলো ইকরিমার পিতা আবু জাহল। যুদ্ধের দিন সেনাপতি আবু জাহল তার পূজনীয় প্রভু 'লাত' এবং 'উয্যার' শপথ করে বললো, মুহাম্মদকে বিনাশ না করে আমি আর এ রণাঙ্গণ ত্যাগ করছি না। এই বলে সে বদরের সন্নিকটেই ছাউনি গাড়ল। শুরু হল উট জবাই। নৃত্যগীতের ধ্বনি। জমে উঠল মদ বেহায়পনার উত্তপ্ত আসর। লাগাতার তিনদিন পুরোদমে চললো এ আসর। অবশেষে শুরু হল যুদ্ধ। সমর নায়ক স্বয়ং আবু জাহল। পুত্র ইকরিমা তার প্রধান সহায়ক। প্রাণপণে লড়ল আবু জাহল এবং তার বীরপুত্র ইকরিমা। কিন্তু বিধি বাম। চরম পরাজয় বরণ করতে হল তাদেরকে। প্রভু 'লাত' আর 'উয্যা' কোন কাজেই আসল না সেদিন। বদরের ময়দানে নির্মমভাবে নিহত হল আবু জাহল। পুত্র ইকরিমা দেখলো তার অহংকারী পিতা নিথর হয়ে পড়ে আছে রণাঙ্গণের এক প্রান্তে। মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত তীরগুলো তার শরীরে বিদ্ধ হয়ে এখনো যেন আক্রোশ ভরে রক্তপান করছে। ইকরিমা শুনতে পেয়েছিলেন তার পিতার সেই মরণ চিৎকারটি যারপর সে আর কোন শব্দ শুনতে পায়নি।

যুদ্ধ শেষে ইকরিমা মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। মুশরিকদের লাশগুলো পড়ে রইল রণাঙ্গণেই। পরাজয়ের গ্লানি ইকরিমা এবং তার সাথীদেরকে এতটাই অসার করে দিয়েছিল যে, তারা তাদের লাশগুলো সাথে করে মক্কায় নিয়ে যেতে পারল না। এমন কি সেনাপতি আবু জাহলের লাশকেও নয়। অবশেষে মুসলমানরা আবু জাহলসহ সমস্ত মৃতের লাশ একটি মৃত কূপে নিক্ষেপ করে বালুচাপা দিয়ে দিলেন।

বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকে ইসলামের সাথে ইকরিমার শত্রুতা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। একেত পূর্ব থেকেই দুশমনি রয়েছে, আর এবার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা মিলে ইকরিমাকে দারুণভাবে বিদ্বেষী করে তুললো। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রস্তুতি শুরু করলেন জান প্রাণ দিয়ে। তার সাথে এসে যোগ দিলো তারাও যাদের বাবা-ভাই নিহত হয়েছিল বদর প্রান্তরে। সকলে মিলে শপথ নিলো তারা তাদের স্বজনদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেই। অবশেষে সংঘঠিত হল উহুদের যুদ্ধ। ইকরিমাসহ মক্কার মুশরিকরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে উহুদের প্রান্তরে এসে সমবেত হল। হযরত ইকরিমা তার স্ত্রী উম্মে হাকীমকেও সাথে নিলেন। উম্মে হাকীমকে সাথে নিলেন রণৌদ্দীপক কবিতা পাঠ করার জন্য। অন্যান্য মেয়েলোকের সাথে ঢোল বাজিয়ে যোদ্ধাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। রণডংকা বাজিয়ে যোদ্ধা ঘোড়াগুলোকে রণাঙ্গনে জমিয়ে রাখার জন্য।

যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল। কোরাইশরা তাদের অশ্ব বাহিনীর ডান দিকে খালিদ ইবনে ওলীদ এবং বাম দিকে ইকরিমা ইবনে আবু জাহলকে নিযুক্ত করল। খালিদ ইবনে ওলীদ এবং ইকরিমা তারা উভয়েই অশ্ববাহিনী নিয়ে একযোগে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসলেন। ফলে মুসলমানদের পক্ষে তাদের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। মুসলমানরা বাধ্য হয়েই পিছু হটে গেলেন। ফলাফলে জয় নিশ্চিত হল মুশরিকদের পক্ষে। মুশরিকদের পক্ষে জয় নিশ্চিত হলে সেনাপতি আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বুঝতে পারলে ত? এবার আমরা বদরের প্রতিশোধ নিলাম।

৫ম হিজরিতে শুরু হর পরিখার যুদ্ধ। মক্কার মুশরিকরা সম্মিলিতভাবে মদীনা ঘেরাও করল। অবরোধ চললো দীর্ঘদিন। কিন্তু সামনাসামনি মুকাবেলা করার কোন জো নেই। কারণ, উভয় দলের মাঝে বিরাট পরিখার প্রতিবন্ধকতা। অবশেষে ইকরিমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি খুঁজে পরিখার একটি সংকীর্ণ স্থান বের করলেন। সুযোগ দেখে ক্ষিপ্ত ঘোড়াটি নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন ওপারে। তাকে দেখে আরও কয়েকজন অশ্বারোহী লাফিয়ে পার হল। মুলমানরা এ অবস্থা দেখে অসীম বিক্রমে আক্রমণ করলেন তাদের উপর। আক্রমণ তারা সামলাতে পারল না। নির্মমভাবে নিহত হল আমর নামের এক খোজা। আর ইকরিমা ইবনে আবু জাহল কোন রকম পালিয়ে বাঁচলেন।

৮ম হিজরীতে শুরু হল মক্কা বিজয়ের অভিযান। রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মক্কা পৌঁছে গেলো। মক্কার কোরাইশরা দেখল আজ মুহাম্মদের বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল এদেরকে আর বাধা দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের এ সিদ্ধান্তের ফলে রাসূল (সাঃ) মক্কাবাসীর উপর আক্রমণ না করার জন্য সাধারণ ঘোষণা করে দিলেন। অপরদিকে কোরাইশরা আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নিলেও ইকরিমা ইবনে আবু জাহল কোরাইশদের ছোট একটি দল নিয়ে মুসলমানদের পথ রোধ করার চেষ্টা করলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) পরিস্থিতি আশংকাজনক দেখে ছোট মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করলেন। মুসলমানদের আক্রমণের ফলে শত্রু পক্ষের বেশ কিছু লোক নিহত হলো। অন্যারা পালিয়ে গেলো। এদের মধ্যে সেনাপতি ইকরিমাও ছিলেন। এ আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার ফলে তার মধ্যে সীমাহীন ক্ষোভের সৃষ্টি হল। এদিকে মক্কা বিজয় হওয়াতে তার পক্ষে সেখানে অবস্থান করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। কারণ রাসূল (সাঃ) মক্কাবাসীর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও কিছু কিছু ব্যক্তিকে ক্ষমা করেননি। তাদের নাম নিয়ে

তিনি হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এও বলে রেখে ছিলেন যে, এদেরকে কাবার গিলাফে আশ্রয়রত অবস্থায় পেলেও যেন কতল করে দেয়া হয়। হযরত ইকরিমা এদেরই অন্তভূক্ত ছিলেন। তাই তিন চুপিসারে মক্কা থেকে এবং ইয়েমেনের পথে যাত্রা করলেন।

বিজয়ের পর হযরত ইকরিমা ইবনে আবু জাহলের স্ত্রী হযরত উম্মে হাকীম এবং হযরত হিন্দ বিনতে উতবা এরা উভয়েই আরো দশজন মহিলা সাথে নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলেন। উদ্দেশ্য, সবাইকে নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট বাইয়াত করা। এরা যখন রাসূল (সাঃ)-এর গৃহে পৌছলেন তখন রাসূলের কাছে তাঁর দুজন স্ত্রী ছিলেন। আর বসা ছিলেন তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা এবং আবদুল মোত্তালেব গোত্রের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। সর্বপ্রথম হিন্দ বিনতে উতবা কথা আরম্ভ করলেন। বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমি সেই মহান সত্তার শোকরিয়া আদায় করছি যিনি তাঁর মনোনীত ধর্মকে আজ বিজয় দান করেছেন। আপনার সাথে আমার রক্তের সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে বলছি, আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন। আল্লাহ আপনাকে কৃপা করবেন। আমি এ মুহূর্তে কায়মনোবাক্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম। অতঃপর মুখের উপর থেকে নেকাব উঁচিয়ে বললেন, হে রাসূল (সাঃ) আমি হিন্দ বিনতে উতবা। রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার আগমণ শুভ হোক। হিন্দ আবার বলতে লাগলেন, হে রাসূল (সাঃ) এ মুহূর্তের পূর্বে আপনার ঘরটির অবমাননা আমার একান্ত কামনা ছিল। কিন্তু এখন এর সম্মান বৃদ্ধি আমার সবচাইতে প্রিয় কাম্য বস্তু। রাসূল (সাঃ) তাঁর কথা শুনে বললেন, আল্লাহ তোমার সুমতিতে বরকত দিন।

এবার কথা বলতে আরম্ভ করলেন ইকরিমার স্ত্রী হযরত উম্মে হাকীম। তিনি শুরুতেই তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করলেন, অতঃপর বলতে লাগলেন, হে রাসূল (সাঃ)! ইকরিমা আমার স্বামী। সে আপনার হত্যার ভয়ে ইয়েমেনে পালিয়ে গিয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে নিরাপত্তা দিন। আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ করবেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, যাও আমি তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

হযরত উম্মে হাকীম রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে ইকরিমার নিরাপত্তা গ্রহণ করার পর সাথে সাথেই স্বামী ইকরিমার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রা করলেন ইয়েমেনের পথ ধরে। নিজের নিরাপত্তা এবং সহায়তার জন্যে সাথে নিলেন তাঁরই রোমীয় এক ভৃত্য। পথ চলতে লাগলেন তারা উভয়েই। রাস্তায়

এক জায়গায় এসে ভৃত্যটির নিয়ত খারাপ হয়ে গেল। সে উম্মে হাকীমকে একা পেয়ে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ফুঁসলাতে লাগলেন। উম্মে হাকীম ছিলেন খুবই সুচতুরা এবং উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না। তিনি ভাবলেন এ মুহূর্তে চট করে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না। তাই তিনি তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দিয়ে পথ এগুলো লাগলেন। অবশেষে যখন একটি জনবসতিতে পৌঁছলেন তখন তাদের কাছে তিনি সাহায্য চাইলেন এবং লোকজনকে দিয়ে তাঁকে বেঁধে ফেললেন। ভৃত্যটিকে তিনি এবার তাদের কাছে রেখে এবার একাকী পথ চলতে লাগলেন। একাই চলতে চলতে এক পর্যায়ে তিনি 'তেহামা' এলাকায় সমুদ্র তীরে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তিনি সাক্ষাৎ পেলেন স্বামীর। দেখতে পেলেন তার স্বামী এক মাঝির সাথে পারাপারের বিষয়ে কথা বলছে। তিনি যখন মাঝিকে বললেন, আমাকে পার করে দাও। মাঝি বলছে, তা করব বটে, তবে পূর্বে তোমাকে তোমার নিয়ত শুদ্ধ করে নিতে হবে। ইকরিমা বললেন, তা কিভাবে? মাঝি বললেন, তুমি বল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। ইকরিমা বললেন, আরে এ কথার কারণেই তো আমি মক্কা থেকে পালিয়ে এলাম। হযরত ইকরিমা আর মাঝি কথা বলছিলেন, এমন সময় হযরত উম্মে হাকীম সেখানে যেয়ে উপস্থিত হলেন। ইকরিমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার সাথী, আমি একজন লোকের নিকট থেকে এসেছি যিনি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পবিত্রতম। আমি তোমার জন্য তাঁর নিকট থেকে অভয়নামা নিয়ে এসেছি। তুমি এখান থেকে পালিয়ে নিজেকে ধ্বংস করো না। ইকরিমা বললেন, তুমি কি নিজে তার সাথে কথা বলেছো? তিনি বলরেন, নিশ্চয়ই, আমি স্বয়ং তাঁর সাথে তোমার ব্যাপারে কথা বলেছি। আমি তোমার জন্য নিরাপত্তা কামনা করেছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। উম্মে হাকীম যখন বারবার এ কথাগুলো বলতে লাগলেন তখন তিনি বিশ্বাস করলেন। এবার স্বামী ইকরিমাকে উম্মে হাকীম রোমীয় ক্রীতদাসের কথা খুলে বললেন। ইকরিমা ঘটনা শুনে প্রথমে পথে আটব ক্রীতদাসের কাছে গেলেন এবং তাকে হত্যা করলেন।

রাস্তায় এক জায়গায় ইকরিমা ও উম্মে হাকীম তাঁবু খাঁটিয়ে রাত্রি যাপন করলেন। এ সময় ইকরিমা স্ত্রীকে কাছে চাইলেন। স্ত্রী তাঁকে বাধা দিলেন কঠোরভাবে। বললেন, এ এখন হতে পারে না। কারণ আমি মুসলমান আর তুমি পৌত্তলিক। একথা শুনে ইকরিমা খুবই আশ্চর্য হলেন। বললেন, তাহলে তো দেখছি আমার আর তোমার মাঝে এক সাগরের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে!

ইকরিমা যখন মক্কায় পৌঁছলেন তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর আগমনের পূর্বেই সাহাবীদেরকে বললেন, অতিসত্ত্বর ইকরিমা ইবনে আবু জাহল ঈমানদার এবং আল্লাহর পথে সর্বস্ব বিসর্জনকারী হিসাবে তোমাদের নিকট এসে হাজির হবে। তোমরা কিন্তু তার বাবাকে গালি দেবে না, কারণ, মৃত ব্যক্তিকে গালি দিলে এতে তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনরা কষ্ট পায়। অপরদিকে গালিটি মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছায় না। রাসূল (সাঃ)-এর এ বার্তার কিছুক্ষণ পরই ইকরিমা, স্ত্রী উম্মে হাকীমসহ রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে এসে হাজির হলেন। রাসূল (সাঃ) তাকে দেখে সীমাহীন আনন্দিত হলেন, আবেগে উদ্বেলিত হয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তার কাছে। রাসূল (সাঃ) বসলেন নিজের বিছানায়। ইকরিমাকেও বসতে বললেন। কিন্তু ইকরিমা বসলেন না। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর সামনে। আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! উম্মে হাকীম বললো, আপনি নাকি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন? রাসূল (সাঃ) বললেন, সে সত্য বলেছে, অবশ্যই আমি তোমাকে পানাহ্ দিয়েছি। এখন থেকে তুমি নিরাপদ। ইকরিমা বললেন, হে রাসূল (সাঃ)! আপনি কি বিষয়ে আমাকে নির্দেশ দিতে চান? রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি নির্দেশ দিতে চাই, তুমি একথার সাক্ষী দিবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি মুহাম্মদ তাঁর বান্দা এবং রাসূল। তুমি নামায পড়বে, যাকাত দিবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে। এভাবে রাসূল (সাঃ) তাঁকে ইসলামের মৌলিক বিধানাবলী শিখিয়ে দিলেন। ইকরিমা বললেন, নিশ্চয়ই আপনি সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি। ইকরিমা আর বললেন, আল্লার শপথ! আপনি আমাকে দাওয়াত দেয়ার পূর্বেও আমাদের মাঝে সব চাইতে সত্যবাদী এবং পবিত্রতম ছিলেন। এই বলে ইকরিমা রাসূল (সাঃ)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন আর বলতে লাগলেন, আমি বলছি, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল (সাঃ)। অতঃপর তিনি বললেন, হে রাসূল (সাঃ) আমাকে কিছু কালেমা শিখিয়ে দিন যা আমি সর্বদা পাঠ করব। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি এ কালেমাটি শিখে নাও। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ইকরিমা বললেন, অতঃপর আমি কি বলব? রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহ তাআলা এবং উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি একজন মুসলমান, মুজাহিদ এবং খোদার পথে সর্বস্ব উৎসর্গকারী। হযরত ইকরিমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাই করলেন। রাসূল (সাঃ) হযরত ইকরিমার স্বীকারোক্তির পর

বললেন, ইকরিমা! আজকে যদি তুমি আমার কাছে এমন কোন জিনিসের আবেদন কর যা আমি অন্যকেও দিয়েছি, তাহলে তোমাকেও দিব। হযরত ইকরিমা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আপনার সাথে যত শত্রুতা করেছি, সেগুলো ক্ষমা করে দিন। আপনাকে যে আঘাতগুলো দিয়েছি, সেগুলো মার্জনা করে দিন। আপনার সামনে অথবা পশ্চাতে আপনার বিরুদ্ধে যা বলেছি, সেগুলো ক্ষমা করে দিন। রাসূল (সাঃ) তাঁর আবেদন শুনে বললেন, হে আমার প্রভু! ইকরিমা আমার সাথে যত শত্রুতা করেছে, সেগুলো তুমি ক্ষমা করে দাও। ইসলামের আলো নিবার্পণ করার জন্য সে যে অন্যায় প্রচেষ্টাগুলো করেছে, সেগুলো তুমি মার্জনা করে দাও। হে প্রভু! ইকরিমা আমার সামনে অথবা পশ্চাতে আমার বিরুদ্ধে যা বলেছে, সেগুলো তুমি ক্ষমা করে দাও।

রাসূল (সাঃ)-এর দোআ শুনে হযরত ইকরিমা (রাঃ) এর চেহারা চাঁদের ন্যায় আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে রাসূল আমার! খোদার শপথ করে বলছি, আল্লার পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য এ যাবত আমি যত ব্যয় করেছি এখন তাঁর পথে সাহায্যের জন্য তার দ্বিগুণ ব্যয় করব। ইসলামের বিরুদ্ধে এযাবত আমি যত যুদ্ধ করেছি এখন ইসলামের পক্ষে এর চেয়ে দ্বিগুণ জিহাদ করব।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত ইকরিমা (রাঃ)-এর জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। এখন তাঁর সমস্ত সময় অতিবাহিত হয় মসজিদ আর ইবাদতে। কোরআনের তেলাওয়াত যেন তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। মধুর কণ্ঠে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতেন। তেলাওয়াত করতে করতে তিনি আবেগ তরঙ্গায়িত হয়ে যেতেন। কোরআনকে উঠিয়ে চেহারার উপর রাখতেন। চোখের সাথে স্পর্শ করতেন, আর বলতেন, কিতাবু রাব্বী, আমার প্রভুর কিতাব। কালামু রাব্বী, আমার প্রভুর কালাম। এ সময় তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হত ঝরঝর করে।

হযরত ইকরিমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সাথে যেসব বিষয়ে ওয়াদা করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে তিনি পালন করে দেখিয়েছেন। যখনই মুসলমানরা কোন যুদ্ধের পথে রওয়ানা হতেন তিনি তৎক্ষণাত তাদের সাথে যোগ দিতেন। যখনই কোন অন্যায় কর্মের প্রতিবাদের পালা আসত তিনি সর্বাগ্রে থাকতেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তো তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা তো অতুলনীয়। বোধ করি তাঁর ইসলাম-পূর্বের গোটা জীবনের প্রায়শ্চিত্ত তিনি এ একটি যুদ্ধেই করে ফেলেছেন। গ্রীষ্মের দুপুরে চরম পিপাসার্ত ব্যক্তি যেভাবে শীতল পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেভাবে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু সৈন্যের উপর। প্রচন্ড বিক্রম নিয়ে তিনি আক্রমণ করলেন তাদের। শত্রুপক্ষও যখন দল বেঁধে পাল্টা

আক্রমণ করল তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন, কোষমুক্ত করলেন তরবারি। তাঁর আঘাতে অনেক রোমীয় সৈন্যই নরকে পৌঁছে গেল। হযরত ইকরিমা (রাঃ)-এর এ অবস্থা দেখে সেনাপতি খালিদ ইবনে ওলীদ ত্রস্ত পদে তাঁর দিকে দৌড়ালেন, বললেন, ইকরিমা! এমনটি করবেন না। আপনি নিহত হলে মুসলমানদের জন্য তা বিপজ্জনক হবে। ইকরিমা (রাঃ) বললেন, সেনাপতি! আপনি সরে যান, আমাকে বাধা দিবেন না। আপনি ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার চেয়ে অগ্রগামী। রাসূল (সাঃ)-এর সান্নিধ্যও আপনি অর্জন করেছেন আমার চেয়ে বেশি। আপনি যখন রাসূলের সাহাবী তখন আমি আর আমার পিতা তাঁর ঘোর দুশমন। আমাকে অতীত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন। অনেক যুদ্ধেই আমি রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়েছি আর আজ আমি রোমক বাহিনীর ভয়ে পিছিয়ে যাব? এ আমার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি মুসলমানদের মাঝে ঘোষণা দিলেন যে, কে আছ তোমরা আমার হাতে মৃত্যুর শপথ নিবে? হযরত ইকরিমা (রাঃ)-এর আহ্বান শুনে তাঁর চাচা হারিস ইবনে হিশাম এবং যিরার ইবনে আযওয়ার সহ মোট চারশত মুসলমান তাঁর হাতে আমৃত্যু লড়াইয়ের শপথ নিলেন।

হযরত ইকরিমা (রাঃ) এদেরকে নিয়ে সেনাপতি খালিদ ইবনে ওলীদের তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের উপর তীব্রভাবে আক্রমণ চালালেন। অবশেষে যুদ্ধ সমাপ্ত হল। বিজয় হল মুসলমানদের। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল হযরত ইকরিমা (রাঃ) অপর দুজন মুসলিম বীর যোদ্ধার সাথে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় রণাঙ্গনে পড়ে রয়েছেন। এরা হলেন হারিস ইবনে হিশাম এবং আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআ। হারেস ইবনে হিশাম পিপাসার্ত হলেন, পানি চাইলেন পান করার জন্য। একজন সৈনিক পানি নিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। তিনি পানি পান করবেন, এমন সময় দেখলেন ইকরিমা (রাঃ) সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন পানির দিকে। হারিস বললেন, আগে তাকে পান করতে দিন। সেবক সৈনিক পানি নিয়ে এগিয়ে গেলেন ইকরিমা (রাঃ)-এর কাছে। তিনি যখন পান করতে যাবেন দেখলেন হযরত আইয়াশ (রাঃ) তাকিয়ে আছেন পাত্রের দিকে। এ দেখে ইকরিমা পান করলেন না। বললেন, আইয়াশকে আগে পান করাও। সৈনিক দ্রুত ছুটে গেলেন আইয়াশের কাছে। কিন্তু ততক্ষণে হযরত আইয়াশের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে গেছে। সৈনিক কিছু বুঝতে না পেরে দ্রুত ফিরে এলেন ইকরিমার নিকট। কিন্তু তিনিও যে আর বেঁচে নেই। ভাবলেন, অন্তত হারিসকে পান করানো যায় কিনা। দৌড়ে গেলেন হারিসের নিকট। কিন্তু হায়! পানি পাত্রেই রয়ে গেল। তিনি অনেক পূর্বেই প্রভুর প্রিয় হয়ে গিয়েছেন। কাওসার নির্ঝরিণীর শীতল পানি দ্বারাই এবার তারা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবেন।

সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতেহ

কনষ্টান্টিনোপলে ইসলামী বিজয় নিশান

"গোটা বিশ্ব যদি হয় একটি সাম্রাজ্য, তাহলে সে সাম্রাজ্যের সুন্দরতম রাজধানীটি হতে পারে কনষ্টান্টিনোপোল"-এ মন্তব্যটি করেছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

আরবরা বলে 'কুসতুনতিনিয়া'। এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গমস্থল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি আজকের ইস্তাম্বুল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রোমক শাসক কনষ্টানটেইনের নামে এই ঐতিহাসিক নগরীটির নাম। ইসলামী বিজয় সূচিত হওয়ার পর এর নাম রাখা হয় ইসলামপোল। পরবর্তী সময়ে এ নামটি বিকৃত হয়ে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত এসে গড়িয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে অনেক মনীষীর নামের পেছনেই দেখা যায় "ইসলামবোলী"। ইসলামপোলে জন্মগ্রহণকারী আরব ও তুর্কী মনীষীদের নামেই দেখা যায় এ শব্দটি।

প্রাকৃতিকভাবেই অত্যন্ত সুরক্ষিত এ নগরীর প্রতিরক্ষা তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ছিলো খুব মজবুত ও নিশ্ছিদ্র।

পূর্ব দিকে বোসফোরাস প্রণালী, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক তার ঘিরে রেখেছে মর্মর সাগর। এর উত্তর-পূর্ব দিকে প্রহরায় রয়েছে স্বর্ণ শিং উপসাগর। আরবীতে বলে "আল-করনুয যাহবী", Golden Horn নামে যা সমধিক পরিচিত। গোল্ডেন হর্ন জুড়ে বাধা রয়েছে একটি প্রকাণ্ড লৌহ শিকল। এটি অতিক্রম করে কোন জলযানই নগরীর সিংহদ্বারে পৌছুতে পারে না।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গর্বের ধন এ রাজধানী শহরটির চারদিকে পানির বেষ্টনী ছাড়াও এর উপকূল জুড়ে আছে প্রকাণ্ড সব পাঁচিল। চল্লিশ ফুট উঁচু নগর পাচিলের মাঝে মাঝে রয়েছে ষাট ফুট উঁচু বুরুজ। এক বুরুজ থেকে আরেক বুরুজের দূরত্ব প্রায় ১৮০ ফুটের মতো। এ হলো কনষ্টান্টিনোপোলের নগর রক্ষা পাঁচিলের ভেতরভাগ। এর আরো সামনে রয়েছে অন্য আরেকটি ছোট্ট দেয়াল। পঁচিশ ফুট উঁচু এ প্রাচীরের মাঝেও ছিলো ভেতরের পাঁচিলের মতো অনেক অনেক বুরুজ। বহিপার্শ্বের প্রাচীরে ছিল অনেকগুলো ফটক।

ইতিহাসের সর্বাধিক সুরক্ষিত এ রাজধানীর প্রাকৃতিক সুরক্ষা ও ভৌগোলিক প্রতিরক্ষা সুবিধায় সমৃদ্ধ অবস্থানের পাশাপাশি ছিলো যোগ্য ও শৌর্যবান রোমান রাজকীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী।

ইসলামী বিজয়াভিযান গোটা পৃথিবীর পরিচিত ও আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে ততদিনে শুধু পরিচালিতই হয়নি বরং পৃথিবীর অর্ধেকাংশ বা এক কথায় সভ্য পৃথিবীর পুরোটাই ততদিনে ইসলামী খেলাফতের আওতায় এসে গেছে। অতলান্তিকের অথৈ জলরাশি বিধৌত দূর প্রতীচ্যের শেষপ্রান্ত থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত। অন্যদিকে সাইবেরিয়ার হিমাঞ্চল থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ইসলামী বিজয়ের হিলালী পতাকা তখন সগৌরবে উড্ডীন।

কিন্তু হযরত সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে বার বার আক্রমণ পরিচালনা সত্ত্বেও রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপোল এখনো দুর্জয়-দুর্লংঘই রয়ে গেছে।

অথচ হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের জন্য শুভসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন যে, কুসতুনতিনিয়া মুসলমানদের পদানত হবেই। কবে আসবে সে সুদিন? কোন সে ভাগ্যবান মুসলিম সেনাপতি যার পরাক্রান্ত আক্রমণে বিজিত হবে মুসলিম উম্মাহর বহু প্রতীক্ষিত সেই ভূখন্ড। যার ওপর আক্রমণ করেও বিজয় দেখে যেতে পারেননি ইসলামের পয়লা সৈন্যবাহিনী হযরত সাহাবায়ে কেরাম। যে নগরীর দুর্লংঘ প্রাচীরের পাদভূমিতে ঘুমিয়ে আছেন মদীনার সেনাদলের সাহসী ও উৎসর্গীত প্রাণ সদস্য, পাক মদীনায় হুযূর (সা.)-এর মেযবান হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)।

খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে শুরু করে উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয় যুগ এবং উসমানী খেলাফাতের একাংশ পর্যন্ত বহুবার মুসলমানরা এ নগরীর ওপর সৈন্যাভিযান পরিচালনা করেও বার বার ব্যর্থ হওয়ার পর উসমানী বংশীয় এক দিগ্বিজয়ী বীর মুহাম্মদ আল-ফাতেহ-এর হাতেই পদানত হয় এ নগরী।

ইস্তাম্বুল নগরীর চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও দূরবর্তী দেশ বহু শতাব্দী আগেই মুসলিম দিগ্বিজয়ী বীর সৈনিকদের দ্বারা বিজিত হয়ে গেছে। গোটা আরব উপদ্বীপ, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ, গোটা আফ্রিকা, পারস্য সাম্রাজ্য, সিন্ধু, মধ্য এশিয়া, ইউরোপীয় ভূখণ্ড স্পেনসহ আরো এলাকা তখন মুসলমানদের হাতে। কিন্তু কুস্‌তুনতিনিয়া সম্পর্কে আল্লাহর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী তখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

সবদিক ভেবে-চিন্তে নবতর উৎসাহ ও উদ্যোগ বুঝে নিয়ে আর বজ্র কঠিন শপথ ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কনষ্টান্টিনোপলের দ্বারে আঘাত হানতে উদ্যত হলেন উসমানী বীর মুহাম্মদ। ইতিহাস যাকে স্মরণ করে আল-ফাতেহ হিসেবে। বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও হিদায়েতের সূর্য যখন মধ্য গগনে, গোটা মানব জাতি

এর আলোকরশ্মিতে যখন আপ্লুত, তখন যেসব পাপিষ্ঠ আর ভণ্ড একটা মানব গোষ্ঠীকে এ আলো থেকে বঞ্চিত রেখে চিরদিন লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের শিকার বানিয়ে রাখতে চায়, পরকালীন জীবনে তাদের জ্বালাতে চায় জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে। শাসনক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের লোভে এরা সত্যকে অস্বীকার করে। ইসলামী জীবনব্যবস্থার সার্বজনীন দাওয়াতকে এরা প্রত্যাখ্যান করে। দাওয়াতী কাফেলার অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে আল্লাহর প্রজ্বলিত আলো ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। তাদের ঔদ্ধত্য আর গর্বকে খর্ব করে আল্লাহর আওয়াজকে বুলন্দ করার জন্য সর্বশক্তিতে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে লড়াই চালিয়ে যাওয়া বিপ্লবী কাফেলার একজন সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে মুহাম্মদ আল-ফাতেহ কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

এমনিতেই উসমানী খেলাফতের সাথে কৃত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে কনষ্টান্টিনোপলের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানো অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। তদুপরি নিজ পূর্বপুরুষদের 'কুস্তুনতিনিয়া বিজয়ের' আজীবন লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে উসমানী খেলাফতের ভেতরে এ গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডটি শামিল করে এশিয়া ও ইউরোপের মিলনক্ষেত্রে ইসলামী পতাকা উড়ানোর স্বপ্নে মুহাম্মদ আল-ফাতেহ তখন বিভোর। কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে মুহাম্মদ আল-ফাতেহ প্রথমেই এ ঐতিহাসিক নগরীটির সাথে সারা বিশ্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এছাড়া গুপ্তচর পাঠিয়ে নগরীর সুরক্ষা প্রাচীরের সুবিধাজনক স্থান এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসম্পন্ন এলাকাগুলো সম্পর্কে বাস্তব তথ্য লাভ করলেন তিনি। পাশাপাশি তদানীন্তন বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট ও অত্যাধুনিক কামানগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার মতো পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়েও তিনি বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ দিলেন।

তুর্কী সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গসমূহের দায়িত্বশীল সেনাপতি ফিরোজ আগাকে তিনি নির্দেশ দিলেন, তুর্কী পানি সীমার উপর দিয়ে কোন বিদেশী জাহাজকেই যেন কষ্টান্টিনোপলের দিকে বিনা তল্লাশিতে যেতে না দেয়া হয়। আর কোন জাহাজ যদি তুর্কী সেনাদের নির্দেশ অমান্য করে, তবে গোলাবর্ষণ করে তা যেন ডুবিয়ে দেয়া হয়।

১৪৫২ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে আগস্ট মুহাম্মদ আল-ফাতেহ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে কনষ্টান্টিনোপলের দিকে রওয়ানা করলেন। কিন্তু না, তিনি আক্রমণ করলেন না। আক্রমণ না করেই তিনদিন পর গোটা

সৈন্যবাহিনীসহ তিনি ফিরে এলেন। এতে তার দুটো উদ্দেশ্য ছিল। এক. মুসলিম বাহিনী প্রতিটি জানবায সদস্যকেই তিনি অপরাজেয় নগরীর দুর্লংঘ পাঁচিল এবং শত্রুসেনাদের প্রতিরক্ষা ব্যুহ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিলেন। দুই. মুসলিম বাহিনীর অভিযানে খৃস্টান জগতের প্রতিক্রিয়া কি? এটাও ছিল মুহাম্মদ ফাতেহ-এর দেখার বিষয়।

সর্বোপরি এ ধরনের অভিযানে শত্রুসেনাদের মনে এক ধরনের সংশয় সৃষ্টি করা যায়। যেমন রোমক সৈন্যবাহিনী এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, মুহাম্মদ আল-ফাতেহ অবশ্যই কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণ করবে। কিন্তু তার এভাবে ফিরে যাওয়ার ওরা বুঝে উঠতে পারছিলো না যে, সত্যিই কি মুহাম্মদ আক্রমণ করবে না, শুধু খৃস্টানদের ভয় দেখানোই তার উদ্দেশ্য।

এমনি মুহূর্তে শীতের মওসুম এসে যাওয়ায় রোমকরা মনে করলো মুসলমানরা এ বৈরী মওসুমে যুদ্ধ বাধানোর মাঝে যেসব আরব যোদ্ধা রয়েছেন, তুর্কী অঞ্চলের শীত সহ্য করা তাদের পক্ষে কঠিন। অতএব, রোমান শাসকদের পক্ষ থেকে দূত পাঠানো হল। যুদ্ধ আপাততঃ স্থগিত রেখে শান্তিপূর্ণভাবে শীত কাটানোর প্রস্তাব নিয়ে যখন মুহাম্মদ আল-ফাতেহ-এর নিকট রোমান দূত এসে পৌঁছলো, তিনি তখন এক কথায় উত্তর দিলেন তোমাদের সম্রাট যখন যুদ্ধকে এতই ভয় পায়, তবে বলে দাও বিনা যুদ্ধেই সে কনষ্টান্টিনোপল আমার হাতে অর্পণ করুক।'

এ জবাব যখন রোমান সম্রাটের কানে পৌঁছলো, তিনি তখন খুব ভালো করেই বুঝে নিলেন যে, মুহাম্মদ আল-ফাতেহ দমবার পাত্র নন। এছাড়া শীতের দোহাই দিয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে চুপি চুপি প্রস্তুতি নেয়ার ফন্দিও তাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে।

মুহাম্মদ আল-ফাতেহ-এর দৃঢ় মনোভাব দেখে কনষ্টন্টিনোপলের শাসকরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। নগরীর রক্ষা প্রাচীরের সব ক'টি দরোজা সীল করে দেয়া হলো। তাদের শাসনাধীন এলাকারী বসবাসকারী উসমানী খেলাফতের প্রজাদের বানানো হলো জিম্মি। নগর সুরক্ষা পাঁচিল, বুরুজ আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘষামাজা শুরু হয়ে গেলো। সম্পূর্ণ নিপুন নিখুঁত রণপ্রস্তুতি। উসমানী খেলাফতের সেনা ও নৌবাহিনী ছিল সমকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও নজীরবিহীন সমরশক্তি। মুসলমানদের নৌশক্তির প্রতাপ ও প্রতিপত্তিতে গোটা ইউরোপ ছিল প্রকম্পিত।

নগরীর মাঝখানে গোল্ডেন হর্ণ নামের যে প্রণালীটি রয়েছে, এর প্রবেশমুখে রোমান সমরবিদরা স্থাপন করলেন এক বিশাল লৌহশিকল। যে কোন নৌযানের

গতিরোধে সক্ষম এ জিনজিরের কারণে উসমানী নৌবহর নগরীর উপকূলে ভিড়তে পারবে না কোনদিন।

কনষ্টান্টিনোপলের পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্য চেয়ে পত্র দেয়া হলো সবক'টি পশ্চিমা খৃস্টান রাজ্যে। বলা হলো, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গির্জাগুলোর মধ্যকার চিরবিদ্বেষ ও শত্রুতা দূর করে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা ফ্লোরেন্স উদ্যোগে উল্লেখ ছিলো তা সর্বান্তকরণে মেনে নিলেন প্রাচ্যের খৃস্টান শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু এতে বাধ সাধলো গির্জাধিপতি পাদ্রীসমাজ। তারা কিছুতেই পশ্চিমা ধর্মযাজকদের সাথে আপস করবে না। আর ইউরোপীয় গির্জা-সম্রাটরাও কম যান না। অতএব আশানুরূপ সামরিক সাহায্য পাওয়া যায়নি। মাত্র সাতশ সৈন্যের একটি দল নিয়ে ইউরোপের প্রতিনিধিত্ব করতে এলেন সেনাপতি জন জোষ্টনিয়ান। দেশীয় সৈন্য ও নাগরিকদের মনে সাহস ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি জাগানোর জন্য রোমান শাসকরা এ ছোট্ট সেনাদলটিকেই মহাধুমধামে অভ্যর্থনা জানালেন এবং সেনাপতি জনকে সম্মিলিত সামরিক শক্তির প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হলো। এছাড়া ইউরোপ থেকে আগত সাত'শ সৈন্যকে নিয়োজিত করা হলো নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে।

এদিকে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিলেন। দীর্ঘ তিন মাসব্যাপী চললো কামান নির্মাণকাজ। বিদেশী প্রকৌশলীদের সহায়তায় নির্মিত হলো তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও দূরপাল্লার কামান। স্থানীয় পরিমাপ হিসেবে এ কামানের এক একটি গোলার ওজন ছিল প্রায় ৩ টন। আর একটি কামানের ওজন ৭০০০ টন। এ কামানটিকে টেনে নিতো একশ' বলদ। আর একশ' শক্তিশালী মজদুর পেছন থেকে ঠেলতো সে কামানবাহী শকট। সুদীর্ঘ দু'মাস সময়ে এসব কামান নিয়ে নগরীর পাচিলের দিকে তাক করে জুৎসই জায়গায় স্থাপন করা হলো। সবচেয়ে বড় কামানটিকে বলা হতো 'সুলতানী কামান'। উসমানী সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিই ছিল তখনকার বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ ও অত্যাধুনিক।

১৪৫৩ খৃস্টাব্দের ৩০শে মার্চের মধ্যে মুহাম্মদ আল-ফাতেহ তার প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। আশপাশের খৃস্টান রাজ্যগুলোর অসহযোগিতার সুযোগে মুহাম্মদ আল-ফাতেহ অতি সহজেই নগরীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়ে সেখানে তার সামরিক অবস্থান মজবুত করার সুযোগ পান এবং কুসতুনতিনিয়াকে ঘিরে যে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যুহ রয়েছে তার ওপরও মুহাম্মদ আল-ফাতেহ-এর দখল অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও সাজসরঞ্জামসহ মুসলিম বাহিনী চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

পবিত্র জুমার দিন। ৬ এপ্রিল ১৪৫৩। মুহাম্মদ আল-ফাতেহ কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। নগরীর সুরক্ষা পাচিলের সন্নিকটে তার বিশাল বাহিনীর সামনে প্রদত্ত খুতবায় সুলতান ফ়াতেহ কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও মুজাহিদদের দায়িত্ব ও প্রতিদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে কুসতুনতিনিয়া বিজয় প্রসংগে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ ও ভবিষদ্বাণী সম্বলিত হাদীসের উল্লেখ করে মুসলিম বাহিনীকে উৎসাহিত করেন। মুহাম্মদ আল-ফাতেহ তার সৈন্যবাহিনীকে মায়মানা (ডান) মায়সারা (বাম) ও ক্বলব (মধ্য) এ তিন ভাগে বিভক্তি করেন। মায়মানা বেগের নেতৃত্বে মর্মর সাগর দিয়ে অগ্রসর হয়। করা জা পাশার নেতৃত্বে মায়সারা গ্রুপ গোল্ডেন হর্ণ বন্দরে নেমে আদরানা হয়ে নগর প্রাচীরের দিকে এগিয়ে চলে।

ক্বলব গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং সুলতান মুহাম্মদ-ফাতেহ। নগর রক্ষা প্রচীরের ঠিক মধ্যভাগ আক্রমণের উদ্দেশ্যে ক্বলব গ্রুপ আগে বাড়বে। এ গ্রুপের মধ্যভাগে অবস্থান করে সুলতান ফাতেহ গোটা যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করবেন। তবে সেনাবাহিনীর ভিন্ন তিনটি গ্রুপের আঞ্চলিক কমান্ড স্ব স্ব গ্রুপের সেনাপতির হাতেই থাকবে। স্বাধীনভাবে তারা যুদ্ধ পলিসি নির্ধারণ করবেন। তবে মূল পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ক্বলব গ্রুপের সেনাপ্রধান।

গোটা শহর বেষ্টনকারী প্রাচীরের চারপাশে ইসলামী মুজাহিদ বাহিনী বিভিন্ন পাল্লার কামান সংস্থাপন করার পর সুলতানী কামানটি তাক করা হলো নগরীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ দ্বার 'রোমানোস তোরণ'-এর দিকে। পরবর্তী সময় এ দুয়ারটি 'কামান তোরণ হিসেবে খ্যাত হয়।

অসংখ্য উসমানী রণতরী গোটা মর্মর সাগরে ছড়িয়ে পড়ে এবং যেকোন নৌযানে তল্লাশি চালিয়ে শত্রুসৈন্যের সম্ভাব্য সকল সাহায্য-সহযোগিতা লাভের পথ বন্ধ করে দেয়। সম্রাট কনষ্টানটেইন প্রাচীরের ভেতরদিকে অবরোধকারী ইসলামী বাহিনীর দুই গ্রুপের ঠিক মাঝামাঝি একটি নিরাপদ স্থানে তার তাঁবু স্থাপন করেন। সংগে সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনীর প্রধান জোষ্টিনিয়ান।'

এক পর্যায়ে উসমানীয় মুসলিম বাহিনী কামান হামলা শুরু করে। দিনরাত অবিরাম চলতে থাকে গোলাবর্ষণ। কনষ্টান্টিনোপল নগরীর দুর্লংঘ সুরক্ষা প্রাচীর কেঁপে কেঁপে উঠে। ভীষণ শব্দে আতংকিত হয় খৃস্টান জনগোষ্ঠী। অসম সাহসী, চির নির্ভীক, মরণজয়ী মুসলিম বাহিনী পরাক্রমশালী তরুণ বীর মুহাম্মদ আল-ফাতেহ-এর নেতৃত্বে অবরোধ করেছে খৃস্টান নগরী। অত্যাধুনিক কামানের গোলার প্রবল বর্ষণে গোটা নগরীময় ছড়িয়ে পড়েছে ভয় ভীতি, শংকা ও ত্রাস।

চির অপরাজেয় কনস্টান্টিনোপল এবার দখল করতেই হবে, এই হলো মুসলিম বাহিনীর মনোভাব। আর খৃস্টান বাহিনীও জীবন বাজি রেখে প্রতিহত করছে সুরক্ষিত নগরী। কারণ, তাদের এই ঘাঁটি হাতছাড়া হলে গোটা ইউরোপের মাটি উসমানীয়দের ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হওয়া থেকে আর কেউ ফেরাতে পারবে না।

অতএব উভয় সৈন্যই তুমুল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো। কেহ কারে নাহি পারে, সমানে সমান' অবস্থা। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সাথে সাথেই তা ঠিক করে নেয় খৃস্টান বাহিনী। দুই নৌশক্তির হামলা-পাল্টা হামলায় অশান্ত হয়ে উঠে গোটা মর্মর সাগর ও বোসফরাস প্রণালী অঞ্চল। গোল্ডেন হর্ণ বন্দরের প্রবেশপথে স্থাপিত শিকল বন্ধন অতিক্রম করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলিম বাহিনী বার বার ব্যর্থ হচ্ছিলো। রোমান ও ইতালীয় রণতরীর গোলার আঘাতে লৌহ শিকলের কাছেই ভিড়তে সক্ষম হচ্ছিলো না মুসলমানরা। জলে স্থলে চলছে তুমুল লড়াই। শেষ না হওয়া এক চরম যুদ্ধ।

এমনি পরিস্থিতিতে মহান বিজয়ী বীর মুহাম্মদ ফাতেহ-এর মাথায় খেললো এক নতুন বুদ্ধি। বিস্ময়কর অভূতপূর্ব এক পরিকল্পনা। লৌহ শিকল না ভেঙ্গেই তিনি নৌবহর গোল্ডেন হর্ণে ঢুকাতে চান। জলপথে নয় স্থলপথে বোসফরাস প্রণালী থেকে গোটা নৌবহরকে টেনে নিয়ে নামানো হবে গোল্ডেন হর্ণের বুক বরাবর পানিতে।

প্রবেশ পথের লৌহ শিকল প্রহরীরা টেরও পাবে না যে, তাদের পার্শ্ববর্তী যমীন দিয়ে মুসলিম নৌবহর হেঁটে চলে গেছে নগরীর সিংহদ্বার প্রধান নৌবন্দরে।

কাজ শুরু হয়ে গেলো। এক রাতের মধ্যে ৭০টি বিশালকায় যুদ্ধ জাহাজ মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল মুসলিম সেনারা দীর্ঘ ছয় মাইল পথ। প্রথমে জাহাজ পরিমাণ মাটিকে ঘষেমেজে সমান করে তৈরি করা হলো ছয় মাইল দীর্ঘ মসৃণ পথ। গোটা পথময় বিছানো হলো কাঠের তক্তা। তেল ও পশুর চর্বি মেখে তক্তাগুলো পিচ্ছিল করে এর ওপর দিয়ে হাজার হাজার মুজাহিদ টেনে নিয়ে গেলেন গোটা নৌবহর। তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা মহান সেনানায়ক মুহাম্মদ ফাতেহ-এর নির্দেশে তারা আগুনেও ঝাপ দিতে পারেন নির্দ্বিধায়। নিঃশংক চিত্তে লাফিয়ে পড়তে পারেন উত্তাল সাগর তরঙ্গে।

২২শে এপ্রিল (১৪৫৩) প্রভাতে কনস্টান্টিনোপলবাসীর ঘুম ভাঙ্গলো মুসলিম নৌবাহিনীর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে। গোল্ডেন হর্ণ সমুদ্র বন্দরে নেমে ওরা

আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তাকবিরের আওয়াজ তুলছিলেন। অভাবনীয় কল্পনাতীত এ বিস্ময়কর ঘটনায় গোটা খৃষ্টান জগতের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেলেও রোমান বাহিনী মরণপণ লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলো পূর্ণ উদ্যমে। জলে-স্থলে, নগরীর চারিধারে চলতে লাগলো অবরোধ বনাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ।

দীর্ঘমেয়াদি অবরোধে কনষ্টান্টিনোপলের নাগরিক জীবনে চরম হতাশা ও অভাব দেখা দেয়া শুরু হলে মুহাম্মদ ফাতেহ্ চূড়ান্ত আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে সমুদ্রপথের লৌহ শিকল মুসলিম বাহিনীর দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে শত্রু প্রভাবমুক্ত হয়। মুসলিম বাহিনী সাগর বক্ষে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নেয়। কামানের প্রচণ্ড গোলা বর্ষণে নগর রক্ষী প্রাচীরে তিনটি বড় ধরনের ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। এতে শত্রু বাহিনীর মনোবল চূড়ান্তভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

যুদ্ধের এহেন পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ আল-ফাতেহ্ যুদ্ধের পরিকল্পনার শেষ অংশ লিখিত আকারে, সচিত্র পথনির্দেশনা ও ম্যাপসহ প্রতিটি গ্রুপের সেনাপতির নিকট প্রেরণ করেন এবং উপস্থিত সৈন্যদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ ব্রিফিং প্রদান করেন। যার লিখিত কপি প্রতিটি সেনা ইউনিটে প্রেরণ করা হয়। শেষ ব্রিফিং-এ মহান সিপাহসালার বলেনঃ বিজয়ের প্রধান লক্ষ্যবস্তু থাকবে ইসলামী আদর্শের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত থেকে নিরহংকার মনে, বিনয়াবনত চিত্তে প্রবেশ করতে হবে বিজিত নগরীতে। কোন ধর্মীয় উপাসনালয় বা গির্জা ভাঙ্গা যাবে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী ও শান্তিকামী নিরস্ত্র নাগরিকদের হয়রানি করা চলবে না। সমস্ত গ্রুপের সেনাপতিদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে আল-ফাতেহ্ তার পরিকল্পনা খুলে বলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে কিছু নসীহত করেন।

২৯ শে মে (১৪৫৩) মঙ্গলবার দুপুর একটায় মুসলিম সেনা ও নৌবাহিনী একযোগে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। কনস্টান্টিনোপলের প্রাণকেন্দ্র লিকোস উপত্যকায় জোরদার আক্রমণ পরিচালিত হয়। চূড়ান্ত লড়াইয়ে সুলতান তাঁর সৈন্যবাহিনীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন।

১। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও শিক্ষানবীশ নওজোয়ান সৈন্য।

২। আনাদোল বাহিনী।

৩। এনকেশারী বাহিনী।

প্রথমতঃ তুলনামূলক কম শিক্ষিত ও হালকা অস্ত্রধারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গোটা নগরীর পাঁচিল ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়। তীর নিক্ষেপের আওতা পরিমাণ দূরে থেকে এ বাহিনী তীর, বর্শা ও প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে, বৃষ্টির মতো এগুলো বর্ষিত হতে থাকে পাঁচিল রক্ষী বাহিনীর ওপর। পাশাপাশি কামানগুলো গর্জে উঠে বিকট শব্দে। গোলার আঘাতে কেঁপে উঠে প্রাচীর ঘেরা কনষ্টান্টিনোপল। তীর, বর্শা, পাথর আর গোলার অবিরাম বর্ষণের ভেতর দিয়ে একদল জানবায মুজাহিদ দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি লাগায় প্রাচীর গাত্রে। কিন্তু না, নগর রক্ষীবাহিনী সিঁড়িগুলো উল্টে ফেলে দেয়। রশির মাথায় লাগানো হুক খুলে ফেলে দেয় নীচে। কোন মুজাহিদ যদি প্রাচীরে চড়তে শুরু করে, তীর আর বর্শা মেরে তাকে নীচে ফেলে দেয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ এ হামলা চালানোর এক পর্যায়ে সুলতান মুজাহিদদের যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এতে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও সন্ত্রস্ত রোমান সৈন্যরা হর্ষধ্বনি করে আনন্দ প্রকাশ করে। তারা মনে করে যে, মুসলমানরা প্রাচীরে সিঁড়ি লাগিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়ে এখন বোধ হয় সাহস হারিয়ে ফেলেছে। এক মুহূর্তের মধ্যে তীর, বর্শ, পাথর, কামান সব বন্ধ করে দেয়া হয়। সুলতানের নির্দেশে সেচ্ছাসেবক বাহিনী পিছু হঠতে শুরু করে। খৃস্টান সেনারা এতে আরো খুশী হয়। ভাবে, মুসলমানরা হয়ত নিরাশ হয়ে পালাচ্ছে। রোমান সেনাদের এখন আনন্দ আর ক্লান্তি দুটোই অনুভূত হচ্ছে। গোটা শত্রু শিবিরে একটা আয়েশী ভাব আর অবসন্নতার আমেজ যখন সুস্পষ্ট, তখন মুহাম্মদ ফাতেহ-এর একটি মাত্র ইশারায় আনাদোল বাহিনী আগে বেড়ে গিয়ে তীর, বর্শা আর পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। আগের আনাড়ী সেচ্ছাসেবী বাহিনীর তীর-বর্শার চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী ছিল এবারকার তীরবৃষ্টি। আর গত সময়ের হামলার কালে আনাদোল বাহিনী বিশ্রামে থাকায় তারা পূর্ণ উদ্দ্যমে, সম্পূর্ণ সতেজ মনে আক্রমণ চালাচ্ছিলো শ্রান্ত-ক্লান্ত, ঈষৎ আনন্দিত ও ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব খৃস্টান বাহিনীর ওপর। দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে এবার স্থলভাগের কামানগুলো থেকে। একই সাথে গোলা ছুড়তে শুরু করেছে আশপাশের নৌবহরগুলোতে লাগানো দূরপাল্লার কামানগুলো। জল ও স্থলভাগের কামান ও দুর্ধর্ষ আনাদোল বাহিনীর নামজাদা তীরন্দায ও নেযাহবাজদের সর্বগ্রাসী আক্রমণে গোটা রোমান সৈন্য বাহিনী যখন একেবারে কিংকর্তব্যবিমুঢ়, তখন উসমানী সেনাবাহিনীর সর্বাধিক অভিজ্ঞ, সাহসী ও পারদর্শী সেনাদল এনকেশারী বাহিনী চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় প্রাচীরের তলদেশে গিয়ে পৌছুলা। সিঁড়ি আর রশি লাগিয়ে চড়তে লাগলো চির দুর্লংঘ প্রাচীরে। এবার আর তাদের গতি রোধ করা সম্ভব

হয়নি। তীর-বর্শা আর কামান-গোলার প্রচণ্ড তোড়ে প্রাচীর রক্ষী বাহিনী মাথা তুলে দাঁড়াতেও সাহস পাচ্ছিলো না।

দীর্ঘ পঞ্চাশ দিনব্যাপী এ যুদ্ধের এটাই যে শেষ এবং চূড়ান্ত মুহূর্ত, তা বুঝে উঠতে দেরী হয়নি খৃস্টান বাহিনীর। সর্বশক্তি নিয়োগ করে তারা প্রতিরোধ করতে থাকে প্রতিটি হামলা। কিন্তু না, দুর্ধর্ষ এনকেশারী ফোর্সের সামনে ওরা টিকতে পারছে না। এরিমধ্যে সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জন গুরুতর আহত হয়ে পড়ায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। তার আহত হওয়ার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে গোটা রোমান বাহিনীর ভেতর নেমে আসে চরম হতাশা। প্রধান সেনাপতি জন যখন যুদ্ধের নেতৃত্ব স্বয়ং সম্রাটের কাঁধে ন্যস্ত করে রণক্ষেত্র ত্যাগ করছিলেন, তখনই কনস্টান্টিনোপলের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে মুসলমানদের বিজয়ের শ্লোগানে শ্লোগানে। সম্রাটের কাছে খবর এলো, মুসলমানরা নগরীর উত্তরাংশের পাঁচিল ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেছে। সাথে সাথে রোম সম্রাট উত্তরদিকে রওনা হলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। উত্তরাংশের প্রাচীর তখন মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। বুরুজে বুরুজে উড্ডীন হয়ে গেছে ইসলামী ঝাণ্ডা। আদরানা তোরণ দিয়ে তখন বানের তোড়ের মতো মুসলিম সেনাদের ঢল নগরী দিকে এগিয়ে চলেছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রোমান সম্রাট এলোপাতাড়ি আক্রমণ শুরু করে সেখানেই প্রাণ হারান। এরপর আর কোন বাধাই মুসলমানদের সামনে থাকেনি। খৃস্টান সৈন্যরা মুহূর্তের মধ্যেই গা ঢাকা দেয় এবং এখানেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ নৃপতির পতন ঘটে। একনায়কত্বের ইতিহাসে সবচেয়ে স্বৈরাচারী শাসনের শেষ অধ্যায়টির এভাবেই যবনিকাপাত হয়। আর এরপর থেকেই শুরু হয় মুসলিম কনস্টান্টিনোপলের নতুন ইতিহাস। পূর্ব পশ্চিমের মিলনক্ষেত্র ঐতিহাসিক ও সুরক্ষিত এ নগরী হয় ইসলামী খেলাফতের রাজধানী।